অভয়ের কথা

ও

ঠাকুরাণীর কথা।

অভয়ের কথা

ও

ঠাকুরাণীর কথা।

৺ক্ষেত্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

মূল্য এক টাকা।

প্রকাশক

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য

২৪, হ্যারিসন রোড রিপন কলেজ, কলিকাতা।

মানসী প্রেস

১৪ এ, রামতনু বসুর লেন, কলিকাতা

শ্রীশীতলচন্দ্র ভট্টাচার্য্য দ্বারা মুদ্রিত।

ভূমিকা

আকাশে তারা জ্বলিয়া উঠে—একটা তারা অকস্মাৎ জ্বলিয়া উঠে ও কয়েক দিন মাত্র উজ্জ্বলতা বিকিরণ করিয়া আবার নিবিয়া যায়। বাঙ্গালা সাহিত্যের আকাশে ক্ষেত্রমোহনও সেইরূপ অকস্মাৎ জ্বলিয়া উঠিয়া চমক জন্মাইয়াছিল—আবার অকস্মাৎ অন্তর্হিত হইল। 'মানসী'র পাঠক, গত বৎসর যার মুখে 'অভয়ের কথা' শুনিয়াছিলে, এবার 'ঠাকুরাণীর কথা' কহিতে কহিতে কথা অসমাপ্ত রাখিয়া সে কোথায় গেল?

ক্ষেত্রমোহন রিপণ কলেজে গণিতের অধ্যাপনা করিত। অবসর মত কেবলই নবেল পড়িত—ইংরেজি নবেল। হঠাৎ নবেল ছাড়িয়া বৈষ্ণব ভক্তিশাস্ত্র পড়িতে লাগিল;—হাতে দেখিতাম ললিতমাধব, উজ্জ্বল নীলমণি ইত্যাদি। পরে দেখিলাম, বেদান্ত গ্রন্থ পড়িতেছে। যাহা যখন পড়িত, তন্ময় হইয়া পড়িত। আমার হাসি পাইত—ক্ষেত্র আবার ভক্তিশাস্ত্র পড়িতেছে—বেদান্ত পড়িতেছে!

একদিন হঠাৎ কথাপ্রসঙ্গে ধরিয়া ফেলিলাম—ক্ষেত্র বেদান্ত হজম করিয়া আত্মসাৎ করিয়া ফেলিয়াছে। দেখিলাম ক্ষেত্র আমার গুরুগিরি করিবার অধিকারী হইয়াছে।

সে অনেক দিনের কথা—দশ বার বৎসরের হইবে। তদবধি আমি উহাকে বাছিয়া ধরিয়াছিলাম। ক্ষেত্রের ভিতরে যে পদার্থ আছে, তাহা কিরূপে বাহিরে প্রকাশ পাইবে, তজ্জন্য ব্যাকুল হইয়াছিলাম। ক্ষেত্রকে কলম ধরিবার জন্য পীড়াপীড়ি করিতাম—সে হাসিয়া উড়াইয়া দিত—আমার লেখা আবার কে পড়িবে? কিছুতেই নোয়াইতে পারি নাই।

গত বৎসর হঠাৎ আবার নোয়াইয়া গেল! একদিন অভয়ের কথার

নমুনা লইয়া আমার নিকট উপস্থিত। নমুনা দেখিয়া আমার চমক লাগিল। যে কখনও কলম হাতে করে নাই, সে একবারে এমন লিখিবে, ইহা মনেও ভাবি নাই। সে কি অপূর্ব্ব ভাষা, বুঝাইবার সে কি অপরূপ ভঙ্গী! বাঙ্গালা সাহিত্যে ইহার জোড়া দেখি নাই।

'মানসী'তে প্রকাশের পূর্ব্বে 'অভয়ের কথা'র এক এক টুকরা আমার পার্সীবাগানের বাসায় বসিয়া পড়া হইত। সন্ধ্যার পর এ জন্য ছোট মজলিস বসিত। কি যে আনন্দের তুফান উঠিত, যাঁহারা উপস্থিত থাকিতেন, তাঁহারা সাক্ষ্য দিবেন। যে বহ্নি এতকাল ভস্মাচ্ছন্ন ছিল, তাহা দপ্ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল; আমাদের চোখ ঝল্‌সিয়া গেল।

'অভয়ের কথা' গ্রন্থ আকারে বাহির করিবার জন্য এক বৎসর ধরিয়া পীড়াপীড়ি করিতেছিলাম। আবার সেই কথা—আমার লেখা কে পড়িবে? বলিতাম, সে ভাবনা তোমাকে করিতে হইবে না— পাঠককে বঞ্চিত করিবার তোমার অধিকার নাই। এক এক বার আক্ষেপ করিত, কই, কারও যে ভাল লাগিল, তাহা ত জানিলাম না। বলিতাম—ভয় নাই, বিপুলা চ পৃথ্বী।

এখনও বুঝি একমাস হয় নাই, 'অভয়ের কথা' প্রেসে দিবার জন্য জোরের সহিত জড়াইয়া ধরিয়াছিলাম। আমরা চুরি করিয়া প্রেসে দিব, এরূপ ভয় দেখাইতে হইয়াছিল। তখন প্রতিশ্রুত হইল, এই কয়টা দিন যাক্—আগামী জন্মাষ্টমীর দিন নিশ্চয় প্রেসে দিব—ইহার অন্যথা ঘটিবেনা।

জন্মাষ্টমীর দিন—বৎসরের এতদিন থাকিতে—জন্মাষ্টমীর দিন কেন? জন্মাষ্টমীর দিন সে পৃথিবী ছাড়িয়া চলিয়া গেল।

পৃথিবীতে আনন্দ-বরিষণ করিতে সে আসিয়াছিল—কোন দিকে দৃক্‌পাত না করিয়া মাথা তুলিয়া দম্ভের সহিত পা ফেলিয়া সে পথে চলিত

—আনন্দের স্রোত তার সঙ্গে সঙ্গে চলিত; যেখানে দুই দণ্ড বসিত, আনন্দের তুফান উঠিত। পরব্যোমে স্থিত আনন্দঘন পুরুষের আনন্দকণিকা যেন ঘনীভূত হইয়া মর্ত্তভূমে আসিয়াছিল। এইরূপ মাঝে মাঝে আসে; নতুবা মর্ত্তভূমিতে মানুষ টিকিতে পারিত না। 'অভয়ের কথা' ও 'ঠাকুরাণীর কথা' এই তত্ত্ব বুঝাইবার জন্যই লিখিত হইয়াছিল। ক্ষেত্রকে যে জানিত, সেই সে আনন্দের ধারা পান করিয়া তৃপ্ত হইয়াছে। না তৃপ্ত হইয়া উপায় ছিলনা; সে আনন্দ এমন, যে যত পাইয়াছে, সে তত আরও চাহিয়াছে। ক্ষেত্রমোহনের জীবনচরিত লেখা আমার কাজ নহে। অন্যে তাহা লিখিবেন। আমার কলমে যে দুই কথা আসিল, তাহা লিখিয়া দিলাম।

শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী।

১৩২১, ভাদ্র।

পুনশ্চ—

১৩২১ সালের জন্মাষ্টমীর দিনে ক্ষেত্রমোহন 'অভয়ের কথা' প্রেসে দিবার ইচ্ছা করিয়াছিলেন; জন্মাষ্টমীর দিনে তাঁহার মৃত্যু হয়। তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার সম্বন্ধে যে কয়টা কথা লিখিয়াছিলাম, আশ্বিন মাসের মানসীতে তাহা বাহির হয়। সেই কথা কয়টাই 'অভয়ের কথা'র ভূমিকা স্বরূপে বাহির হইল।

আজ ১৩২২ সালের আশ্বিন; এক বৎসর পরে 'অভয়ের কথা' বাহির হইল। প্রকাশকের ইচ্ছা, এই উপলক্ষে আরও দুই কথা যোগ করিয়া দিই।

ক্ষেত্রমোহনের জীবন-কাহিনী এই প্রসঙ্গে দিতে পারিলে ভাল

হইত; কিন্তু পূর্ব্বেই বলিয়াছি, তাহা আমার কাজ নহে। কালেজে পাঠাবস্থায় ক্ষেত্রমোহনের সহিত পরিচয় ঘটিয়াছিল, পরে একই কালেজে শিক্ষকতা কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছিলাম। ক্ষেত্রমোহনের সহিত আমার সম্পর্ক—প্রীতির সম্পর্ক, আনন্দের সম্পর্ক। বোধ করি সকলের পক্ষেই তাই;—কেন না, আনন্দময়তাই তাঁহার চরিত্রের বিশিষ্ট লক্ষণ ছিল।

শিক্ষকতা ব্যবসায়ী বাঙ্গালী গৃহস্থের জীবনে কর্ম্মের বাহুল্য থাকে না; সম্ভবতঃ ক্ষেত্রমোহনের জীবনেও তেমন কিছু ছিল না।

শিক্ষক ও অধ্যাপকরূপে ক্ষেত্রমোহন বড় ভাগ্যবান্ ছিলেন। তাঁহার ছাত্রেরা তাঁহাকে শ্রদ্ধা করিত, ভক্তি করিত, প্রীতি করিত। সকল শিক্ষকের ভাগ্যে এতটা ঘটে না। ছাত্রদেরই প্রীতির নিদর্শনরূপে এই গ্রন্থ বাহির হইল,—তাহাদেরই উদ্যোগে ও তাহাদের অর্থ-ব্যয়ে এই গ্রন্থ প্রকাশিত হইল। নতুবা ক্ষেত্রমোহনের নিঃসহায় বালক পুত্রের পক্ষে এই গ্রন্থ এখন প্রকাশ করা সম্ভব হইত কি না সন্দেহ। ক্ষেত্রমোহনের চিতা-পার্শ্বে দাঁড়াইয়া তাঁহার ছাত্রগণ যে সাধু সঙ্কল্প করিয়াছিলেন, তাহা আজ সিদ্ধ হইল।

শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী।
১৩২২, আশ্বিন।

৺ক্ষেত্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

অভয়ের কথা।

আপন খেল আপ কর দেখে, খেল সংসেজে আপাহি একে

প্রসঙ্গটী বৈদান্তিক। অত্র পুরুষকার দেবতা। জিদ্ করিয়া হঠপূর্ব্বক আলোচনা করিলে ইহার মর্ম্ম বুঝা যায়। ভক্তির আলোচনা কিন্তু ভগবৎ-প্রেরণা ভিন্ন হয় না। তত্র দৈব-দেবতা। এই দেবতার দেশী নাম কৃপা, বিলাতি নাম Grace। ভালবাসা হয় ত হয়; ইহা কোনও উপায় বা অনুষ্ঠান দ্বারা হয় না। আমরা মনে করি যে, কিছু রূপ, গুণ বা কৃতজ্ঞতা ইহার মূল্য তাহা নহে। ইহা সহজ। কৃত্রিম উপায় বা পুরুষকার-প্রয়োগ বা কৃচ্ছ্র তপস্যা অত্র বন্ধ্যা-প্রসব। পুরোক্ষদর্শী তটস্থা লক্ষ্মীদেবী কঠোর তপশ্চরণেও ব্রজ গোপীর মত গোবিন্দে প্রীতিমতী হইতে পারেন নাই। বালক সুন্দর হউক বা কুৎসিত হউক, তাহার প্রতি জননীর স্নেহ যথা সহজ, কোনও উপদেশ অনুষ্ঠানের অপেক্ষা রাখে না; তদ্বৎ ভগবানের প্রতি প্রীতি সহজ। ভক্তির রহস্য দুরবগাহ। বোধ হয় বেদান্তই ভক্তির ভিত্তি হইবে। ভিত্তিটা মজবুত হইলে তদুপরি বৃহৎ অট্টালিকার মত মনোহর ভক্তি-মন্দির নিরাপদে বিরাজমান হইতে পারে। বদন সুন্দর হইবে, তবে ত হাসি মধুর হইবে। সুকোমল পুষ্পে সদ্গন্ধের মত, যৌবনে লাবণ্যের মত, তৃপ্তিতে রোমাঞ্চের মত, স্থির সমুদ্রে লহরীর নৃত্যের মত বেদান্তাশ্রয়ে ভক্তির জাগরণ হয়, শুনা আছে। আমরা বর্ত্তমান প্রস্তাবে বেদান্তের তাৎপর্য্য অনুসন্ধান করিব। বেদান্তের শুভ জ্যোতিঃ অন্ধকে চক্ষুদান করে।

প্রাপ্তচক্ষু দূর হইতে অভয়কে দেখিতে পায়। Moses এমনই promised land দেখিয়াছিলেন। ইহা পরোক্ষ দর্শন; কাঁচা দেখা। পরে পাকা দেখা হয়।

গ্রন্থরচণা দ্বারা শব্দসাহায্যে মনের ভাব প্রকাশ করিতে হয়। বাগ্-দেবীর একটী চরণতল এই অর্থযুক্ত শব্দের উপর, অভিধানের উপর, প্রতিষ্ঠিত। অভিধানগত শব্দগুলির শক্তি অপরিসীম। সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম মনের ভাব ব্যক্ত করিবার সামর্থ্য তাহাদের প্রচুর পরিমাণেই আছে। সরস্বতীর প্রাচীন বরপুত্রগুলি তত্তৎ শব্দে অধিক শক্তিযোজনা করিয়া নানা দৃষ্টান্ত রচনা করিয়া গিয়াছেন। আমরা উত্তরাধিকারসূত্রে উক্ত মূল্যবান্ শব্দ ও দৃষ্টান্তগুলি পাইয়াছি। ইহা আমাদের কম সৌভাগ্য নহে। অতিশয় জটিল বেদান্তকথা সেই দৃষ্টান্তগুলির সাহায্যে অপেক্ষাকৃত সুগম হইয়াছে। শুনিয়া থাকিবে, গাজীপুরের সর্দ্দার প্রত্যহ দেড়মণ মাংস আহার করিত! প্রথমে দেড়মণ মাংসের চারিসের জগসুপ তৈয়ার হইত। পরে সেই চারিসেরে সর্দ্দারের একার উপযুক্ত অন্ন ব্যঞ্জন পাক হইলে সর্দ্দার প্রত্যহ তাহা ভোজন করিত। আমরা যে সকল দৃষ্টান্ত পাইয়াছি, তাহা দেড়মণ মাংসসারবৎ গুরু বস্তু। এই প্রবন্ধে যথাসময়ে দৃষ্টান্তগুলির প্রয়োগ করা হইবে। কিন্তু ইহাও দ্রষ্টব্য যে, অনেক সময়ে মনের ভাব শব্দ-সাহায্যে প্রকাশ করা দুরূহ। মনে মনে যূথিকা ও মালতীর সুগন্ধের পার্থক্য উপলব্ধি করিয়াও তাহা বাক্যে প্রকাশ করা যায় না। কিন্তু ভাষা নিজের দুর্ব্বলতা জানিয়াও, বালক যথা রাঙ্গা কাপড়কে আঙা কাপড় বলিয়া নির্দ্দেশ করিবার সমূহ চেষ্টা করে এবং অঙ্গুলিপ্রদর্শনাদি অভিনয়-সাহায্যে ভাষার ত্রুটী সমাধানে যত্ন করে, তদ্বৎ, কোনও ক্রমে মানস-প্রত্যক্ষ সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ভাবগুলিকে অস্ফুট শব্দেরই সাহায্যে শ্রোতৃবর্গের গোচর করিবার চেষ্টা করে ও সময়ে সময়ে কৃতকার্য্যও হয়। কোকিল

নিজ চিত্তের ব্যাকুল বেদনানন্দ অস্পষ্টাক্ষর কুহুরবে ও প্রণয়ীগণে অল্পাবয়ব আভিধানিক-অর্থশূন্য গদ্‌গদ কণ্ঠে, স্বপ্নের মত, তরল ছায়ার মত, অনিশ্চিত অস্থির উল্লাস বস্তুকে যেন কথঞ্চিৎ ঘনীভূত করিয়াই আমাদের বুদ্ধির গোচর করিয়া তুলে। ইহাও লক্ষ্য করিবার যোগ্য যে, অস্পষ্টাক্ষর হইলেও ভ্রমর-গুঞ্জনাদি অসন্দিগ্ধই বটে। বাগ্‌দেবীর দ্বিতীয় চরণকমল এই ঈষৎস্পষ্ট কুহুরব, গদভাষণ, অলিগুঞ্জনে সুপ্রতিষ্ঠিত। উভয় পদেই আমাদের সমান আদর করিতে হইবে। কখনও বা আভিধানিক শব্দ দ্বারা, কখনও বা অস্পষ্টাক্ষর ইঙ্গিত দ্বারা, এই প্রস্তাবের প্রতিপাদ্য বস্তুকে সমর্পণের চেষ্টা করা যাইবে। উদরান্নের জন্য উদয়াস্ত পরিশ্রম করিতে হয় বলিয়া আমাদের তত্ত্বচিন্তা করিবার সামর্থ্য থাকে না, মস্তিষ্কের একটা জড়িমা স্থায়িত্ব প্রাপ্ত হয়। যদ্যপি গুরুদেব কোনও কল্যাণকর মন্ত্র উপদেশ করেন, তথাপি আমাদের বুদ্ধির জড়তা বশতঃ আমরা তাহার মর্ম্ম গ্রহণ করিতেই পারি না, জপ অনুষ্ঠান করা ত দূরের কথা। যাহাই হউক আমরা অভয়ের কথা যথাসাধ্য আলোচনা করিব। অভয়ের কথাটীর পুনঃ পুনঃ উল্লেখ করিয়া উত্তম পরোক্ষানুভূতি হইলে পরে তবে অপরোক্ষ-জ্ঞান হইবে। নচেৎ নহে। যত কিছু বিচার তর্ক যুক্তি প্রাচীন বা নবীন তাহা পরোক্ষানুভূতির জন্য। কথাটী প্রতিপাদন করিবার জন্য হয় ত কোনও একই যুক্তির পুনরুল্লেখ হইবে; তাহাতে পাঠক পাঠিকার অরুচি, বিদ্বেষ হওয়া উচিত নহে।

ব-খেয়া সেলাই সেলাইএর পুনঃ পুনঃ পুনরুল্লেখ মাত্র হইয়াও নিন্দ্য নহে, বরং অধিক দৃঢ় ও নিরাপদ। একই হাতুড়ীর পুনঃ পুনঃ আঘাতে প্রেকশলাকা সুপ্রবিষ্ট হয়।

বেদান্তের কথাটী অতি ক্ষুদ্র, কিন্তু ইহার প্রতিপাদনটী বৃহদবয়ব। আমরা যথাসাধ্য অল্পকলেবরে বেদান্তালোচনা করিব; তাহাতে হয় ত

এক নিশ্বাসে সাতকাণ্ড রামায়ণ বলার মত হইবে—অনেক কথা বলিতে বাকী থাকিয়া যাইবে। তথাপি আশা আছে, অস্থি কঙ্কালখানা সমগ্র দিতে পারিব। পাঠক পাঠিকাগণ নিজ নিজ বুদ্ধি রুচি অনুসারে সেই অধিষ্ঠানকঙ্কালে গঠন, বর্ণ, লালিত্য, যৌবন দিয়া সর্ব্বাঙ্গসুন্দর করিয়া লইবেন। বিষয়টার একটা নিজ মহিমা আছে; আমাদের অপর্য্যাপ্ত আলোচনায় কোনও ত্রুটা থাকিলেও বিষয়ের নিজ মহিমাই বিষয়কে মহিমান্বিত করিয়া রাখিবে।

বিষয়টা আত্মা সৎ চিৎ আনন্দ রস কেবল স্বাস্থ্য অভয় ইত্যাদি নানা নামে অভিহিত। সাবধান! উক্ত নানা নামে নানা পৃথক্ বস্তু বুঝিবে না। বুঝাইবার প্রণালীর নানাত্ব বশতঃই বোদ্ধব্য একই বস্তুর নানা নামকরণ হইয়া থাকে। রামকে বুঝাইবার জন্য নাম দেওয়া যায় সীতাপতি, রঘুবর, দশরথাত্মজ, রাবণারি। রাম কিন্তু একই বস্তু। দৃষ্টান্তটা একটু স্থূল হইল। সীতাপতি, রঘুবর প্রভৃতি শব্দগুলি রামের বিশেষণ। বিশেষণের দুইটি শক্তি, ব্যাবর্ত্তকত্ব ও সমর্পকত্ব। সীতাপতি শব্দে রামকে অন্য রাম হইতে পৃথক নির্দেশ করা হয়; সীতাপতি পরশুরাম নহে, বোকারাম নহে। এবং সীতাপতি শব্দ আসল রামকে সমর্পণও করে। কিন্তু আত্মা, সৎ, চেতন, সামান্য, সমান, অদ্বয়, অভয়াদি পর্য্যায় শব্দ। ইহারা পরস্পর কেহ বিশেষ্য, কেহ বিশেষণ নহে। প্রত্যেকেই স্বয়ং সিদ্ধ। তবে কথা কহিতে গেলে কখনও বা বলিতে হয় সদাত্মা, অহং সৎ, অহং ব্রহ্ম, ইত্যাদি। ইহাতে এমন বুঝিতে হইবে না যে, সৎ শব্দ আত্মার বিশেষণ এবং আত্মাকে সমর্পণ করে, ও অন্য কোন একটা অসদাত্মা হইতে পৃথক্ নির্দ্দেশও করে। আত্মাও যাহা, সৎও তাহাই, একই বস্তু। সৎ আত্মা হওয়ায় বটে আত্মাকে সমর্পণ করে, সুতরাং সৎ শব্দটা আত্মার বিশেষণ হব; কিন্তু বিশেষণ নহে। যদি বিশেষণ হইত, তবে অন্য কোন

রকমারি আত্মা হইতে সমর্পিত আত্মাটীর পার্থক্যও দেখাইয়া দিত। বুড়া-শিব বাক্যে বুড়াশব্দটী ঠিক বিশুদ্ধ অর্থাৎ সমর্পকত্ব ও ব্যাবর্ত্তকত্ব শক্তি-সম্পন্ন বিশেষণ নহে। যাহা আছে, তাহা বুড়াশিবই। অপেক্ষাকৃত আধুনিককালে জন্মগ্রহণ করিয়াছে, এমন ছোকরা শিব নাই যে, বুড়া শব্দ সেই নবীন শিব হইতে বুড়াশিবকে পৃথক্ স্থাপিত করিতে পারে। মাংসাশী ব্যাঘ্র শুনিয়া আমরা নিরামিষভোজী বৈষ্ণব ব্যাঘ্র অনুসন্ধান করিতে প্রবৃত্ত হইব না।

আমরা এই প্রবন্ধে অভয় লোকটাকে বুঝিবার জন্য নানাপ্রকারে যত্ন করিব ও প্রকারভেদে ভিন্ন ভিন্ন নামে অভয়কেই বুঝিব।

অভয় লোকটার সর্ব্বাপেক্ষা সুপরিচিত নামটা "আমি"। ব্যাকরণ মিথ্যা বলে নাই। আমিটা সর্ব্বনাম। সকল নামের এই আমিতে প্রবেশ হয়—যথা সকল নদী সমুদ্রে প্রবেশ করে,—নিজ নিজ নাম ত্যাগ করিয়াই সমুদ্রে প্রবেশ করে। যে কোনও ব্যক্তিকে "কে তুমি" এই প্রশ্ন করিলে সে প্রত্যুত্তরে বলিয়া থাকে যে "আমি"।

এই 'আমি' শব্দটার প্রয়োগবাহুল্য রুচিসঙ্গত নহে। ব্যবহারজগতে এই নিরীহ পরমানন্দ 'আমি' শব্দের সঙ্গে অহংকার শব্দের তাৎপর্য্য যোজিত হইয়া 'আমি' শব্দটাকে অত্যন্ত গর্হিত ও নিন্দনীয় করিয়া তুলিয়াছে। বেদান্তের 'আমি'টাতে গর্ব্ব অহংকারের ছায়ামাত্র নাই। শৈশবে যে সকলের প্রিয় আমি, যৌবনে সেই নিষ্কলঙ্ক আমিতেই মদগর্ব্ব অবুদ্ধি বশতঃ আরোপিত হয়—আমিকে সকলের অপ্রিয় করিয়া তুলে। কিন্তু বস্তুতঃ নিষ্কলঙ্ক 'আমি'কে কলঙ্কিত করিতে পারে না। স্ফটিক জবা সন্নিধানে লাল হইয়াও লাল হয় না। যাহাই হউক শ্রুতিকটুতাদোষ পরিহারের চেষ্টা করিব। 'আমি' শব্দের উল্লেখ করিবার স্থলে মধ্যে মধ্যে, আত্মা, সৎ, রসাদি শব্দ ব্যবহার করিব। তাহা হইলে পাঠক পাঠিকার

গ্রন্থকারের উপর বিদ্বেষ হইবে না এবং গ্রন্থের উপরেও কৃপাদৃষ্টি হইতে
।

অবশ্য কথাটা আর গোপন রহিল না যে, ইহা আত্মারই প্রসঙ্গ; আমিরই প্রসঙ্গ। আমি বলি যে আমি ক্ষুদ্র নহি, ক্ষুদ্র হইব কেন? আমি মন্ত্রবলে বিরাট পুরুষকে বাধ্য করিয়া নিজ সন্নিধানে আকর্ষণ করিতে পারি ও তাহাকে হৃদ্‌গত বা কবলীকৃত করিতে পারি; বিশ্বনিয়ন্তা কেহ যদি থাকে, তবে তাহারও নিয়ন্তা আমি। এরূপ কথা বলিলে কিছু মাত্র গর্ব্ব প্রকাশ করা হয় না। যদি এখন না পার, পরে বুঝিতে পারিবে যে ইহাতে গর্ব্ব নাই। "তুমি কে গা" জিজ্ঞাসা করিলে যদি জ্ঞানগঙ্গা বলেন যে আমি দ্রবীভূত পরমতত্ত্ব, আমার বসতির জন্য শিব মস্তক প্রদান করিয়াছেন, তাহা হইলে দম্ভ প্রকাশ হইবে না; শিবের বুকের উপর থাকিতে পাইয়া উমা যদি বলেন যে আমি শিব নিয়ন্তা, তবে বটে উমা গরবিনী। ইহা সত্য কথার সরল উল্লেখ মাত্র। তোমরা পাঠক-পাঠিকা যে কেহ আছ,—তোমরাও ত আপনা আপনি প্রত্যেকে নিজে নিজে আমি আমি আমি বলিয়া থাক, বুঝিয়া থাক, শুনিতে পাই। পার যদি, তোমরাও যে কেহ আপনাকে উল্লেখ করিয়া বলিতে পার যে, আমিই আছি এবং তাহাই আর যাহা কিছু আছে তাহাতে আছে। ইহাতে আমাদের পরস্পর কিছু বিবাদ নাই।

জড়শব্দে দৃশ্যমাত্রকে বুঝায়; দ্রষ্টাটার নাম আত্মা, সাক্ষী। দৃশ্য বলিলে চক্ষুর গ্রাহ্য মাত্র বুঝায় না, যাহা বোধগম্য তাহাই দৃশ্য; গন্ধও দৃশ্য, সঙ্গীতও দৃশ্য, দেশকালও দৃশ্য।

শ্যাম বলে আমি দ্রষ্টা, যদু রাম গাছ পাথর আমির বা আমার দৃশ্য। যদু কেহ থাকে যদি, তবে যদুও বলিতে পারে আমিই দ্রষ্টা, তুমি শ্যাম প্রভৃতি সকলে আমার দৃশ্য। কলহ ত্যাগ করিয়া বেদান্তের 'আমি'টাকে

'আত্মা'টাকে বুঝিয়া লও। ইহা ব্যাবহারিক অহংকারী আমি নহে। বেদান্তের 'আমি'টা জীবনের জীবন-সর্ব্বস্ব স্বরূপ, নিঃশ্রেয়স। ব্যবহার-জগতে 'আমি' শব্দে দেহটাকে লইয়া, এবং গ্রন্থকর্ত্তা বা পণ্ডিত বা অন্য কিছু উপাধিসঙ্গ আমিকে বুঝি। কিন্তু কখনও বা ভুলিয়া সত্য কথাও বলি। যখন বলি যে আমার দেহ, আমার দেহ ভাল নাই, আমার মন, আমার মন বড় ব্যাকুল হইয়াছে, তখন আমি একটা কিম্ভূত বস্তু এবং দেহটা মনটা আমির ঘটী বাটী লাঠী আমার মত আমি হইতে বিলক্ষণ পৃথক্ একটা অন্যতম সম্পত্তিমাত্র, ইহা বলা হইয়া যায়। এই সত্য কথা যদি ব্যবহারকালে ভূয়োভূয়ঃ অপ্রমত্ত থাকিয়া বলা যায়, ইষ্টমন্ত্র হিসাবে জপ করা যায়—সঙ্গে সঙ্গে উক্ত সত্য কথাটা আরও সত্যতর করিয়া বুঝিয়া লওয়া যায়, তবে নিরতিশয় লাভবান্ হওয়া যায়—নৈরাকাঙ্ক্ষ্য হয়; প্রার্থনার বিষয় আর কিছু থাকে না।

দর্শনশাস্ত্রের আলোচনাতে সত্বর নেশা হয় না। একটু বিলম্বে হয়। কিন্তু হইবেই হইবে। বর বা কন্যা বিবাহের দিনের উপবাস স্বীকার করে; ক্ষুধার কষ্ট বোধ করিয়াও করে না। বধূ লাভের বা বরলাভের আশা তাহাকে উৎসাহিত করিয়া রাখে। পাঠক পাঠিকাকেও আপাত-কঠোর দার্শনিক প্রবন্ধকে ধৈর্য্য সহকারে পড়িতে হইবে,—কিঞ্চিৎমাত্র; পরে প্রিয় বঁধুর সহ আনন্দ-মিলন হইবে নিশ্চয়।

অনেকগুলি পারিভাষিক শব্দ আছে। তাহাদের ব্যবহার করিতে হইলে প্রসঙ্গটী academic হইয়া পড়ে। তাহাদের ব্যাবহার এই প্রস্তাবে প্রায় পরিবর্জ্জিত হইবে। অথচ কয়েকটীর উল্লেখ অপরিহার্য্য। তাহাদের অর্থ সকলের নির্দ্দোষরূপে জানা নাই। পূর্ব্ব হইতেই তাহাদের অর্থ কিছু বিশদ করিয়া লইব। অধিকরণ, সূত্র, ব্যাবহারিক, প্রাতি-ভাসিক, অঙ্গাঙ্গী, শেষশেষী, দৃষ্টি সৃষ্টি, সমাধি, প্রকৃতি, প্রধান, নিমিত্তো-

পাদান, বিবর্ত্ত, নির্ব্বাণ, স্বাস্থ্য, নির্ব্বিকল্প, নেতি, অনুগতি, সামান্য, সমান ইত্যাদি শব্দের প্রচার কম। আমরা নেতি, পরোক্ষাপরোক্ষ, অনুগতি ও সমান এই চারিটী শব্দের অর্থ শোধন করিয়া লইব। তাহা হইলে ভবিষ্যতে উক্ত শব্দগুলির সাহায্যে প্রস্তাবটীর কলেবর লঘু করিয়া লওয়া যাইবে। নচেৎ প্রতি উল্লেখে উক্ত শব্দগুলির অর্থ ব্যক্ত করিবার জন্য বৃথা সময়ক্ষেপ করিতে হইবে।

নেতি একটী প্রমাণবিশেষ। দৃশ্য বিষয়ের অস্তিত্ব সম্বন্ধে চক্ষু কর্ণাদি মোটা প্রমাণ; মন বুদ্ধি তদ্বিষয়ে সূক্ষ্মতর অনুমানাদি প্রমাণ সমর্পণ করে। অনুমানাদির মতই একটী অন্যতম প্রমাণ নেতি। নেতির বিলাতী নাম Proof by exhaustion। ধর, একখণ্ড বস্ত্র অপর একখণ্ড বস্ত্রের সমান নহে এবং অধিক নহে, ইহাই জানা আছে। সমান নিষেধ ও অধিক নিষেধ অর্থাৎ, সমান নেতি, অধিক নেতি হওয়ায় ইহা প্রমাণ হইয়া গেল যে, তবে প্রথম বস্ত্রখণ্ডটী দ্বিতীয় খণ্ডাপেক্ষা ন্যূন। নিশ্চয় ন্যূন। এই নিশ্চয়তা নেতিমুখেই পাওয়া গেল।

পরোক্ষাপরোক্ষ;—পরোক্ষ জ্ঞানটী অসম্পূর্ণ, ন্যূন, কাঁচা জ্ঞান; বহুমূল্য হইলেও মহামূল্য নহে। অপরোক্ষ জ্ঞানটী সাক্ষাৎকার, পাকা, বস্তুতন্ত্র জ্ঞান, realization। ইহা মহামূল্য। আমার একটী দুয়ানী পড়িয়া গিয়াছে, আমি রাস্তার এদিকে ওদিকে খুঁজিতেছি। একজন পথিক বলিল যে, ওহে তোমার দুয়ানী হারায় নাই? পথিক জানিত না যে আমার কি হারাইয়াছে; কিন্তু যখন সে দুয়ানীর উল্লেখ করিল, তখন সে অবশ্য তাহা দেখিয়াছে। আমার পরোক্ষ জ্ঞান হইল যে দুয়ানীটী নিকটেই আছে; বেশ নিশ্চয় জ্ঞান। কিন্তু সুনিশ্চয় নহে। যখন পথিক দুয়ানী দেখাইয়া দিল, তখন তৎসম্বন্ধে পাকা সুনিশ্চয় অপরোক্ষ জ্ঞান হইল।

অনেকবারের বরযাত্রীর বিবাহ সম্বন্ধে পরোক্ষ জ্ঞান মাত্র হয়। বরযাত্রীটী বালক হইলে তাহার নিজের বিবাহ হইলেও বিবাহ সম্বন্ধে পরোক্ষজ্ঞান মাত্র হয়। যৌবনে অপরোক্ষ জ্ঞান হয়।

স্বপ্নের পরোক্ষ জ্ঞানই হয়। অপরোক্ষ জ্ঞান এ যাবৎ কাহারও হয় নাই। স্বপ্নকালেই স্বপ্নকে স্বপ্ন বলিয়া কেহ অপরোক্ষ করে নাই। স্বপ্নকালে আমরা স্বপ্নকে জাগ্রত বলিয়াই বুঝি, স্বপ্ন বলিয়া বুঝিনা।

বন্ধ্যার পালিত-পুত্রের প্রতি স্নেহ পুত্রস্নেহের মত বটে; পরোক্ষ কিন্তু; অপরোক্ষ নহে।

ভুক্তভোগী ভিন্ন প্রসববেদনা কাহারও অপরোক্ষ নহে।

উন্মত্ততার জ্ঞান মৃত্যুর জ্ঞান, পরোক্ষ। অপরোক্ষ করা হয় ত অসম্ভব?

বিপত্নীকের অবস্থা, যাহার পত্নী বিয়োগ কদাপি হয় নাই, তাহার পক্ষে পরোক্ষ মাত্র। তবে কোনও হতভাগার অপরোক্ষ হওয়া ঘটিতে পারে।

অনেক সময়ে স্ত্রীলোকে কুপিতা হইয়া "শালা" বলিয়া গালি দেয়। শালা শব্দার্থ স্ত্রীলোকের পরোক্ষভাবে জানা থাকিতে পারে, অপরোক্ষ ভাবে জানা থাকে না।

প্রায়শঃ অনুগতি, অনুপ্রবেশ, অনুবৃত্তি, অন্বয় ইত্যাদি শব্দে উপসর্গ "অনু"টা সমাপিকা ক্রিয়ার পূর্ব্বকালিক অসমাপিকা ক্রিয়ার অপেক্ষা রাখে। যথা গৃহস্বামী গৃহনির্ম্মাণ করিয়া তত্র অনুপ্রবেশ করিল। অগ্রগামী প্রভু গমন করিলে ভৃত্য অনুগমন করিল। কিন্তু উপাদান কারণের যখন কার্য্যে অনুগতি, অনুপ্রবেশ, অন্বয় হয়, তখন পূর্ব্বোত্তর কাল-নিরপেক্ষ যুগপৎই অনুগতি ঘটিয়া থাকে।

মাটী, ঘট শরাবের উপাদান কারণ। ঘটাদি কার্য্য। ঘট তৈয়ার

হইয়া গেলে শেষে মাটী ঘটে যাইয়া অনুপ্রবেশ করিল, এমনটা হয় না। ঘট তৈয়ারীর সঙ্গে সঙ্গেই মাটী ঘটে অনুপ্রবিষ্ট থাকিয়া যায়।

লৌকিক দৃষ্টান্তেরও অভাব নাই। ক্তাচ্ প্রত্যয় থাকিলেই পূর্ব্বোত্তর-কালের কথা হইবে এমন নহে। 'মুখং ব্যাদায় স্বপিতি' ইহা বলিলে এমন বুঝায় না যে, লোকটা অগ্রে হাঁ করিল, পরে ঘুমাইল।

সমান :—বহুব্যক্তির সমষ্টির নাম রাশি, সমান, সামান্য, জাতি। এক একটা রাশি বা সামান্যকে ব্যক্তি ধরিয়া লইয়া তদ্রূপ রাশিগুলির সমষ্টি লইলে একটা বৃহত্তর রাশি বা সমান বস্তু হয়। বৃহত্তর রাশি বা সামান্য, ক্ষুদ্রতর রাশিতে এবং ক্ষুদ্রতর রাশিগত ক্ষুদ্রতম ব্যক্তিতে অনুগত থাকে।

রাম শ্যাম যদু আদি ব্যক্তির সমষ্টির নাম মনুষ্যজাতি,—সামান্য। ধবলী শ্যামলী প্রভৃতি গোব্যক্তির সমষ্টির নাম গো-সামান্য বা গো-জাতি।

মনুষ্যজাতি, গোজাতি, গজজাতি, কচ্ছপজাতি প্রভৃতি জাতিগুলিকে ব্যক্তি ধরিয়া তাহাদের সমষ্টি লইলে নাম হয় প্রাণি-সামান্য। এই প্রাণি-সামান্য একটা খুব বড় রাশি। ইহা অর্থাৎ প্রাণিত্ব প্রতি ক্ষুদ্র অংশে মনুষ্যে গোতে গজে কচ্ছপে অনুগত বিদ্যমান বর্ত্তমান পাওয়া যায়। এবং মনুষ্যজাতিটী নিজাংশ ব্যক্তি রাম শ্যাম যদুতে অনুগত হওয়ায় বৃহত্তর সমান প্রাণিত্বটী মনুষ্যত্বে থাকিয়া সুতরাং মনুষ্যত্বের সঙ্গে রামে শ্যামে যদুতে অনুগত হয়।

নানা গুল্ম বৃক্ষ লতাদির সমষ্টি তদ্বৎ পাওয়া যায়—উদ্ভিদ্-সামান্য। ক্ষয়োদয়রহিত প্রস্তর স্বর্ণাদি লইয়া একটা জাতি বা সামান্য লওয়া যাইতে পারে।

উক্ত বড় বড় জাতিগুলিকে—প্রাণী, উদ্ভিদ্ প্রস্তরাদিকে লইয়া একটা আরও বড় রাশি বা সামান্য "অবয়বী" নামে লইতে পার; তাহা প্রাণিত্বে অনুগত থাকিয়া প্রাণিত্ব সঙ্গে মনুষ্যত্বে ও মনুষ্যত্ব সঙ্গে রামে অনুগত দৃষ্ট হয়।

অবয়বী দ্রব্য-সামান্যের প্রতিযোগী "নিরবয়বী" সামান্য আছে। নিরবয়বী দ্রব্য সামান্য তদংশ সুখরাশিতে, ক্রোধ রাশিতে, কাম রাশিতে অনুগত আছে এবং সুখাদি রাশির ক্ষুদ্রাংশে নিদ্রাসুখ ভোজন-সুখাদি ব্যক্তিতে নিরবয়বী দ্রব্য সামান্যকে অনুগত দেখিতে পাওয়া যায়।

অবয়বী দ্রব্য নিরবয়বী দ্রব্য উভয় সামান্য একত্রে লইয়া একটী সামান্য পাওয়া যায়, তাহার নাম সৎসামান্য, চরম-সামান্য, বৃহত্তম সামান্য।
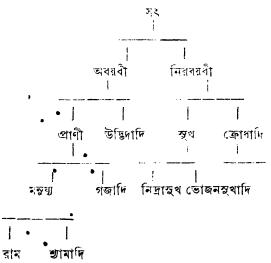
ছোট ছোট সামান্য রাশির বিলাতী নাম genus। যে কোন রাশির ক্ষুদ্রাংশগুলির নাম species। যে বিশেষ লইয়া কোন রাশিকে ক্ষুদ্রাংশে বিভাগ করা যায় তাহার নাম differentia। বৃহত্তম রাশির নাম highest genus—চরম সামান্য।

এই চরম সামান্যটীই এই প্রবন্ধের প্রতিপাদ্য। বিলাতী ন্যায়গ্রন্থে ইহার সুবিচার মীমাংসা নাই। আমরা সেই মীমাংসাকে নির্দ্দোষ পূর্ণা-

বয়ব করিবার চেষ্টা করিব। এই চরম সমান সৎটীর বহুবিধ নাম আছে যথা—আত্মা, ভূমা, অদ্বন্দ্বিত, স্বরূপ, সচ্চিদ্রস, অদ্বয়, স্বাস্থ্য, অভয়, কেবল। Whole, Absolute, Non-relative, Being, Consciousness, Beatitude, One, Health, Beauty, Self. কত শত মেধাবী পণ্ডিত ইহার আলোচনা করিবার জন্য সংযত সমাহিত হইয়া কঠোর তপস্যার্জ্জিত বলে বলীয়ান্ হইয়া এই সমান সৎকে বুঝিবার জন্য প্রয়াস পাইয়াছেন, তাহার ইয়ত্তা নাই। সকলেই কিন্তু ভয়ে ভীত হইয়া অর্দ্ধপথে বা সন্নিধানে পহুছিয়া স্তব্ধ হইয়া ভূমা বস্তু হইতে ন্যূন বস্তুতে আট্‌কাইয়া পড়িয়াছেন, আরও অধিক অগ্রসর হইতে সাহস করেন নাই। পণ্ডিতগণ নিজেকে ক্ষুদ্র মনে করিয়া সাধনা আরম্ভ করিয়াছিলেন; এই আরম্ভ সময়ের মৌলিক আদিম দোষে সমগ্র সাধনা দুষ্ট হইয়াছিল।

যে কোন সাহসী পণ্ডিত নিজেকেই উক্ত ভূমার অত্যন্ত সমতুল্য, ভূমাই বটে, এরূপ পরোক্ষ জ্ঞান লইয়া সাধনারম্ভ করিবে, সেই চরম সৎকে অপরোক্ষ করিবে ও সিদ্ধ হইবে, পূর্ণমনোরথ হইবে। আমাদের সকল জ্ঞানই দ্বন্দ্বিত relative। উচ্চতার জ্ঞানসহ নিম্নতার জ্ঞান উদিত থাকে; সুখের জ্ঞান ও দুঃখের জ্ঞান উভয়ে নিত্য সহচর; নিদ্রা জ্ঞান ও জাগরণ জ্ঞানের নিত্য সাহিত্য; পুরুষজ্ঞানের প্রতিদ্বন্দ্বী নারীজ্ঞান; মিলন ও বিরহ উভয়ে একটী দ্বন্দ্ব। নিম্নাধিকারের শেষ কথা এই যে, সকল জ্ঞানই দ্বন্দ্বিত। অদ্বন্দ্বিত absolute জ্ঞান হয় না। কিন্তু উচ্চাধিকারের ইহাই শেষ কথা নহে। উক্ত সমান সৎটীর, চরম সামান্যটীর জ্ঞান অদ্বন্দ্বিত, absolute। কেহই সৎএর প্রতিদ্বন্দ্বী কোনও অসৎ বস্তুর চিন্তা করিতে পারিবে না। যদি পারে তবে অসৎ বস্তু তৎক্ষণাৎ চিন্তার বিষয়রূপ কিঞ্চিৎ, অর্থাৎ সৎ, অর্থাৎ বিদ্যমান, হইয়া পড়িবে এবং

প্রতিদ্বন্দ্বিত্ব ত্যাগ করিয়া চরম সৎকে নমস্কার করিয়া চরম সৎ ভুক্ত হইয়া যাইবে। যে যেখানে যত পণ্ডিত আছ, এই অদ্বন্দ্বিত absolute সমান সৎকে আরাধনা কর, ইহার বিচার কর, ইহার তত্ত্ব নির্ণয় কর, ইহার স্বরূপাবধারণ কর, যদি পার। ইহাই আত্মা, ইহাই আমি নিষ্কলঙ্ক অপাপবিদ্ধ পরমপ্রেমাস্পদ।

মনে করিও না যে, প্রবন্ধ এই খানেই শেষ হইল! যখন সদ্বস্তুর প্রতিদ্বন্দ্বী রূপ কিছুমাত্র অসৎ বস্তু নাই, থাকিতে পারে না, তখন সমান সৎটা absolute হইল ত বটে, সুতরাং আমাদের অনুসন্ধানের যোগ্য— কিছু আর বাকী রহিল না—এমনটা মনে করিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া যাইও না। ইহা অদ্বন্দ্বিত সমান সৎ বিষয়ে পরোক্ষ জ্ঞান মাত্র। কর ত দেখি ইহার অপরোক্ষানুভূতি,—পারিবে না। দেখিবে সমূহ ব্যাঘাত ব্যামোহ। সমান সৎকে বিষয়ীভূত করিতে গেলেই—ইদংরূপে দর্শনের, চিন্তার প্রয়াস করিলেই বুঝিতে পারিবে যে, একটা না একটা সমান সৎএর বিশেষরূপতা অল্পতা, ন্যূনতা, খণ্ডাকারতা, আশ্রয় করিতে বাধ্য হইয়া পড়িবে। ভূমাকে, সমানকে পাইবে না; বিশেষকে পাইবে, ও বিশেষের সঙ্গে অস্তিত্বকে সমানরূপে নহে, বিশেষরূপেই, বুঝিতে বাধ্য হইবে। ঘট অস্তি, দ্বিচন্দ্র অস্তি, প্রতিবিম্ব অস্তি, অশ্বডিম্ব অস্তি, সুখ অস্তি। সমান অস্তিত্ব বিশেষ্য। ইহা ঘট দ্বিচন্দ্র প্রতিবিম্ব অশ্বডিম্ব সুখ-বিশেষণে বিশিষ্ট, উপাধিতে উপহিত, ক্ষুণ্ণ, ক্ষুদ্র, অল্প হইয়া দৃষ্টিগোচর বা বুদ্ধিগোচর হয়। সমান সৎটী, কোনও বিশেষ ঘটাদিদ্বারা অস্পৃষ্টটী, নির্বিকল্পটী, অদ্বন্দ্বিতটী বুদ্ধির গোচর হইয়াও হয় না। স্বপ্নের বস্তুকে যথা ফটোগ্রাফিত করিয়া বাঁধিয়া রাখা যায় না, তেলমাখা চোরকে যথা ধৃত করিয়া রাখা যায় না। যে কেহ এক জীব এই সমান সতের তত্ত্ব সম্যক বুঝিতে পারিবে, সে মুক্ত হইবে, ও অন্য যাবতীয় ব্যক্তি যে যেখানে আছে, সকলেই সেই এক জীবের

সঙ্গেই পৃথক্ পরিশ্রম না করিয়াই—মুক্ত হইয়া যাইবে। এ রহস্য প্রবন্ধের শেষ পর্য্যন্ত ধৈর্য্য সহকারে পাঠ করিলে এবং পুনঃ পুনঃ পাঠ করিলে হৃদয়ঙ্গম হইতে পারিবে।

বিশেষাকারগুলি, উপাধিগুলি, বিশেষণগুলি সমান অস্তিত্বের প্রতি-যোগী বা প্রতিদ্বন্দ্বী নহে। ইহারা প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া সমান সৎকে সদ্বন্দ্বিত, relative, করিতে অসমর্থ। অসৎ একটা কিছু পাইলে সৎ প্রতিদ্বন্দ্বী পাওয়া যাইতে পারিত বটে, কিন্তু বিশেষাকারগুলি যথা, ঘটটী অস্তি হিসাবে অস্তিত্ব সহ বর্ত্তমান, সদনুগত, অসৎ নহে; সুতরাং সমান সতের প্রতিদ্বন্দ্বী নহে, সদ্বিলাসমাত্র। অলমতি বিস্তরেণ।

যথা অবসরে এই প্রসঙ্গমধ্যে সমান সৎ কথার ভূয়োভূয়ঃ অনুশীলন হইবে। সেই কথার জন্যই ত এই প্রবন্ধ রচিত হইয়াছে। বিশেষগুলির মধ্যে অন্যোন্য-বিরোধ, প্রতিদ্বন্দ্বিত্ব থাকে থাকুক। ঘটে শরাবে ব্যাবর্ত্ত-কত্ব আছে বটে; ঘট শরাব নহে, শরাব ঘট নহে, কিন্তু ঘট শরাব উভয়ে মিলিয়া স্বাভাবিক নিজ নিজ প্রতিযোগিত্ব ত্যাগ করিয়া এক মূল বস্তু মাটীর প্রতিপাদন করে, সাক্ষ্য দেয়, মাটীকে সমর্পণ করে। তদ্বৎ, যাহা কিছু জগতে আছে এবং যাহা আমরা আছে বলিয়া কল্পনা করিতে পারি, যথা দশমুণ্ড রাবণ বা কচ্ছপীর দুগ্ধ, তাহারা পরস্পর-বিরোধ ব্যাবর্ত্তকত্ব ত্যাগ করিয়া সকলে সমযোগে অনুগত সমান সৎএর, বিজ্ঞানানন্দের, অদ্বন্দ্বিত অস্তিত্ব বস্তুর, আত্মার, আমির, অহংএর, প্রণবের, ওঁকারের, পরিচয় দিবার জন্য, সমান সতের পরিচয়ে পরিচিত হইবার জন্য, তন্ম-হিমার মঙ্গলগীতি গাহিবার জন্য, প্রয়োজন হইলে তাহার প্রীত্যর্থে আত্মোৎসর্গ করিবার জন্য, তদনুমতি প্রতীক্ষায় করজোড়ে অবহিত হইয়া দণ্ডায়মান রহিয়াছে। বেদান্তে নরনারী নাই। সকলেই তোমরা সমান সতের, মহারাজ আত্মার বিজয়-দুন্দুভি স্কন্ধে লও; বিজয়-আরতি

যাহাতে অঙ্গহীন না হয়,এমন ভাবে সমাহিত সংযতচিত্তে মহারাজের বিজয়-ঘোষণা কর। ইহাই মঙ্গল, ইহাই কল্যাণ।

প্রবন্ধে অভয়ের কথা হইতেছে। অভয় শব্দের অর্থটাকে অল্পবিস্তর দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝিয়া লওয়া নিতান্ত অনাবশ্যক নহে।

গোবিন্দের কখন কোন ব্যাধি হয় নাই। তাহাকে প্রশ্ন করা গেল "তুমি কেমন আছ?" গোবিন্দ প্রশ্নই বুঝিল না; বলিল "কেমন থাকা কি?" গোবিন্দ স্বস্থ। স্বাস্থ্যকে গোবিন্দ ইদংরূপে, দৃশ্যরূপে, বিষয়-রূপে গ্রহণ করিতে পারে না। স্বাস্থ্যাতিরিক্ত কোনও অবস্থা তাহা দ্বারা কালগত হয় না। স্বাস্থ্যটি অভয়, যেহেতু স্বাস্থ্যাতিরিক্ত কোন অবস্থা গোবিন্দের হইতে পারে, গোবিন্দের এমন কোনও ভয় হয় না।

জন্মান্ধের যেমন বর্ণ কি, বর্ণ বৈচিত্র্য কেমন জিনিষ, তাহা জানিবার ইচ্ছারই উদয় হয় না; তদ্বৎ অভয় স্বস্থ গোবিন্দের ব্যাধি কি বস্তু, তাহার যন্ত্রণাবৈচিত্র্য, বা আরোগ্য কি বস্তু, তাহার মনে এমন কোনও কল্পনা ও বিতর্ক উদয় হয় না।

শ্যামের দন্তশূল হইয়াছে। 'তুমি কেমন আছ' জিজ্ঞাসা করিলে শ্যাম বলে "বড় দুঃখে আছি।" শ্যাম দুঃখ বস্তুকে ইদংরূপে গ্রহণ করিয়াছে। পূর্ব্বে যে তাহার স্বাস্থ্য ছিল. সেই স্বাস্থ্যের আভাস শ্যাম পায়; আভাস মাত্র, অনুমান মাত্র। এখন, তাহার স্বাস্থ্যচ্যুতি হইয়াছে; দুঃখের সহিত পরিচয় হইয়াছে। আসল অভয়স্বাস্থ্য সময়ে দুঃখ-পরিচয় ছিল না। অভয়-স্বাস্থ্যকালে দন্তশূল যে কি বস্তু, তাহার কল্পনা অনুমান কিছুই হইত না।

কানাইএর দন্তশূল হইয়াছিল। আরাম হইয়াছে। তুমি কেমন আছ, জিজ্ঞাসা করিলে কানাই বলে "বড় সুখে আছি।" কানাই সুস্থ, স্বস্থ নহে। কানাই দুঃখ ও সুখ উভয়েরই পরিচয় পাইয়াছে; এবং দন্তশূল

হইবার পূর্ব্বে যে একটা অভয় অবস্থা ছিল, যখন দন্তশূল কি বস্তু বুঝিত না, দন্তশূল ভবিষ্যতে হইতে পারে, এমন ভয়ই হইত না, সেই অভয় অবস্থার আভাস পায়। এখন কানাই সুখী; কিন্তু তাহার সুখ সভয় সবিকল্প। ভয় আছে যে ভবিষ্যতে আবার দন্তশূল কি অন্য কোনও ব্যাধি হইতে পারে এবং সুখের অবস্থার প্রতিদ্বন্দ্বী দুঃখের অবস্থা যে কি, তাহাও তাহার মনে অনুভূত হয়। আসল অদ্বন্দ্বিত অভয়-স্বাস্থ্য পুনঃ-প্রাপ্তির ভরসা নাই, ইহা কানাই মনে করে। কানাই ভাবে যে, আমি স্বস্থ হইব এবং তখন পরিচিত সুখ দুঃখ সহসা সম্পূর্ণরূপে অপরিচিত হইয়া যাইবে, স্মৃতি হইতে লুপ্ত হইবে এবং আমার সুখ দুঃখ সম্বন্ধে জ্ঞান তিরোহিত হইয়া স্বাস্থ্য হইতে ভবিষ্যতে দুঃখে কি সুখে পতন হইবার দুশ্চিন্তা মনে উদয়ই হইবে না—স্বাস্থ্যচ্যুতির ভয়ই জাগিবে না, এমনটা আমার পক্ষে আর ঘটিবেই না।

গোবিন্দ স্বস্থ। সুখ দুঃখ দ্বন্দ্বাতীত "আনন্দের" অবস্থা তাহার। গোবিন্দ নিজের অবস্থাকে ইদংরূপে বুঝে না এবং নিজের অবস্থার আভাস পায় না।

দুঃখী কানাই "সুখী" হইয়াছে; স্বাস্থ্যের আভাস পাইয়াছে। কিন্তু আসল অভয়-স্বাস্থ্যের পুনঃপ্রাপ্তির আশা নাই বুঝিয়াছে।

গোবিন্দের কোনও আকাঙ্ক্ষা বা ইষ্ট নাই। কানাইএর আকাঙ্ক্ষা আছে, ইষ্ট আছে। কানাই এই প্রার্থনা করে যে, আর যেন ভবিষ্যতে দুঃখ কোন মতে না হয়—ধারাবাহিক সুখই হউক। যখন আর অভয়-স্বাস্থ্য পাওয়া যাইবে না, তখন মন্দের ভাল অর্থাৎ অভয় সুখ যাহাতে পাওয়া যায়, সেই কৌশলের সন্ধান করিতে হইবে; উপায়টী পাইলে তাহার অনুষ্ঠান করিতে হইবে; অনুষ্ঠানের ফলে অভয়সুখ পাওয়া যাইবে, যেন ভবিষ্যতে আর সুখ হইতে চ্যুতির ভয়, দুঃখপ্রাপ্তির ভয়, না থাকে।

জগতের প্রায় সকল সাধকই কানাইএর মত। নানা প্রকারের সাধনা অবলম্বন করিয়া নানা সাধক অভয়-সুখ অনুসন্ধান করিতেছে।

কদাচিৎ অভয় স্বাস্থ্যের দুই একটী উপাসক দেখা যায়। সক্রেটিস, বুদ্ধ, যীশু গোরার মত মহাপুরুষগণ সহস্র সহস্র বৎসরান্তে অতি বিরলরূপে জগতে দেখা দেন। নানা-পন্থী সর্দ্দারগণ নানা—আখড়া, টোল, মন্দির, মঠ, সম্প্রদায় স্থাপন করিয়া অভয়-সুখপ্রার্থী কানাইএর মত অন্ধ নানা ব্যক্তিকে নানা পথ প্রদর্শন করিতেছে।

ভগবান্ শঙ্করাচার্য্যের মত আচার্য্য কখন কখন অবতীর্ণ হইয়া অভয়-সুখটী যে অশ্বডিম্ব তাহা বুঝাইয় দেন। একটী সাধু দরিদ্রা পুত্র-শোকাতুরা সরলা জননীকে দেখিয়া বলে যে, অশ্বডিম্ব পাইলে সে মৃত পুত্রকে পুনর্জীবিত করিয়া দিতে পারে। জননীর মনে সন্দেহই হইল না যে, অশ্বডিম্ব অসম্ভব। যথা হংসডিম্ব তথাই অশ্বডিম্ব বুঝিয়া ক্রেতা রূপনগরের হাটে অশ্বডিম্ব ক্রয় করিতে গিয়া দেখিল যে রূপনগরে অশ্বডিম্ব নাই। তখন বুঝিল যে অশ্বডিম্ব হয় না, ছেলেও বাঁচিবে না, শোক করা বৃথা। আচার্য্য কানাইকে বলিল, অভয়-সুখ হয় না; সুখভোগকালেই ভবিষ্যতে সুখের চ্যুতিভয় আছেই, থাকিবেই—নিত্যসহচর। কায়ার সঙ্গে যথা ছায়া থাকে। কানাই অবুঝ ছেলে নহে; কানাই বলে, তাহা কতকটা আমি বুঝি; কিন্তু করি কি? অভয়-স্বাস্থ্য পাইবার উপায় ত নাই। কাজেই সুখ বস্তুটাকেই লম্বা করিয়া, দীর্ঘ করিয়া, অচ্ছিদ্র অনবচ্ছিন্ন করিয়া লইতে চাহিতেছি যে, দুঃখ যেন সুখের ধারার মধ্যে প্রবেশ-লাভ না করে।

আচার্য্য বলেন, অভয়-স্বাস্থ্য যাহা তোমার ছিল, যাহা হইতে চ্যুত হইয়াছ, তাহার আভাস ত তোমার জানা আছে। সেই আভাস অবলম্বন করিয়া, আভাসকে সূত্রবৎ ধরিয়া গোলকধাঁধার ভিতরেই আসল পথ

আবিষ্কার করিয়া পুনরায় স্বস্থ হইতে পারিবে। দেখ, দর্পণগত প্রতিবিম্ব আভাসমাত্র; কিন্তু তাহাই অবলম্বন করিয়া আসল বিম্বমুখের যথেষ্ট পরিচয় পাইয়া থাকি।

কানাই বলে, ঠাকুর আভাসটা অতি অল্প; তাহার দ্বারা যে কার্য্য সুসম্পন্ন হইবে, এমন আশা হয় না।

আচার্য্য বলেন যে, আচ্ছা, আমি তোমাকে অধিক আভাস দিব; এত অধিক যে তাহাতে তোমার ভরসা হইবে যে, পুনরায় অভয় স্বাস্থ্য পাওয়া যাইতে পারে বটে। শুন, বুঝ; সচরাচর ব্যাধি-বিনির্মুক্ত ব্যক্তির—সুস্থের—ব্যাধিযন্ত্রণা স্মরণপথে জাগরূক থাকে, অত্যন্ত বিস্মৃত হয় না। সুতরাং সুস্থ হইলেও ভবিষ্যতে পাছে পুনরায় ব্যাধি হয়, এই ভয় চিরসহচর থাকিয়া যায় এবং অভয়-স্বাস্থ্য-প্রাপ্তির আশায় প্রায় মূলোচ্ছেদই হয় বটে। কিন্তু হে প্রিয় শিষ্য, তুমি উন্মাদ দেখিয়াছ। সে কখনও কি জানি কি ভয়ে ভীত হইয়া পলায়ন করে, কখনও নিজবক্ষে দারুণ চপেটাঘাত করে। উন্মাদ আরোগ্য-লাভ করিলে কিন্তু উন্মত্তাবস্থায় যাবতীয় শরীরিক মানসিক যন্ত্রণার কথা বা সুখের কথা সমস্ত অত্যন্ত-বিস্মৃত হইয়া যায়। সুতরাং তাহাকে সুস্থ না বলিয়া স্বস্থই বলিতে হইবে। তুমি কানাই এখন উন্মাদ, আমার উপদেশ-ঔষধ সেবন কর। তুমি পুনরায় স্বস্থ হইবে, অভয়-পদ পাইবে।

পাঠক পাঠিকা! উক্ত উন্মত্তারোগ্যের দৃষ্টান্তের মত দৃষ্টান্ত জগতে খুব বেশী নাই। এই দৃষ্টান্তটীকে আদর করিবে, ইহা তোমাদের আদর পাইবার যোগ্য।

শিষ্য কানাই স্বাস্থ্য-প্রাপ্তির বেশ আশা আছে বুঝিল, চমৎকৃত হইল। কিন্তু ব্যাঘ্র একবার মানুষের রুধির পান করিলে নরশোণিতে লোভী হইয়া পড়ে। শিষ্য স্রকৃচন্দন বনিতাভোগ-সুখের পরিচয় পাইয়াছে। সে

কিম্ভূত স্থির অচঞ্চল সামান্য নির্বিকল্প অভয়স্বাস্থ্য আর চায় না; চঞ্চল সুখই চায় এবং দুঃখ-বর্জ্জিত নিরাপদ সুখ যদ্যপি অশ্বডিম্ববৎ অসম্ভব, তথাপি কোন কৌশলে যদি তাহাকে সুসম্ভব করা যায়, তাহারই চেষ্টা করিতে উৎসাহ রাখে সুতরাং তাহার গুরুবাক্যে শ্রদ্ধা থাকিলেও রুচি নাই। আচার্য্য ব্যাপারটা বুঝিতে পারিলেন যে, শিষ্যকে ভোগাপবর্গ পথেই উদ্ধার করিতে হইবে। শিষ্য নানা সুখ ভোগ করিতে থাকুক্ এবং উপস্থিত নিম্নাধিকারের অনুষ্ঠান কিঞ্চিৎ করিতে থাকুক্। যখন নিষ্কণ্টকে ভোগ অসম্ভব বুঝিবে এবং যখন ভোগবিষয়ে অল্পবিস্তর নিস্পৃহ হইবে, তখন তাহার অভয়-স্বাস্থ্যে রুচি হইবে, অভয়-স্বাস্থ্যপ্রাপ্তির উপায় শ্রবণ ও তাহার অনুষ্ঠান করিবে।

আচার্য্যের সহিত শিষ্যের যে নিগূঢ় সম্বন্ধ আছে, তাহা শিষ্য আপাততঃ জানে না, পরে জানিবে; পাঠকপাঠিকারও এখন জানিয়া কাজ নাই। দুরন্ত অবাধ্য শিষ্যকে আচার্য্য ত্যাগ করিতে পারেন না; আচার্য্য ছদ্মবেশে নানা আখড়ায়, মন্দিরে নানা পন্থী সাজিয়া অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। গুরু এক; গুরু নানা হয় না। একই গুরু নানা বেশে শিষ্যের যথা-অধিকার উপদেশ দিবার জন্য নানা স্থানে আড্ডা করিয়া থাকেন। অভয়-সুখপ্রার্থী শিষ্য যথাক্রমে সেই আড্ডায় যাইয়া নানা রোচক ভয়ানক অর্দ্ধসত্য অর্দ্ধমিথ্যা উপদেশ উত্তম বলিয়া গ্রহণ করে কিন্তু অনুষ্ঠান করিতে করিতে সেই সকল উপদেশ কদলী-গর্ভবৎ অসার বুঝিয়া ক্রমে উচ্চাধিকার লাভ করিয়া, মার্জ্জিতবুদ্ধি হইয়া, সূক্ষ্মদর্শী হইয়া উত্তরোত্তর গভীর সারগর্ভ উপদেশ অঙ্গীকার পূর্ব্বক ত্যাগ করিয়া চরমে অভয়-স্বাস্থ্যই যে অভয়, অন্য কিছু অভয় নাই, তাহা বুঝে এবং তাহারই অপরোক্ষানুভূতির জন্য উৎকণ্ঠিত হয়।

প্রসঙ্গাগত কথা একটা বলিয়া রাখি। ভক্ত অভয়-স্বাস্থ্যের পূরা

অনুমোদন করে না। ভক্তের যাহা অভিপ্রায় তাহার আলোচনার উপযুক্ত অবসর এখনও উপস্থিত হয় নাই।

রোচক ভয়ানক কথা; অর্দ্ধসত্য অর্দ্ধ-মিথ্যা হইলেও মহদুপকার সাধন করে। জননী, জলমগ্নের শ্বাসপ্রশ্বাস-প্রণালীর ব্যাঘাত হেতু মৃত্যু-বিচার অবোধ শিশুকে বুঝাইতে চেষ্টা না করিয়া, জলে জুজু আছে এই ভয় প্রদর্শন করে, বালক সরোবরতীরে জুজুর ভয়ে গমন করে না। বাঁচিয়া যায়। সে বয়স হইলে মাতার মিথ্যা কথাকে পরম উপকারী বুঝে ও হিতৈষিণী জননীর প্রতি মিথ্যাবাদিনী বলিয়া তাহার শ্রদ্ধার লাঘব না হইয়া বরং ভক্তি অধিক পরিপুষ্ট হয়।

চিকিৎসক বালককে মিঠাই দিবার লোভ দেখাইয়া তিক্ত নিম্ব পান করায়, মিঠাই দেয় না। বালক প্রবীণ হইয়া সেই চিকিৎসকের প্রতি তাহার মিথ্যা কথার জন্য বিদ্বেষবুদ্ধি রাখে না, বরং তাহাকে পরম হিতকারীই বুঝে।

গুরুমহাশয় অনাবশ্যক অধিক ভয়ানক পরিমাণে বালকদের প্রতি বেত্রচালন করে। কিন্তু বালকগণ বড় হইয়া গুরুমহাশয়কে তজ্জন্য যমমন্দিরে পাঠাইবার ষড়যন্ত্র করে না।

তদ্বৎ স্বর্গসুখের প্রলোভন দেখাইয়া ও নরকাদির ভয় দেখাইয়া পুরোহিতগণ আমাদের স্বাভাবিক দুর্দ্দান্ত, অকল্যাণকর প্রতিকূল প্রবৃত্তিগুলিকে সংযমিত করিবার জন্য ব্যয়সাধ্য যজ্ঞাদি কার্য্যে নিযুক্ত করিয়া আমাদের সমাজধর্ম্ম, পরোপকার-প্রবৃত্তি, দানশীলতা, অর্থে মমতাত্যাগাদি শুভ শুভ প্রবৃত্তিগুলির উদ্বোধন ও অভ্যাস সম্পাদন করেন। গুরু শিষ্যকে ধ্রুব দেখাইবার জন্য ধ্রুবেতর ধ্রুবসন্নিহিত বড় বড় তারাগুলিকে আদৌ ধ্রুব উল্লেখে উপদেশ করেন। অবশ্য উপদেশ মিথ্যাই বটে, কিন্তু ফলপর্য্যবসায়ী, যথা রাক্ষস খড়ের হইলেও পক্ষিগণকে ভয়

দেখাইয়া ক্ষেত্রের ফসল রক্ষা করিয়া সুফলদান করে। ক্রমে তাহা নহে তাহা নহে, এই রূপ গুরু নিজেই স্বীকার করিয়া স্থূল তারাগুলির সাহায্যে চরমে সূক্ষ্ম ধ্রুব নির্দ্দেশ করিয়া দিয়া শিষ্যকে চরিতার্থ করেন। চরিতার্থ শিষ্য ও মিথ্যাবাদী গুরুকে পরম সত্যবাদী মানিয়া পরম সমাদরে নমস্কার করিয়া থাকে। অন্ধবৎ অনধিকারী শিশু-শিষ্যকে আচার্য্য হাত ধরিয়া ধীরে ধীরে সঙ্গে লইয়া যখন সচ্ছিদ্রস বস্তু দেখিবার সামর্থ্য দিয়া, শিষ্যের চক্ষু ফুটাইয়া আত্মাকে দেখাইয়া দেন, বুঝাইয়া দেন, তখন শিষ্য অবাক্ বিস্মিত হইয়া যায়। তখন বুঝিতে পারে যে অভয় শব্দ ও দুঃখ প্রতিদ্বন্দ্বী সুখ শব্দ এই দুই "অভয়" ও "সুখ" শব্দের পরস্পর ধাতুগত নিরতিশয় বিরোধ আছে। অভয় সুখটী square cicrl বৎ অসম্ভব। অভয়ই স্বাস্থ্য। সুখ অভীষ্ট হয় না। অভয়-স্বাস্থ্যই ইষ্ট। সুখের চেয়ে সোয়াস্তি ভাল।

অভয় স্বাস্থ্যের কথা বড় উল্টা কথা, আশ্চর্য্য কথা। তাহাতে হঠাৎ বিশ্বাস স্থাপন করা কঠিন। একবিন্দু জলে সমগ্র সমুদ্রের প্রবেশ করার মত কথা। এক জীবে সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডের প্রবেশ; এক জীবের মুক্তিতে যাবতীয় প্রাণীর এবং তাহাদের দাঁড়াইবার স্থল বিশাল হইতে সুবিশাল জগতেরও মুক্তি। সম্পূর্ণরূপে অলঙ্কার-বর্জ্জিত হইলে তবে অত্যন্ত নগ্ন শিবই সুন্দর হয়। শিষ্যই নাবালক মহারাজকুমার, গুরু তাহার অভিভাবক মাত্র। পাপ ত পাপই, পুণ্য ও পাপ দুইই ত্যজ্য। ক্ষুদ্র একটুকুরা অগ্নি পৃথিবীর যাবতীয় বৃহৎ কাষ্ঠ ভারকে নিঃশেষে হজম করিতে সামর্থ্য রাখে।

আইস পাঠকপাঠিকা, আমরা শিষ্যের অভয়-সুখান্বেষণে নানা স্থানে নানা গুরুর নিকট গমন সময়ে তাহার সঙ্গে সঙ্গে থাকিব এবং নানা গুরুসকাশে কনিষ্ঠ মধ্যম উত্তম অধিকারের উপযোগী নানা বিচার-প্রসঙ্গ শুনিয়া লইব।

অধিকার ঃ—একটা না একটা অধিকার আমরা প্রত্যেকে পৃথকরূপে অবশ হইয়া, অজ্ঞাতসারে পাইয়া থাকি। সেই অধিকারের উৎকর্ষ-বিধান কোনও একই ব্যক্তি নিজ জীবনকালেই অথবা পুরুষানুক্রমে নানা বিধিনিষেধানুষ্ঠানে নানাশিক্ষা অভ্যাস সংযমে সম্পাদন করিয়া লয়। একই জীবনে বা পুরুষপরম্পরায় দুর্বিনীত বালকই ক্রমে উদার বৃদ্ধ হয়। যে সমাজে যে পরিবারে আমরা জন্মলাভ করি, তথাকার পারিপার্শ্বিক ঘটনাবলী আমাদের অজ্ঞাতসারে শিশুকাল হইতে কতকগুলি সংস্কার জন্মাইয়া দেয়। আমরা সুতরাং সবাই কোনও না কোন সংস্কার-কিঙ্কর। সংস্কার-কৈঙ্কর্য্যই অধিকার। ভিন্ন ভিন্ন মানুষের পৃথক পৃথক্ অধিকার। সকলেই যেন নেশা করিয়া জগতে আসিয়াছে। স্বাধীনভাবে নিরপেক্ষ-রূপে সাদা চক্ষে বস্তু-বিচার করা যেন আমাদের আর সাধ্যায়ত্ত নহে। বস্তু-বিচার করিতে গেলেই পূর্ব্ব সংস্কারবশতঃ বিষয়বিশেষে আদর, পক্ষপাত বা বিদ্বেষ হইয়া পড়ে ও ভ্রমপ্রমাদশূন্য মীমাংসায় উপনীত হইতে আমরা পারি না। অধিকন্তু যাবজ্জীবন নেশার জন্য মদিরারূপ বিলাসের সামগ্রী প্রচুর পরিমাণে যোগান পাইতেছি। এবং নেশা ছুটিবার পূর্ব্বেই কে যেন আমাদিগকে যমের জিম্মা করিয়া দিতেছে। যে আমাদের লইয়া এই-রূপে নির্দ্দয় ভাবে খেলা করিতেছে, তাহাকে ঠিক ধরিতে না পারিয়া আমরা হতভাগিনী প্রকৃতিকেই দোষী করিতেছি। হয় ত সে নির-পরাধিনী। যাহাই হউক, তাহার খেলাটী তাহার খেলা বটে, কিন্তু আমাদের মরণ।

বৈষ্ণব-সন্তানের সংস্কার এই যে, পশুহিংসা পাপ। নিকট প্রতি-বেশী শাক্তের বংশধরের পশু-বলিতে উৎসাহ এবং অবশ্য-কর্ত্তব্য বলিয়া বোধ। আমাদের বৃদ্ধ প্রপিতামহগণ সতীদাহে বা বংশের প্রথম পুত্রকে সমুদ্রে ভাসাইয়া দিতে কুণ্ঠিত হইতেন না। তিন

চারি পুরুষেই আমরা বিপরীত-সংস্কারের কিঙ্কর হইয়া পড়িয়াছি, সতীদাহাদি লোমহর্ষণ ঘটনার প্রসঙ্গ হইলে শিহরিয়া উঠি।

এতটা সংস্কার-পারবশ্যের ভিতরেও কিন্তু একটা ধাতুগত স্বাধীনতা আমাদের আছে, যাহা প্রকৃতির বিরোধী। যদি তাহার উদ্বোধন অধিক মাত্রায় হয়, তবে আমরা বিদ্রোহী হই এবং প্রকৃতিদত্ত মোহ-মদিরা আর পান করিতে অসম্মত হই, বিলাস-সামগ্রী অনায়াস-লভ্য হইলেও সংযমী হই এবং সংযমাভ্যাসে যতই কৃতকার্য্য হই, ততই বলসঞ্চয় হইতে থাকে এবং পুরুষপরম্পরায় প্রাপ্ত ও শিশুকাল হইতে অর্জ্জিত সংস্কারগুলির দোষগুণ বিচার পূর্ব্বক তাহার উচ্ছেদে বা রক্ষণে শক্ত হই। এরূপ একটীও বীর জন্মগ্রহণ করিলে প্রকৃতি তাহাকে পরম শত্রু বিবেচনা করে ও সমাজদ্বারে পীড়ন করিয়া হউক, অর্দ্ধেক রাজত্ব ও এক রাজকন্যার লোভ দেখাইয়া হউক, সেই স্বাধীনচেতা বীরের যত্ন উদ্যম বিফল করিতে চেষ্টা করে; এমন কি মহাবীর প্রহ্লাদ যীশুর মত লোককে গলা টিপিয়া লবণ খাওয়াইয়া বা বিষপ্রয়োগে বা নির্লজ্জ নির্দ্দয়ভাবে প্রকাশ্যে ক্রুশে বিদ্ধ করিয়া মারিয়া ফেলিতে চেষ্টা করে। এযাবৎ ঘটিয়াছে প্রকৃতির জয়। যে সকল বীর জন্মগ্রহণ করিয়াছিল, সকলকেই প্রকৃতির সহ সংগ্রামে পরাজিত হইয়া প্রাণপাত করিতে হইয়াছে। প্রশ্ন এই যে, একটা দুইটা বীরকে প্রকৃতির এত ভয় কেন? তাহারা যদিই সুন্দরী প্রকৃতির অপাঙ্গভঙ্গিতে মুগ্ধ না হইয়া মোহিনীর স্বহস্তদত্ত সুরাসার আদরের সহিত গ্রহণ নাই করে, নাই করিল। তাহারা বনে চলিয়া যায়, যাউক। বক্রী শতকোটী মানুষ ত প্রকৃতির ক্রীড়নক থাকিবে; প্রকৃতির লীলাখেলায় ত ব্যাঘাত হইবে না। তাহা নহে। প্রকৃতির ভয়ের কারণ আরও নিগূঢ়। একটা বীর তৈয়ার হইলেই প্রকৃতির

সর্ব্বনাশ। দ্বিতীয় বীরের অপেক্ষা নাই। একটা তৈয়ার বীর প্রকৃতিকে ছাড়িয়া দূরে বনে যাইবে না, প্রকৃতিকে খুন করিয়া ফেলিবে। বীরের মনে দয়া ক্রোধ নাই; প্রকৃতি নানা জীবকে মুগ্ধ করিয়া তাহাদের হানি করিতেছে, অতএব জীবের উপর করুণা করিয়া, জীবের শত্রু প্রকৃতির উপর কোপ করিয়া প্রকৃতিকে শাসন করিবার প্রবৃত্তি বীরের থাকিবে, এমন কোন কথাই নাই। দয়া ক্রোধ ত বন্ধন-সংস্কার, প্রকৃতির পারবশ্য; দয়া ক্রোধ থাকিলে পরিপক্ক বীর হওয়া যায় না। বীর অচঞ্চল, স্থির হইবে। সে দয়ালু বা কোপন-স্বভাব নহে—দয়া বা ক্রোধকে বীর নিজ লক্ষ্য ভ্রষ্ট করিতে দেয় না। বীর অপ্রমত্ত হইয়া নিজ মুক্তিকে, নিজ গরজেই নিরঙ্কুশ করিতে চায়। সে অন্য জীবের ভাবনা ভাবে না। পূর্ব্বের বীরগণ পরের ভাবনা ভাবিয়াছিল বলিয়া পরিপক্ক বীর-পদবী পায় নাই, অকৃতকার্য্য হইয়াছিল; নিজের মুক্তিও পায় নাই, অপরের উপকারও করিতে পারে নাই।

আসল বীর নিজ কার্য্য উদ্ধারকল্পে অন্য কোনও দ্বিতীয় চিন্তাকে তাহার মনে প্রবেশ করিতে দেয় না, পাছে নিজ কার্য্যে অল্পমাত্র অমনোযোগ হয়। আসল বীরের নিজ মুক্তি হইলেই আপনা আপনি অপর সকল বদ্ধ জীবের মুক্তি অবশ্যম্ভাবী। ব্যাপারটা এই যে,—পাকা বীর ভাবে যে, বটে আমি বর্ত্তমান কালে অতীতের মত প্রকৃতিতে অনুরক্ত নহি, আমি "অসঙ্গ" পুরুষ, কিন্তু প্রকৃতি যদি মোহিনী মূর্ত্তিতে সমক্ষে দণ্ডায়মানই রহিল, তবে ত ভবিষ্যতে আমার পুনরায় পূর্ব্ববৎ কোনও কারণে—তাহাতে মুগ্ধ হইবার সম্ভাবনারূপ ভয় থাকিয়া যায়। আবার ত আমি স্রক্‌চন্দনবনিতাদি প্রকৃতির কোনও বিশেষ রূপের অধীন হইয়া পড়িতে পারি। সুতরাং যদি পারি তবে প্রকৃতির

সম্যক, অত্যন্ত, নিরতিশয় উচ্ছেদ করিব। তবে ত সভয় মুক্তির পরিবর্ত্তে অভয় নিরঙ্কুশ মুক্তি পাইব, অল্প অপেক্ষা ভূমা প্রাপ্তি হইবে। যদি বল তুমি ক্ষুদ্র, তুমি ত তুমি, কেহই বলবান্ প্রকৃতিকে এতাবৎ যমালয়ের অতিথি করা দূরে থাকুক কিঞ্চিন্মাত্র জখম করিতেই পারে নাই। বীর সাধক বলে, কথাটা ঠিক নহে। এ পর্য্যন্ত কেহই মুক্ত হয় নাই; সকলেরই কিছু না কিছু কশুর ছিল। তাহারা বটে ক্ষুদ্র দুর্ব্বল ছিল। আমি কেন ক্ষুদ্র দুর্ব্বল হইব বা হইবে। আমি সাধনবলে বিশাল হইতে সুবিশাল বিরাট বস্তুকে হৃদয়-পিঞ্জরে বদ্ধ করিতে পারি বা পারে। আমি প্রকৃতিকে মারিয়া ফেলিব। সে আর আমাকে ভবিষ্যতে মুগ্ধ, অধীন করিবার জন্য জীবিত থাকিবে না, "বাধিত" হইয়া যাইবে। সে মরিলে অন্যান্য শত সহস্র জীব, যাহারা কেহ বা আছে, সকলেই মুক্ত হইয়া যাইবে; আমার নিজ গরজে আমার দ্বারা প্রকৃতির বধ ঘটিলে তাহাদিগকে মুগ্ধ, অধীন করিবার জন্য প্রকৃতির অভাব হইলে তাহারা সুতরাং মুক্ত হইবে সন্দেহ নাই। প্রকৃতি নিজ প্রাণভয়ে ভীত হইয়া সৃষ্টির আদিমকাল হইতে কখন হাস্যবদনে কণ্ঠলগ্না হইয়া, কখন বা ক্রুশের অথবা অগ্নিজ্বালার ভয় দেখাইয়া আমার পীড়ন ও সর্ব্বনাশচেষ্টা করিয়া আসিতেছে। কিন্তু সে 'আমির' হস্তেই মরিবে। বটে, শত ভ্রাতা ও সহস্র দিব্যাস্ত্র বহু মহারথী সুরক্ষিত দুর্য্যোধন প্রকৃতির দেহ বজ্রসার-কঠিন। কিন্তু সেও জানে, আমিও জানে, তাহার উরুদেশে রন্ধ্র আছে। ভীমপুরুষ যখন তত্র বিষম গদাঘাত করিবে, তখন ভীম নিজে এবং যে যেখানে আছে, কি পাণ্ডবপক্ষীয় কি কুরুপক্ষীয়, কি উদাসীন, সকলেই অভয় নিরঙ্কুশ মুক্তিপদ লাভ করিবে। দুর্য্যোধন-প্রকৃতি মরিবার পরে ভবিষ্যতে কাহাকেও অধীন করিতে আসিবে না।

দেখ কর্ণধার পরিশ্রম করিয়া নদীর পরপারে যায়। সঙ্গে সঙ্গে অলস অপরিশ্রমী আরোহী বাবুগণ এবং জড় নৌকাখানাও নদীর পরপারে যায়; কর্ণধারের সঙ্গে যুগবৎ একই সময়ে মুক্ত হইয়া যায়; একা কর্ণধারের পরিশ্রমের ফল সকলে সমানরূপে পাইয়া থাকে।

একখানি প্রিসম্ prism মুক্ত হইলে, গোচর হইতে সরিয়া গেলে সাতটী প্রত্যক্ষ বর্ণ ও বহু অপ্রত্যক্ষ বর্ণ মুক্ত হইয়া শুদ্ধ শুভ্র হইয়া যায়।

একা কৃষ্ণ দ্রৌপদীর অন্নভোজনে তৃপ্ত হওয়ায় দুর্ব্বাসার ও সহস্র শিষ্যের আপনা আপনি ক্ষুন্নিবৃত্তি হইয়াছিল।

একখণ্ড দেশালাইএর ক্ষুদ্র কাষ্ঠিকাবদ্ধ অগ্নি মুক্ত, প্রকট হইলে ঘোর বৃহৎ অন্ধকারের অধীন বৃহৎ গৃহমধ্যস্থ বহু সামগ্রী মুক্ত প্রকট হয়।

একা রাজা অপ্রমত্ত, মুক্ত থাকিলেই লক্ষাধিক প্রজা সদস্যু-দুর্ভিক্ষাদি পীড়ন-বন্ধন হইতে মুক্ত হয়। স্বপ্নভঙ্গও একটী উত্তম দৃষ্টান্ত।

এতাবৎ প্রকৃতিই জয়লাভ করিয়া আসিয়াছে। বহু সাধক তাহা দ্বারা বিনষ্ট হইয়াছে।

এক্ষণে আইস, নারী হও, পুরুষ হও, আমি হই, তুমি হও, মুক্ত ভীম হইতে চেষ্টা কর; মুক্ত চক্ষুদ্বারে প্রকৃতি-দুর্য্যোধনের রন্ধ্রটী লক্ষ্য কর ও তত্র বিষম জ্ঞানগদাঘাত কর এবং স্ব-পর কল্যাণকারী হও।

একের মুক্তিতে সকলের মুক্তি শুনিয়া পাঠক পাঠিকা, স্তম্ভিত, পশ্চাৎপদ হইও না। একের মুক্তিতে বহুর মুক্তিবিষয়ে বিশ্বাস অতিশয় পুরাতন; নূতন নহে। প্রবাদ আছে বংশে একটী সুপুত্র জন্মিলে সপ্তপুরুষ উদ্ধার পায়, এক ভগীরথ জ্ঞানগঙ্গা দ্বারা সগরবংশ অর্থাৎ সকল বংশ উদ্ধারের যত্ন করিয়াছিল। রাবণ লোকটা স্বর্গের সোপান

নিজে স্বকীয় শ্রমে রচনা করিয়া সকলেরই জন্য স্বর্গকে সুগম সুলভ করিতে চাহিয়াছিল। বোধ হয় কুমারিলভট্ট কৃত তন্ত্রবার্ত্তিকে লিখিত আছে যে, বুদ্ধ মহাশয় একদিন সকলকে আহ্বান করিয়া বলিয়াছিলেন যে, যে কেহ পাপী হও আর পুণ্যকৃৎ হও, আমাতে নিমজ্জিত হইলেই মুক্ত হইয়া যাইবে। গোয়ার শিষ্য বাসুদেব প্রার্থনা করিয়াছিল যে, সকল পাপীর সকল পাপ তাহার স্কন্ধে অর্পিত হউক, সে তাহা ভোগ করিয়া শোধ দিবে এবং ইতোমধ্যে সকল জগৎবাসী মুক্ত হউক।

শ্রীমান্ গয়াসুর জীবের কষ্ট দেখিয়া নিজ শরীর স্বর্গ পর্য্যন্ত বর্দ্ধিত করিয়াছিলেন এবং নির্ব্বিশেষে অনুমতি দিয়াছিলেন যে, যে কেহ ইচ্ছা কর, সেই বর্দ্ধিত-কলেবরের উপর দিয়া স্বর্গে যাইতে পার।

মহাপুরুষ যীশু মহাশ্মশানে সকলের পাপ নিজে লইয়া আত্মাহুতি দিয়া যাবতীয় জীবের মুক্তিসাধন করিতে প্রায়াস পাইয়াছিলেন। তিনি পুনঃ পুনঃ বলিয়াছিলেন come unto me and I will give you rest।

এইস্থলে সাধারণতঃ মনুষ্যের একটা অনবধানতা দৃষ্ট হয়। যীশু-কথিত me ও I শব্দে আত্মা বুঝায়, কিন্তু তাঁহার শিষ্যগণ হস্ত-পদাদিবিশিষ্ট সৌম্য সুন্দর যীশুদেহকে বুঝিয়াছিল। শিষ্যগণ নিজ নিজ আত্মাকে না বুঝিয়া বক্তাকে বুঝিয়াছিল। কথাটা বুঝিতে এই আদিম ভ্রম হইয়াছিল। সেই ভ্রম বশতঃই ঠিক মীমাংসাটা গোড়া হইতেই অগোচর থাকিয়া গিয়াছে।

অজপা সকল মানুষের ভিতরেই হংস বা সোঽহং বলিয়া দিতেছে। মানুষ শুনিয়াও শুনিতে পায় না। আপনাকে, আত্মাকে বুঝে না। এই না বুঝার বিপ্রতিপত্তিটাই মানুষের আপদ হইয়াছে।

ঈশ্বর-গীতায় অর্জ্জুন বারম্বার শুনিল যে—

মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাস্তরন্তি তে।
সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোচয়িষ্যামি মা শুচ।
বেদান্তকৃৎ বেদবিদেব চাহং।

"উত্তম" পুরুষ ক্ষরাক্ষর অতীত! অর্জ্জুন মাম্ শব্দে, অহং শব্দে নিজ আত্মাকে না বুঝিয়া বক্তা কৃষ্ণকে বুঝিয়াছিলেন।

ব্যাকরণ গ্রন্থে উত্তম পুরুষ অর্থে যে অহং-তত্ত্বকে নির্দ্দেশ করে, অর্জ্জুন সেই অহং তত্ত্বকে না বুঝিয়া কৃষ্ণকে বেশ ভাল একজন উত্তম গুণবান্ ব্যক্তি বুঝিয়াছিলেন।

মুসলমান্-সন্ন্যাসী সুফি পরমহংসগণ আল্লা ও আল্লার রসুল উভয়কেই আত্মা অদ্বয় বলিয়া জানেন; সাধারণে তাহা ধরিতে পারে না।

কৌষিতকী গ্রন্থে ইন্দ্র প্রতর্দ্দনকে বলিলেন 'মামেব রিজানীহীতি।' প্রতর্দ্দনের ভ্রম হইল। সে বক্তা ইন্দ্রকে বুঝিতে চেষ্টা করিল। স্বস্বরূপাত্মাকে, অহংতত্ত্বকে বুঝিতে হইবে তাহা বুঝিল না।

ব্যাপারটী একেবারে উল্টা। কোথায় ক্ষুদ্র আমি, কোথায় বিশাল জগৎ। বেদান্ত বলে ক্ষুদ্র আমিটা ক্ষুদ্র নহে, সেইটাই বিশাল; বিশাল জগৎটাই ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র, আত্মার একটা ক্ষুদ্র তুচ্ছ বিলাস মাত্র। এরূপ কথা শুনিয়া যীশুশিষ্য বা অর্জ্জুন বা প্রতর্দ্দনের বা অন্য কাহারও ব্যামোহ হইবে তাহা বিচিত্র নহে। "আমরা ক্ষুদ্র" এই সংস্কার খুব প্রবল, তাই আমরা আপনাদিগকে ক্ষুদ্র বালকই মনে করি এবং উক্ত হিত" মহোপদেশ শুনিলে নিজ বালকত্বসংস্কারবশে তাহার অর্থ অবধারণ করিতে পারি না। গুরুমহাশয় পাঠশালে বলিলেন, my head অর্থে আমার মাথা। শিশু-শিষ্য বাটীতে গিয়া পিতৃসমক্ষে আবৃত্তি করিতে লাগিল যে, my head মানে মাষ্টারের মাথা। করুণাময় পিতা বলিয়া দিলেন যে, তাহা নহে my head

মানে আমার মাথা। বালক পরদিন বিদ্যালয়ে আবৃত্তি করিল my head মানে বাবার মাথা। গুরুমহাশয় তর্জ্জন গর্জ্জন সহ বলিয়া দিল তাহা নহে, my head মানে আমার মাথা। ভীত বালক বলিল যে, তবে my head মানে বাড়ীতে বাবার মাথা, পাঠশালায় মাষ্টারের মাথা। এরূপ বোধবিপর্য্যয়ের কোনও প্রতীকার নাই। যথাসময়ে বালকত্ব ঘুচিবার পরে অহং শব্দের কিরূপ প্রয়োগে বক্তাকে না বুঝিয়া নিজ আত্মাকে বুঝিতে হইবে, সহজেই তাহা বুঝা যাইবে।

এই যে একের অভয় নিরঙ্কুশ মুক্তি-স্বাস্থ্যে অপর সকলের মুক্তি হয়, তদ্বিষয়ে কএকটী স্থূল দৃষ্টান্ত মাত্র দেওয়া হইল। দৃষ্টান্তগুলি রোচক ভয়ানক অর্দ্ধসত্য অর্দ্ধমিথ্যা-শ্রেণীভুক্ত। ক্রমে কথাটার অর্থ আরও অধিক শোধন করা হইবে। তখন একটা ভাল পরোক্ষ জ্ঞান হইবে। পরে সেই পরোক্ষকে অপরোক্ষানুভূতিতে পর্য্যবসিত করিতে হইবে। তাহা বড় কঠিন। ভূলা শুনিতে নরম বটে, কিন্তু ধুনিতে লবেজান। কিন্তু অপরোক্ষ করিতে পারিলে লাভও অপরিসীম—গণ্ডার-মারা ও ভাণ্ডার-জয়ের মত। তখন আর অধিক প্রার্থনীয় কিছু থাকিবে না।

অতঃপর শিষ্যের নানা গুরু-সকাশে গমন ও নানা উপদেশ, গ্রহণ পূর্ব্বক, ত্যাগ-পরিপাটীর কৌতুককর গল্পাদি লিপিবদ্ধ করা হইবে। শিষ্যের গুরুজনসহ সবিনয় তর্ক-বিচার দ্বারা অধিকার-বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে আমাদেরও অধিকার-বৃদ্ধি পাইবে ; আমরাও বিশিষ্ট লাভবান্ হইব।

পর-মত পরীক্ষা

(২)

"বক্তুরেব হি তজ্জাড্যং শ্রোতা যত্র ন বুধ্যতে।"

কথাটা সর্ব্বতোভাবে সত্য না হউক সর্ব্বতোভাবে মিথ্যাও নহে। কখনও বা শ্রোতার বুদ্ধিমান্দ্য কখন বা বক্তার। উভয়ই ব্যবহার-জগতে পাওয়া যায়। বক্তার অধিকার-তারতম্যে, গুরুতর বিষয়বিশেষে আদর থাকিলেও দখল থাকে না। দখল থাকিলেও হয় ত মনের ভাব প্রকাশ করিবার উপযুক্ত শব্দের অনাটন হয়। হিতৈষী পুরোহিত তোত্‌লা হইলে হিতাকাঙ্ক্ষী যজমানের বিপদ। যজমানের শ্রদ্ধা থাকিলেও শ্রাদ্ধ সুসম্পন্ন হয় না, অধিকন্তু যদি যজমান বধির হয়, তবে ত ব্যাপারটা প্রহসনমাত্রেই পর্য্যবসিত হয়।

লেখক অভয়বিষয়ে, অপরোক্ষানুভূতি দূরে রহুক, সুন্দর পরোক্ষ-জ্ঞানেরও বড়াই করে না। তবে কিঞ্চিৎ অল্পপরিমাণ পরোক্ষজ্ঞান আছে এবং সেই জ্ঞান অল্প হইলেও বিষয়টীর নিজ গৌরববশতঃ প্রচারযোগ্য, ইহা লেখক বিবেচনা করে। লেখক কিন্তু একটু তোত্‌লা, শব্দাভিধান তাহার অনায়ত্ত। এই মাত্র ভরসা যে, বর্ত্তমান কালের পাঠক-পাঠিকা-গুলি শ্রদ্ধাবান্ ও শিক্ষিত। বধির যজমানের সংখ্যা অনেক কমিয়াছে। এক্ষণে যজমানগণ, তোত্‌লার কথার ত্রুটী, নিজ নিজ শিক্ষার বলে পূরণ করিয়া লয়। 'পার্ব্বতী-সুত-লম্বোদর' শুনিয়া 'পাক দিয়া সূতা লম্বা,' করিতে প্রবৃত্ত হয় না। যীশু বার বার বলিয়াছেন যে, যদি কর্ণ থাকে তবে শুনিতে পাইবে, চক্ষু থাকে দেখিতে পাইবে। যীশুর শ্রোতৃবর্গের ভিতরে সকলের চক্ষু কর্ণ ছিল না। এক্ষণে শিক্ষাবিস্তারের ফলে চোখ-

কানওয়ালা মানুষ দুর্লভ নহে। অভয়ের কথা যদি গুছাইয়া বলিতে পারি, তাহা হইলে যোগ্য শ্রোতার বোধ হয় অভাব হইবে না। হয় ত আমি ধৌত পটাম্বর, বিচিত্র মুকুট, মূল্যবান্ নূপুরাদি সজ্জায় এবং ললিত ভাষায় সাজাইয়া আমার ঠাকুরকে পাঠকপাঠিকার নিকট সমুপস্থাপিত করিতে পারিব না। নাই পারিলাম। ঠাকুর আমার শান্ত, সমান, সুন্দর। তাহাতে অলঙ্কার দিয়া তাঁহার নিজ সহজ শোভাকে অধিক করা যায় না। ঠাকুরটীর নিরলঙ্কার সহজ সৌন্দর্য্য ভাষার কারুকার্য্যের বড় অপেক্ষা রাখে না। আমি ঠাকুরকে দেখাইবার চেষ্টা করিব, তোমাদেরও তাঁহাকে দেখিবার জন্য চেষ্টা করিতে হইবে।

এখন প্রকৃত বিষয়ের অনুসরণ করা যাউক।

অভয়সুখপ্রার্থী শিষ্য ইষ্টপ্রাপ্তির উপায় জিজ্ঞাসা লইয়া নানাপন্থি-গুরু-সকাশে ক্রমে ক্রমে যাইবে। আমরাও তাহার সঙ্গে সঙ্গে যাইব, এইরূপ কথা আছে। আইস যাই।

শ্রমজীবী সম্প্রদায়ঃ—কিয়ার হার্ডী শিষ্যকে বলিলেন যে, উদর-ভরণই পুরুষার্থ। ইহাকে অভয় করিতে হইলে প্রচুর অন্ন সংগ্রহ করিতে হইবে। ক্ষুধার বাড়া শত্রু নাই। ইহাকে জয় করার পরামর্শই জগতে উত্তম।

চক্রগৃহঃ—চার্ব্বাক শিষ্যকে ডাকিয়া লইলেন; বলিলেন যে, বটে, অন্ন তুচ্ছ নহে, কিন্তু অন্ন উত্তম নহে। কৎলুখাঁর বন্দী জগৎসিংহই উত্তম। কেবল গ্রাসাচ্ছাদনে দুঃখ নিবৃত্তি হয় বটে; সাক্ষাৎ-সুখ হয় না। গ্রাসাচ্ছাদন স্বাদু, সুকোমল হওয়া চাই এবং তৎসঙ্গে স্রক্‌চন্দনবনিতাদিও চাই। সংক্ষেপে বলিতে হইলে পঞ্চমকারই উত্তম, মৃত্যুই মোক্ষ; তৎপূর্ব্বে যত পার সুখভোগ করিয়া লও। নীতির প্রতিপালন্ নিজের জন্য নহে; পরকে উপদেশ দিবার জন্য নীতির উল্লেখ করিবে। ঋণ করিয়াও ঘৃত

পান করিবে। ঋণশোধ পার ত করিবে, না পার মহাজনকে তমাদি আইনের কূট সাহায্যে বঞ্চিত করিতে চেষ্টা করিবে। সমাজে যাহা পাপ বলিয়া খ্যাত, গৃহীত, কিন্তু যাহা সুখপ্রদ, তাহার আচরণ করিও। সাবধানে করিও, গোপনে করিও; এবং যাহাতে নিরাপদে সুখ লাভ হয় তজ্জন্য নানা কৌশল অবলম্বন করিও। Tolstoi—in his Resurrection লিখিয়াছেন যে, পরস্ত্রীহরণকারী বলিয়া অভিযুক্ত কোনও এক ব্যক্তি সত্যই অপরাধী কি না স্থির করিতে না পারিয়া জুরীগণ বিলম্ব করিতেছিল। বিচারকের একটী নিমন্ত্রণরক্ষার সময় উত্তীর্ণপ্রায় হইলে বিচারক জুরীদিগকে সত্বর হইতে আদেশ দেন, জুরীরা তাড়াতাড়ি আসামীকে অপরাধী সাব্যস্ত করিল। বিচারক তাহার কঠিন পরিশ্রমসহ দীর্ঘকারাবাস ব্যবস্থা করিয়া অবিলম্বে এজলাস ত্যাগ করিয়া নিমন্ত্রণরক্ষা করিতে যাইলেন। একটী সুপরিচিতা পরনারী বিচারক মহাশয়কে সেই দিন নির্দ্দিষ্ট সময়ে সঙ্কেত-স্থলে অভিসার করিবার নিমন্ত্রণ করিয়াছিল! চার্ব্বাকের মতে বিচারক পাপী নহে; বিচারক যদি নির্ব্বুদ্ধিতাবশতঃ ধরা পড়িয়া নিজে আসামী শ্রেণীভুক্ত হয়, তবেই সে পাপী হইবে, নচেৎ নহে। বোকামীই পাপ; যেন তেন প্রকারে সুখভোগ নিরাপদে হইলে তাহা পাপ নহে।

শিষ্যের হৃদয় চার্ব্বাকের কথায় গুরু গুরু করিতে লাগিল। শিষ্য নীতির মর্য্যাদা-লঙ্ঘন-সংস্কার সম্পূর্ণ অর্জ্জন করে নাই। পরলোক অপ্রত্যক্ষ বলিয়া যে অবাস্তবিক, তাহা বলিতে তাহার স্পৃহা হয় না। প্রবাসী স্বামী অপ্রত্যক্ষ। কিন্তু তাহার হস্তাক্ষরলিপিদৃষ্টে ভার্য্যা জীবিত স্বামীর অস্তিত্বে অসন্দিহান থাকে এবং সিন্দূর শঙ্খ মোচন করে না। স্বামীর হস্তাক্ষর-লিপির মত পরলোকস্বামীর অল্প বিস্তর সংবাদ সকল মনুষ্যই মধ্যে মধ্যে হৃদয় গোচরে পাইয়া থাকে। সুতরাং চার্ব্বাকের অনুমো-

দিতসুখ অভয় হইল না। পরলোকের ভয়যুক্ত হইল। অধিকন্তু ইহলোকেও উক্তরূপ সুখ ভয়বিদ্ধ। ঘৃতপানের জন্য ঋণই বা প্রত্যহ পাওয়া যায় কোথায়? ভোগ-সামগ্রী যদি নীতিপূর্ব্বক বা অনীতিপূর্ব্বক আহরণই করা যায়, তাহাতেও তৃপ্তিই বা কিরূপে হইতে পারে? ইন্দ্রিয়বর্গের ভোগ দিবার সামর্থ্য অত্যন্ত সীমাবদ্ধ হওয়ায় নিরতিশয়-ভোগ-সম্ভাবনা নাই। প্রত্যহ ঘৃতান্ন যোগান হইলেও উদরাময়ের ভয় আছে। নটীর নৃত্য-বিলাস উত্তম বোধ হইলেও নিদ্রা বলপূর্ব্বক লম্পটের চক্ষু অন্ধ করিয়া দেয়। শিষ্য চার্ব্বাক-সঙ্গ ত্যাগ করিয়া উপস্থিত হইল—যন্ত্রাগারে।

যন্ত্রাগার—তত্রস্থিত বৈজ্ঞানিক সরল, সাহসী, স্পর্দ্ধাশূন্য। বৈজ্ঞানিক বলিল, ধারাবাহিক অভয় সুখ আমিও খুঁজিতেছি। আমিই পাই নাই; হে শিষ্য, তোমাকে দিব কি? যদি পাই, তবে আমি জগতের সকলকেই তাহা দিব। আমার বিশ্বাস, প্রকৃতিগত একটা অদ্বিতীয়, অলঙ্ঘ্য নিয়ম আছে। তাহার আবিষ্কার করিতে পারিলে আমরা প্রকৃতিকে সম্পূর্ণ অধীন করিব এবং তাহাতে আমাদের ভবিষ্যতে দুঃখলেশ-সম্ভাবনা-রহিত ধারাবাহিক অভয় সুখ হইবে। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, সে নিয়মটীর উদ্দেশ এতাবৎ পাওয়া যায় নাই। হাজার বৎসর ধরিয়া যাহা যাহা অভ্রান্ত বলিয়া বুঝিতেছিলাম, এক মুহূর্ত্তের একটী ব্যভিচার দৃষ্টে তাহা মিথ্যা হইয়া পড়িতেছে। কখন কখন মনে হয়, বুঝি অলঙ্ঘ্য, অদ্বিতীয় নিয়ম কিছু নাই, হয় ত নিয়মের অভাবই প্রকৃতির অদ্বিতীয় নিয়ম। যথা স্বপ্নসময়ে ব্যাপারগুলি বেশ নিয়ত বলিয়াই বোধ হয়; নিয়মের ব্যতিক্রম দৃষ্ট হয় না, কিন্তু স্বপ্নভঙ্গে নিয়মাভাব বুঝা যায়। হয় ত একদিন এমন আসিবে যে, তখন জগৎ-ব্যাপারে নিয়মের অভাব দেখিলে বিস্মিত হইতে হইবে না।

কতকগুলি ক্ষুদ্র খুচরা অপ্রধান নিয়ম পাওয়া গিয়াছে। কিন্তু

দেখিতেছি, তাহাতে বিশেষ সুফল কিছু হয় নাই। বরং স্থলবিশেষে হিতে বিপরীত হইয়াছে।

যবক্ষার গন্ধক অঙ্গারের যেরূপ সংযোগে ঘনীভূত শক্তিমান বারুদ পাওয়া যায়, তাহা আবিষ্কার করিয়াছি। অবশ্য তাহাতে বড় বড় পাহাড় ভগ্ন করিয়া চলিবার পথ প্রশস্ত ও সুগম করিয়া জগতের উপকার করিয়াছি বটে, কিন্তু শতকোটীর অপেক্ষা অধিক লোকেরও হত্যা সম্পাদন করিয়াছি।

বস্ত্রবয়নের নিয়মটা পাইয়া প্রচার করায় বহু বৃদ্ধ তন্তুবায় হঠাৎ নিরন্ন হইয়া পড়িয়াছে। তাহাদের নূতন জীবিকা কিছু দিতে পারি নাই।

পশুলোমের সহ তাপের সম্বন্ধ বুঝিয়া লইয়া বহু কম্বল প্রস্তুত করিয়াছি। সব কম্বল বিক্রয় হইতেছে। যত কম্বল বাড়িতেছে, ততই শীত বাড়িতেছে। পূর্ব্বে শীত সহ্য করিবার সামর্থ্য বেশী ছিল, তাহা কমাইয়া দিয়া যে ভালই করিয়াছি, এমন কথা নিশ্চয় করিয়া বলিতে সাহস হয় না।

নয়ন-তারার সহ আলোক-তরঙ্গের সম্বন্ধ-রহস্য উদ্ঘাটিত করিয়া বাজারে চসমা পাঠাইয়াছি। চসমার খরিদ্দারের সংখ্যা-বাহুল্যে মনে হয় যে, চক্ষুষ্মান্ লোককেও হয় ত অন্ধ করিয়া ফেলিতেছি। মন্দান্ধকে অন্ধতর করিতেছি।

পূর্ব্বকালে মানুষের দুগ্ধ মানুষেই খাইত; গোরুর দুগ্ধ গোরুতে খাইত। দেখিলাম একটি নিয়ম যে, বালক মাতৃস্তন্য পান করিলে জননীর শরীর দুর্ব্বল হয়; ঘাস বস্তুকে, গাভীর উদরস্থ করিয়া, কৌশলে দুগ্ধ প্রস্তুত করা যায় ও সেই দুগ্ধ জননীর স্তন্যের উত্তম প্রতিনিধি। ইহা একটি বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার। ইহাতে প্রতিকার হয় নাই; দেখা যায় যে জননীগণ পূর্ব্বে সন্তানগণকে স্তন্যদান করিয়াও সংসারে যতটা পরিশ্রম

করিয়া স্ব-পর কল্যাণকারিণী ছিলেন, বর্ত্তমানকালে তদপেক্ষা অল্প শ্রম করিতে হইলেও তাঁহারা মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়েন। অধিকন্তু গোবৎসগুলি স্বাধিকার হইতে বৈজ্ঞানিক দ্বারা বঞ্চিত হইয়াছে।

নিরাবরণ ভট্টাচার্য্যের অসভ্যতা অপেক্ষাকৃত ভাল ছিল। উপর্য্যুপরি তিনটা জামা পরিধান করিয়া বৈশাখের দিবা দ্বিপ্রহরে তড়িৎ পাখার বায়ু-সেবন-বিধান-রূপ বৈজ্ঞানিক সভ্যতাকে ঠিক সুব্যবস্থা বলা যায় না।

যাহা হউক একটা কথা অকপটে স্বীকার আমরা করিব যে, প্রত্যক্ষকে সম্পূর্ণ অবিশ্বাস করিতে শিখাইয়া বৈজ্ঞানিক জগতের যত উপকার করিতেছে, এত উপকার আর কেহ করে নাই। এ বিষয়ে বৈজ্ঞানিক অপেক্ষা আর কেহ আমাদের অধিক কৃতজ্ঞতাভাজন নহে। বৈজ্ঞানিক প্রত্যক্ষটীকে লইয়া যন্ত্রাগারে পরীক্ষা করে। প্রায়ই বৈজ্ঞানিকের জেরায় প্রত্যক্ষের সাক্ষ্য টেঁকে না। ইহাতে বৈজ্ঞানিকের অপেক্ষা বৈদান্তিকের লাভ বেশী হইয়াছে। পুরাতন গুরুমহাশয় বলিতেন পৃথিবী ঘুরে না, ঘুরিলে মাথা ঘুরিত; আমরা তাহাই বেদবাক্যের মত, নিঃসংশয়ে বিশ্বাস করিতাম। গ্যালিলীও বলিলেন, পৃথিবী ঘোরে; মূর্খ স্বার্থপর রাজশক্তি, গ্যালিলীও সেই কথায় সনাতন ধর্ম্মবিশ্বাসের উচ্ছেদ চেষ্টা করিল, বলিয়া গ্যালিলীওকে কারাগারে নিক্ষেপ করিল। কিন্তু পৃথিবীকে স্থির রাখিতে পারিল না, পৃথিবী ঘুরিতেই থাকিল। বৈজ্ঞানিকেরই জয়, হইল। আমাদের উপকার হইল; পৃথিবীর প্রত্যক্ষ স্থৈর্য্য যে মিথ্যা, তাহা প্রমাণ হইল। আমাদের অনুসন্ধিৎসা সহসা জাগিয়া উঠিল; আমরা বৈজ্ঞানিকের পদতলে বসিয়া আরও কতশত প্রত্যক্ষ অথচ ভ্রমগুলি বৈজ্ঞানিকের শ্রীমুখ-বচন-প্রমাণে শোধন করিয়া লইলাম। সূর্য্যালোক প্রত্যক্ষ শুভ্র হইলেও যে তাহা শুভ্র নহে, নীললোহিতাদি বহুবর্ণের সমবায় মাত্র, তাহা জানা গিয়াছে। লাল স্ফটিক, লাল জবাচ্ছায়ায় লাল হইয়াও লাল হয়

নাই; জবাই নিজে লাল নহে; সূর্য্যকিরণগত লালকে জবা নিজস্ব না করিয়া লালকে পরিত্যাগই করে। পৃথিবী দেখিতে সমতল, কিন্তু সমতল নহে; তাহা বর্ত্তুলাকার। চন্দ্রের ব্যাস প্রত্যক্ষদর্শনে বিতস্তিপরিমাণ, কিন্তু তাহা আসলে বহুযোজনবিস্তৃত। বালকে দর্পণগত প্রতিবিম্বকে সত্য বস্তু বলিয়া প্রত্যক্ষ করিয়া আদর করে, কিন্তু তাহা আদরযোগ্য নহে। অভিনয়ের বা খড়ের রাক্ষস প্রত্যক্ষ করিলে বালকে ভীত হয়। কিন্তু বৈজ্ঞানিক তাহাকে ভীষণ বুঝে না, প্রত্যক্ষ ভীষণকে নিরপরাধ শান্তই বুঝে। সিংহচর্ম্মাবৃত হইলেও গর্দ্দভকে বৈজ্ঞানিক ধরিয়া ফেলে, প্রত্যক্ষ-দৃষ্ট শূন্য স্থলীতে অণুবীক্ষণাদি যন্ত্রসাহায্যে বহু বস্তুর সমাবেশ দেখাইয়া দেয়। প্রত্যক্ষ-দৃষ্ট স্থির দীপশিখাটি যে স্থির বস্তু নহে, অসংখ্য শিখার দ্রুতপ্রবাহ, তাহা বুঝাইয়া দেয়। আমরা প্রত্যক্ষ দেখি যে, মানুষের মস্তকটী পায়ের উপর স্থাপিত, কিন্তু বৈজ্ঞানিক বলিয়া দেয় মস্তিষ্ক-গৃহীত মানুষটী উর্দ্ধপদ, অবাক্-শিরঃ। প্রকাণ্ড দীর্ঘ বাঁশ যে তুচ্ছ তৃণ, তাহা বৈজ্ঞানিকই প্রমাণ করিয়াছে। এতদ্বিধ নানা দৃষ্টান্ত উদাহৃত করিয়া দেখান যাইতে পারে যে, আজীবন প্রতিপালিত প্রত্যক্ষ-প্রমাণসিদ্ধ সংস্কার-গুলি বৈজ্ঞানিকের পরীক্ষায় অসিদ্ধ হইয়াছে।

বৈজ্ঞানিকের উপদেশ এই যে, প্রত্যক্ষকেই লও। কিন্তু তাহাকে অবিশ্বাস কর। যন্ত্রাগারে মূষা বা নিকষে পরীক্ষা করিয়া প্রত্যক্ষকে শোধিত করিয়া গ্রহণ কর। প্রায়শঃ যন্ত্রাগারের পরীক্ষায় প্রত্যক্ষ বিপরীতটীরই সত্যত্ব প্রতিপাদিত হইয়া পড়ে। তাহাতে আমাদের সাহস এত বাড়িয়াছে যে, সত্যানুসন্ধানকালে কোনও বস্তু প্রত্যক্ষ করিয়া, তাহার বিপরীতটীকেই, বিনাপরীক্ষায়, সত্য ও প্রত্যক্ষীকৃত বস্তুটীই মিথ্যা, ইহা স্বীকার করিতে কুণ্ঠা হয় না। চন্দ্রের জ্যোৎস্না চন্দ্রের নিজস্ব নহে, তাহা সূর্য্যেরই; ইহা বুঝিবার পরে সূর্য্যের দীপ্তি যে সূর্য্যের নিজস্ব নহে

অপর কাহারও হইবে, ইহা সহজেই, কোন বিবাদ না করিয়া, স্বীকার করিতে প্রবৃত্তি আমাদের হয়। শ্রুতি যখন বলে যে, আত্মাকে দেখাইবার জন্য সূর্য্যরূপ মশালের প্রয়োজন হয় না; ন তত্র সূর্য্যো ভাতি ন চন্দ্রতারিকা ন বিদ্যুতাগ্নিঃ; বরং সূর্য্যাদি সেই আত্মার নিকট হইতে কর্জ্জ করিয়া জ্যোতিঃ পাইয়াই নিজেরা ক্ষুদ্র জ্যোতিষ্ক হইয়াছে, তখন কথাটার ভিতরে যে কোন সার নাই, এমন বিবেচনা হয় না। যাহা হউক, আমরা বিনাবিচারে প্রত্যক্ষকে ফাঁসি দিব না; অথচ বিনাবিচারেও ছাড়িয়া দিব না। ঈশ্বর-গীতায় লেখা আছে আমরা বড় অবোধ, যাহা দেখি তাহাই বিশ্বাস করি; অতস্মিন্ তৎবুদ্ধি করি; সুতরাং আমরা যাহাকে দিবা বলি তাহা কিন্তু নিশাই; এবং সেই নিশাতে আমরা যাহা প্রত্যক্ষ করিয়া সত্যবুঝি, তাহা ভ্রমদর্শনই। কিন্তু নিশা বৈজ্ঞানিকের কাছে বস্তু গোপন করিতে পারে না। নিশাকালেও বৈজ্ঞানিক বস্তুর যাথাতথ্য নিশ্চয় করিয়া লয় বলিয়া আমাদের নিশা-কালও বৈজ্ঞানিকের নিকট দিবার মত। বচনটী এই যে "যা নিশা সর্ব্বভূতানাং তস্যাং জাগর্ত্তি সংযমী।" বস্তুর স্বরূপের অগ্রহণ হয় অন্ধকারে এবং অন্যথা-গ্রহণ হয় মন্দান্ধকারে, যথা রজ্জুসর্পদর্শন সময়ে কি অন্ধকার কি মন্দান্ধকার উভয়ই সত্যসম্বন্ধে, নিশাই। বুদ্ধিমান্দ্যাই অন্ধকার নিশা, এবং মন্দান্ধকার ও গীতোক্ত নিশা।

বৈজ্ঞানিক শিষ্যকে প্রকৃতির অলঙ্ঘ্য নিয়মটী দিতে অসমর্থ হইল, নিজেই তাহা আবিষ্কার করিতে পারে নাই। সুতরাং প্রকৃতিকে সম্পূর্ণ বশীভূত করিয়া তাহাকে আমাদের সুখসাধনে নিয়োগ করার সন্ধান বৈজ্ঞানিকের নিকট পাওয়া গেল না। কিন্তু প্রত্যক্ষকে অবিশ্বাস করাই কল্যাণকর, এই বৈজ্ঞানিক উপদেশকে শিষ্য দৃঢ় কবচ বলিয়া গ্রহণ করিল। তাহাতে ঘটিল এই যে, ভ্রম মহাশয়কে, এই দৃঢ় রক্ষাকবচসন্নদ্ধ শিষ্যকে বিদ্ধ ও পাতিত করিবার আশা ত্যাগ করিতে হইল।

যজ্ঞশালা :—শিষ্য বৈজ্ঞানিককে সবিনয় নমস্কারপূর্ব্বক যন্ত্রাগার হইতে যজ্ঞশালায় জৈমিনীর নিকট উপস্থিত হইল। জৈমিনীর উপদেশ এই যে, অভয় সুখ ইহজগতে পাইবে না। পরলোকে পাইতে পার। যদি কর্ম্মের উপাসনা যথোচিত প্রকারে কর, তবে স্বর্গ ও তত্র কাম্য প্রাপ্তি হইবে। দুইটী মত প্রচলিত আছে। একটী এই যে স্বকর্ম্মফলভুক্ পুমান্ ; অপরটী এই যে, হৃষীকেশ মানুষের হৃদয়ে থাকিয়া মানুষকে অবশভাবে কর্ম্ম করিতে বাধ্য করেন, কর্ম্মে সু বা কু কিছু নাই ; মানুষ কর্ম্মের জন্য দায়ী নহে। মানুষ যন্ত্রবৎ। তাহার স্বাধীন ইচ্ছাবশে নিজকৃত কর্ম্ম কিছু নাই। যন্ত্রে অধিষ্ঠান করিয়া ঈশ্বর-যন্ত্রকে যথেচ্ছ চালনা করেন। ঈশ্বর নিজ লীলা পোষণের জন্য নানা মানুষযন্ত্রকে নানা বিচিত্র কর্ম্ম করিতে বাধ্য করেন। বিচিত্র কর্ম্মগুলি ভাল বা মন্দ নহে। জগৎটী একটী সুবৃহৎ অভিনয়লীলা মাত্র। তত্র কর্ম্মগুলি ও কর্ম্মকর্ত্তাগুলিও অভিনয়ের মাত্র। অভিনয়ের পরপীড়ন ব্যাপার, অভিনয়ের রাবণ, দুঃশাসন কুকুরাদি দ্বারা সংঘটিত হয় এবং অভিনয়ের রামের, ভীম, মুদ্গরাদি দ্বারা শাসনক্রিয়া সম্পাদিত হয়। জৈমিনীর মতে এই দ্বিতীয় মতটী অসার, বাতীল ও নামঞ্জুর। এবং প্রথম মতটী অর্থাৎ কর্ম্মই ভোগায়তন দেহ-দাতা এবং ভোগদাতা এই মতটীই সমীচীন। জৈমিনীর অজ্ঞাত ছিল না যে, "কর্ম্মফল" মতে একটী বিশেষ দোষ আছে ; তাহার নাম অন্যোন্যাশ্রয়, অনবস্থা বা অন্ধ-পরম্পরা। কর্ম্ম, ভোগায়তন ভবিষ্যৎ দেহ-দাতা হইলে বর্ত্তমান দেহ কোথা হইতে আসিল, এই প্রশ্নের উত্তরে স্বীকার করিতে হয় যে, তাহা অতীত কর্ম্মের ফল-স্বরূপ পাওয়া গিয়াছে। পুনঃ প্রশ্ন উঠে যে, অতীত কর্ম্ম করিবার জন্য যে একটী দেহ ছিল, তাহার হেতু কি ? এইরূপে পূর্ব্বে কর্ম্ম, উত্তর-কালে ফলরূপ দেহ, কিংবা পূর্ব্বকালে দেহ, উত্তরকালে সেই দেহ দ্বারা

কর্ম্ম সম্পাদিত হয়, ইহার ব্যবস্থিত মীমাংসা পাওয়া যায় না; অনবস্থা দোষটীর পরিহার হয় না। বীজাঙ্কুর দৃষ্টান্তে বীজ ও বৃক্ষের কোন্‌টী হেতু, কোন্‌টী ফল, অগ্রে বীজ পরে বৃক্ষ, কিংবা অগ্রে বৃক্ষ পরে বীজের জন্ম, তাহার সুনির্দ্দেশ হয় না। সুতরাং "কর্ম্মদেহ" ব্যাপারের হিসাব-নিকাশ করিবার জন্য, তুল্য দোষদুষ্ট বীজাঙ্কুর-দৃষ্টান্তের গ্রহণে শঙ্কাপ্রশ্নের জটিলতা পরিষ্কৃত হয় না, গোলযোগ যথাপূর্ব্ব থাকিয়া যায়। একটী অন্ধকে অপর একটী অন্ধ পথ দেখাইতে পারে না।

জৈমিনী কিন্তু উক্ত দ্বিতীয় মতে নিজ অপরিতোষ বশতঃ অগত্যা এই প্রথমোক্ত অনবস্থা-দোষদুষ্ট "কর্ম্মফল" মতকেই নিজে আশ্রয় করিয়াছেন ও অপরকে আশ্রয় করিতে উপদেশ দিয়াছেন। আমরা এই "কর্ম্মফল" মতটী নির্দ্দোষভাবে প্রতিপাদিত না হইলে গ্রহণ করিতে কুণ্ঠিত। কিন্তু ইহা আমাদের স্বীকার করিতে হইবে যে, জৈমিনীর উক্ত দ্বিতীয় মতে অপরিতোষের যথেষ্ট হেতু ছিল এবং তাহা আমরা নিজে নিজেই স্পষ্টই বুঝিতে পারি এবং আমরাও উক্ত দ্বিতীয় মতটীকে হঠাৎ গ্রহণ করিতে সাহস করি না। কর্ম্মে সু, কু, পুণ্য, পাপ, নাই, কেমন করিয়া বলিব? আমাদের মনের গোচরে একটা না একটা কর্ম্মে পাপ পুণ্যভেদ, পদে বিদ্ধ কণ্টকের মত, সাক্ষাৎ বর্ত্তমান রহিয়াছে। একই কর্ম্মে হয় ত আমার পুণ্যবোধ, যথা শাক্তের পশুবলিতে; সেই কর্ম্মেই হয় ত তোমার পাপ-বোধ, যথা বৈষ্ণবের পশু-হিংসায়। বিষয়ে ভিন্নতা থাকে থাকুক, কিন্তু কি শাক্ত কি বৈষ্ণব, প্রত্যেকেরই পাপপুণ্য বোধ আছে। একেবারে পাপত্ব পুণ্যত্ব মোটেই নাই, মানুষ নিজে কোনও কর্ম্মের জন্য দায়ী নহে, সমস্ত জগৎ-ব্যবহারই ঈশ্বরের লীলা মাত্র, অভিনয়ের পাপ পুণ্যবৎ নির্দ্দোষ, ইহা যখন মনের গোচর নহে, তখন সুতরাং এই মত গ্রহণ করা আমাদের মত অমুক্ত সাধকের পক্ষে অসাধ্য। তাই জৈমিনী, কর্ম্মফল-

মতটী শুদ্ধ-নির্দ্দোষ না হইলেও, অনবস্থা দোষ দুষ্ট হইলেও, অগত্যা গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু শিষ্য লোকটা নৈয়ায়িক বৈজ্ঞানিকের কৃপাপাত্র, তর্ক কলহ-নিপুণ; সে অনবস্থা দোষ বা অন্য কিছু দোষ-লেশযুক্ত মত স্বীকার করিবে না; অভয় সুখ-প্রাপ্তির নির্দ্দোষ উপায় যজ্ঞশালায় না পাইলে জৈমিনীকে ত্যাগ করিয়া অন্যত্র সন্ধান করিবে। আপাততঃ জৈমিনীর নিকটে যাহা বস্তু আছে, শিষ্য তাহার বিলক্ষণ আলোচনা বিচার করিবে। জৈমিনীর কথা এই যে, ঠাকুর মরে না, ঠাকুরের কলেবর বদল হয়। মানুষের দেহ-মন্দিরে আত্মা-ঠাকুর আছে। দেহের পতন হইলেও আত্মা মরে না, বাঁচিয়া থাকিয়াই পরলোকে যায় ও তত্র নরক দুঃখ বা স্বর্গসুখ ভোগ করিবার জন্য কোনও একটা দেহ আশ্রয় করে। প্রয়োজনমত বাসাবাটী ত্যাগ করিয়া অন্য বাসগৃহে প্রবেশ করার মত আত্মার কর্ম্মফল রূপ ভোগায়তন নূতন দেহ-প্রবেশ ঘটিয়া থাকে। জৈমিনী বলেন যে, তুমি সাবধানে মদুপদিষ্ট কর্ম্ম, অঙ্গহীন না হয়, এমন ভাবে অনুষ্ঠান কর; তুমি পরে স্বর্গে দেবদেহ পাইয়া অভয় সুখভোগ করিও। গুটীপোকা যথা না মরিয়াই পূর্ব্বদেহ বর্জ্জন পূর্ব্বক অত্যন্ত বিলক্ষণ প্রজাপতিদেহ স্বীকার করে, মানুষ যথা মা মরিয়াই জাগ্রৎ দেহ বিসর্জ্জন পূর্ব্বক স্বাপ্নিক নূতন দেহ আশ্রয় করে; তদ্বৎ যাজ্ঞিক তুমি না মরিয়াই ঐহিক দেহ ত্যাগ ও দেবদেহাশ্রয় করিয়া বিনা বিঘ্নে যৎপরোনাস্তি স্বর্গসুখ ভোগ করিতে পারিবে। যজ্ঞই কর্ম্ম, কর্ম্মেই ভোগায়তন দেহ ও কর্ম্মেই স্বর্গফল ভোগ। ফলদাতা কর্ম্মের সম্যক্ অনুষ্ঠান কর। একটা কথা বলিব, তাহাতে উপহাস করিও না। কর্ম্ম, অনুষ্ঠান-কারীকে যে ফল দেয়, তাহা বাধ্য হইয়া দেয়। কর্ম্ম কর্ম্মীর উপর সুতরাং ঠিক সদয় নহে। কর্ম্ম অঙ্গহীন ভাবে অনুষ্ঠিত হইলে, সেই ছলে, কর্ম্ম, ফল দেয় না। সুতরাং কর্ম্মী অপ্রমত্ত থাকিয়া ঠিক নিয়মমত কর্ম্ম করুক, কোনও যেন

ত্রুটী না থাকে। মন্ত্রের উচ্চারণে দোষই সর্ব্বপ্রধান ত্রুটী। ‘ইন্দ্রশত্রু’ শব্দের উচ্চারণভেদে দুইটী অর্থ হয়। ইন্দ্র যাহার শত্রু সেই বৃত্রই, ইন্দ্রশত্রু শব্দের লক্ষ্য হইতে পারে। এবং ইন্দ্রই শত্রু, সেই ইন্দ্রই ইন্দ্রশত্রু শব্দের লক্ষ্য হইতে পারে। বৃত্র মহাশয় যজ্ঞাগ্নিতে “ইন্দ্রশত্রু হত হউক” এই মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া পূর্ণাহুতি দিয়াছিল। তাহার ইচ্ছা ছিল ইন্দ্রের মৃত্যু হয়, কিন্তু বৃত্রের উচ্চারণদোষে মন্ত্রগত ইন্দ্রশত্রু শব্দ বৃত্রকেই বুঝাইয়াছিল এবং বৃত্র নিজেই হত হইয়াছিল ; ইন্দ্র মরে নাই।

এই বিষয়ে লৌকিক দৃষ্টান্তও আছে। “রাম একটা ঘোড়া দাও” এই মন্ত্র এক ব্যক্তি দীর্ঘকাল জপ করিয়াছিল। লোকটার উচ্চারণে দোষ ছিল। একদা এক সিপাহীর প্রিয় অশ্ব মরিয়া যায়। সে নিকটে জাপককে দেখিয়া বলপূর্ব্বক তাহার স্কন্ধে মৃত ঘোড়াটী চাপাইয়া দেয়। এবং অশ্বটীর কবরস্থান পর্য্যন্ত জাপক সেই মৃত ঘোড়াটী বহন করিয়া লইয়া যায়। বহনকালে জাপক ভাবিয়াছিল যে. রাম উল্টা বুঝিয়াছে। জাপক চড়িবার ঘোড়া চাহিয়াছিল, রাম বহিবার জন্য ঘোড়া দিল। জৈমিনী বলেন রাম দোষী নহে, রাম উদাসীন, রাম ভাবগ্রাহী হইয়া ঝঞ্ঝাট স্বীকার করিতে রাজী নহে। যত দোষ ঐ জাপকের উচ্চারণের ; চড়িবার জন্য যে ঘোড়া তাহার উচ্চারণ উদাত্ত এবং বহিবার জন্য অনুদাত্ত ; জাপক অনুদাত্ত জপ করিয়াছিল, দোষ তাহারই।

হে শিষ্য, তুমি কিছুদিন ধরিয়া উচ্চারণ দোরস্ত কর। শিষ্য সুতার্কিক। শিষ্য জেরা করিয়া জৈমিনীকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিল। বলিল যে এই লোকেই, হস্তামলকবৎ, অভয় সুখের বিধান ত পাওয়া গেলই না, অধিকন্তু আয়াসবহুল ব্যাকরণপাঠ, উপবাস, কায়ক্লেশাদিসাধ্য ব্রতধারণাদি দুঃখের বেশ বন্দোবস্ত পাওয়া গেল। ধ্রুব ত্যাগ ও অধ্রুব উপাসনা-পদ্ধতি অর্থাৎ ধ্রুব ঐহিক সুখবর্জ্জন ও অনিশ্চিত অপ্রত্যক্ষ

স্বর্গসুখের আশার আরাধনা-প্রণালী শিষ্যের পরিতোষজনক হইল না।

"অপিচ স্বর্গসুখ অভয় নহে। সভয়ই। স্বর্গভোগ ক্ষয়িষ্ণু এবং ভোগ-কালেই স্বর্গে মর্য্যাদার তারতম্য আছে। রাজা ইন্দ্র, প্রজা বরুণ আছে। সুধা, পারিজাত ঐরাবতাদি তত্র সুলভ হইলেও, নিরঙ্কুশ-সুলভ নহে। ইন্দ্ররাজ যখন উর্ব্বশী ঐরাবতাদি ভোগ করিতে থাকেন, তখন বরুণাদি অধীনগণ কামী হইয়াও অতৃপ্তাবস্থায় অবসর প্রতীক্ষা করিতে বাধ্য হয়। স্বর্গে অশ্বিনী নামে বৈদ্য আছে, তবেই স্বর্গে রোগ আছে। রোগভয়, ভয়ই; স্বর্গ সুখকে অভয় হইতে দেয় না। স্বর্গে অপরাধ নামে ইন্দ্র-রাজেরও শাসনকর্ত্তা বর্ত্তমান, অপরাধী নহুষাদির মত ইন্দ্রত্ব হইতে পতন হয়। স্বর্গসুখ অভয় নহে; তাহা সভয়ই, বুঝিয়া শিষ্য যজ্ঞশালা ত্যাগ করিল।

পার্ব্বত্য-গুহা:—বলিষ্ঠকায়, সুস্থ, অল্পে তুষ্ট, একান্তবাসী, হাস্যবদন জনৈক উদাসীন শিষ্যকে বলিল, পলায়নই অভয় সুখপ্রাপ্তির অদ্বিতীয় উপায়। পিতামাতা, ভাই বন্ধু প্রভৃতির সঙ্গলিপ্সা আমারও ছিল, ও তাহাদিগকে আদর করিয়া ও তাহাদের নিকটে আদর পাইয়া সুখী হইব, বড় আশা ছিল। কিন্তু আমার ও আমার ন্যায় সকলেরই আশা ভঙ্গ হইয়াছে। তথাপি লোকে এখনও লোকালয়ে, স্বার্থপূর্ণ কুটুম্ব প্রতিবাসিগণের নিকটে থাকিয়া কৌশলে সুখ পাইবার চেষ্টা করিয়া বৃথাই অমূল্য জীবন অতিবাহিত করিতেছে। জগতে সুখলেশ নাই। দুঃখই মধ্যে মধ্যে সুখরূপ ধারণ করিয়া, কণ্ঠলগ্না সুন্দরীর মত, কপট মায়া বিস্তার করে; পরে সেই ক্ষণিক সুখের অবসান হয়। মানুষ পুনরায় সেইরূপ সুখের পুনঃ প্রাপ্তির জন্য যত্ন করে। প্রায়ই পায় না। কদাচিৎ পায়। সুখের কাদাচিৎকতাও দুঃখে পর্য্যবসান সুনিশ্চিতই; কিন্তু মানুষ তথাপি

সংসারে উন্মত্তবৎ লিপ্ত। সংসারটা দক্রুর মত, অনবরত চুলকাইতে হয়। বটে চুলকাইয়া কিছু সুখ হয়। সেই কিম্ভূত অধম সুখে মগ্ন থাকা বুদ্ধির পরিচায়ক নহে। শিষ্য, তুমি সংসার হইতে পলাইয়া অরণ্যে আইস। তোমার অভয় সুখ হইবে। তুমি সংসার-লিপ্ত গুরুর নিকট "গার্হস্থ্যই কর্ত্তব্য" "জনক রাজার মত নির্লিপ্ত ভাবে সংসার করাই মুক্তির পথ" এরূপ উপদেশ গ্রহণ করিও না। একদা একটী হাঁপকাশ রোগীকে চিকিৎসা করিবার জন্য আহূত চিকিৎসক রোগীর দ্বারদেশে আসিয়া বসিয়া পড়িল ও বলিল যে, কিঞ্চিৎ বিলম্ব কর, আমি বাটীর ভিতরে রোগীকে দেখিতে যাইবার পূর্ব্বে একটু বিশ্রাম করিয়া লইব; আমার হাঁপকাশ বৃদ্ধি পাইয়াছে। রোগীর অভিভাবক বুদ্ধিমান ছিল, বলিল তুমি নিজের হাঁপকাশ আরাম করিতে পার নাই, তুমি রোগীর উপকার করিবার সাহস কি হিসাবে কর। তুমি ফিরিয়া যাও; তোমার দ্বারা রোগীর চিকিৎসা করাইব না। সংসারী গুরু হাঁপ-কাশযুক্ত চিকিৎসকের মত, হাঁপকাশযুক্ত সংসারীর কোনও উপকারে লাগিতে পারে না। শিষ্য, তুমি সংসারকে হঠ পূর্ব্বক ছাড়িয়া পর্ব্বত—গুহাতে আসিয়া বসবাস কর। দেখ নিদ্রার পূর্ব্বকালেই শয্যার তদ্বির। নিদ্রিত হইলেই, শয্যা দুগ্ধফেননিভ, কি কঠিন দারুখণ্ড; কি কঠিনতর পাষাণ, তাহার কোন বিচার থাকে না। ক্ষুন্নিবৃত্তি ঘৃতান্নেও হয়, অল্প ভাজা-ছোলাতেও হয়। খাদ্যের তারতম্য আছে, কিন্তু ফলে অর্থাৎ ক্ষুন্নিবৃত্তিতে তারতম্য নাই। তুমি ফল বিষয়ে লক্ষ্য রাখ, অল্পে তুষ্ট হইতে অভ্যাস কর। গুহাতে বিলাস-সামগ্রী মিলিবে না বটে, কিন্তু ক্ষুন্নিবৃত্তি ও নিদ্রা বিশ্রামাদির জন্য অযত্নসিদ্ধ সুমিষ্ট-ফল-সমৃদ্ধ আরণ্য বৃক্ষগণ হইতে আহার্য্য ফল, দুঃস্বপ্নরহিত গাঢ় নিদ্রার জন্য গুহামধ্যে শীতল শিলাতট মিলিবে। ভবিষ্যতে শিশুর

জগতে আগমন প্রতীক্ষায়, জননী যথা, সর্ব্বস্ব হইতে বক্ষে দুগ্ধ-কলস ধারণ করিয়া থাকেন, তথা সন্ন্যাসীর জন্য বনদেবী বৃক্ষে ফল, নদীতে পানীয় ও বৃক্ষতলে শয্যা পূর্ব্ব হইতে প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছেন। উক্ত উদাসীনের অভিপ্রায় যে মানুষ বাসনা ত্যাগ করুক। বাসনা তৃপ্তির জন্য বস্তুসংগ্রহচেষ্টায় দুঃখ; চেষ্টা বৃথা হইলে, বস্তু না পাইলে দুঃখ; পাইলে কথঞ্চিৎ সুখ; কিন্তু ভয় যে পাছে বস্তু ভবিষ্যতে পর-হস্তগত হয়; এবং প্রাপ্তবস্তু ভোগের পরে তাহাতে তুষ্টি হইয়া গেলে পুনরায় ইতর কোনও বস্তু প্রাপ্তির বাসনার উদয় ও তদুত্থ নানা ঝঞ্ঝাট্ ও দুঃখ, হয়। শিষ্য বলে যে, যদি সাংসারিক বস্তুতে বহু কষ্টে—বাসনা ত্যাগ করাই যায়, তবে দুঃখের অধিকার হইতে মুক্ত হওয়া যাইতে পারে বটে, কিন্তু সাক্ষাৎ সুখের বস্তু কিছু মিলিল কৈ? উদাসীন বলে মিলিবে, তাহা ভূমা; কিন্তু তাহা যাহার মিলিয়াছে সেই জানে, সে তাহা অপরের বোধগম্য করিতে পারে না, যথা যুবা বালককে বিবাহের মর্ম্ম, চেষ্টা করিয়াও, বুঝাইতে পারে না। শিষ্য বলে যে, যে বুঝাইতে পারিবে অভয় সুখটী কি বস্তু, তাহাকেই আমার আবশ্যক। যে উদাসীন তাহা পারে না, তাহাকে আমার আবশ্যক নাই। শিষ্য উদাসীনের বাসনা-ত্যাগটীর গুরুত্ব ঠিক উপ-লব্ধি করিতে পারিল না; বৈরাগ্যই যে অভয় তাহা বুঝিল না। তাহার জিদ্ হইয়াছে যে, অভয় সুখ বুঝিয়া লইতে হইবে এবং তাহা পাইতেই হইবে। সে পর্ব্বতগুহা হইতে উদ্যান-বাটিকাতে যাইল।

উদ্যান বাটিকা:—তত্র বসন্ত বাবু সুখে সমাসীন। বসন্ত নিজে কবি ও মন্ত্রণাকুশল। বসন্ত জগৎ হইতে পলায়ন করিতে চাহে না; পলায়ন করা অনাবশ্যক বুঝে। সে আশ্রিতজনকে, নিজে যে অভয় সুখ ভোগ করে, সেই অভয় সুখ দান করিতে প্রস্তুত

আছে। কোকিল বসন্তের অনুগত, আশ্রিত সহচর। শিষ্য যদি কোকিলের মত বসন্তের শরণ লয়, শিষ্যও অভয় সুখে সুখী হইতে পারে।—ভাড়াটীয়া বাটী ত্যাগ করিবার সময় মনুষ্য যথা নিজ শয্যা, বাসনাদি সম্পত্তি সঙ্গে লইয়াই নূতন ভাড়াটীয়া বাটীতে বাস করে, তদ্বৎ চঞ্চল বসন্ত বাবু প্রতি বৎসরের দুই দুই মাস এক স্থলে বাস করিয়া পরে অন্য স্থলে যাইয়া দুই দুই মাস অবস্থান-ক্রমে নিরক্ষ-বৃত্তের উত্তর দক্ষিণ প্রদেশ যাতায়াত করে; ও যেখানে যে সময়ে অবস্থান করে, তখন সেই স্থলে তাহার উদ্যান-বাটিকা সঙ্গেই লইয়া যায়। সুতরাং সদাই ফুল ফুটিয়া থাকে, মলয় পবন, শীতল সুগন্ধ বহমান থাকে, নিত্য-সহচর কোকিল কুহুস্বরে বসন্তের কর্ণের তৃপ্তি-সাধন করে ও কোকিল নিজেও বসন্তের নিত্য-সাহিত্যে উল্লাসিত থাকে, মধুমত্ত অলিগুঞ্জনের সঙ্গীত-লোভে সুন্দর ও সুন্দরী দেবদেবী-গণ প্রকট অপ্রকট থাকিয়া বসন্তের শোভিত উদ্যানকে সুশোভিত করিয়া রাখে। শিষ্য যদি চতুর হয়, জগৎ হইতে পলায়ন না করিয়া বাসস্থান পরিবর্ত্তন যথাসময়ে করিয়া, কোকিলের মত যে স্থলে যে সময়ে বসন্ত, সেই সময়ে সেই স্থলে বাসা লউক। মোটা ভাত মোটা আচ্ছাদনে তুষ্ট থাকিয়া, বসন্তের নিত্য সহচর হইয়া নিরবচ্ছিন্ন ফুলের হাসি, চাঁদের আলো মলয় পবনের কোমল পরশ, তরুবরালিঙ্গিতা সুকুমারী লতিকার স্নেহ ইত্যাদি রস অনুভব করতঃ শিষ্য, কোকিলের মত, ধারাহিক সুখভোগী হইতে পারে। তাহা হইলে শিষ্যকে আর ঘর্ম্মাক্ত গ্রীষ্ম, ভিজা বরষা বা কন্থাবরণ শীতাদি অমঙ্গলের সহ দেখা সাক্ষাৎ প্রযুক্ত দুঃখভোগ করিতে হইবে না। শিষ্যের মনে হইল আহা বেশ! যদি জরা মরণ না থাকিত, তাহা হইলে আমি কবি কোকিলের মত বাসা পরিবর্ত্তন করিয়া প্রিয় বসন্তের নিত্য সহচর

হইয়া নিরবচ্ছিন্ন অভয় সুখ ভোগ করিতাম। কিন্তু হায়, জরামরণ শরীরকে দুর্ব্বল করিয়া ফেলিবে। আমি বৃদ্ধ হইলে জগতে বসন্ত-শোভিত স্থানগুলি পর্য্যটন করিতে অশক্ত হইব, বুঝি এই কুৎসিত নির্দ্দয় জরামরণ ব্যাধি হইতে পরিত্রাণের জন্যই আমাকে বৈদ্যরাজ বৈদান্তিকের নিকটে শেষে যাইতে হইবে। আপাততঃ দেখা যাউক কপিলদেব কি বলেন।

কপিলাশ্রম:—তত্র সকলেই বলে, আমরা বহু অসঙ্গ পুরুষগণ, চেতনবর্গ। প্রকৃতি একা, জড়। প্রকৃতি একা হইয়াও নানারূপে আমাদের সমক্ষে দণ্ডায়মানা। তত্তৎ নানা আকারে বৈচিত্র্য আছে, কিন্তু ভাল মন্দ নাই। একই বস্তুকে কেহ সুন্দর, কেহ কুৎসিত, দেখিয়া অনুরাগ বা দ্বেষ করে; কেহ বা সেই বস্তুকে দেখিয়া উদাসীন থাকে। এই ভাল, মন্দ, ঔদাসিন্যের সাক্ষাৎ হেতু জড়া প্রকৃতির নানা সংস্থানে নাই; আছে চেতন পুরুষে। আমাদের যে ভাল মন্দ বোধ হয়, অবশ্য তাহা প্রকৃতির নানাকার স্পর্শেই, দেখিয়াই হয়। এই হিসাবে আমাদের রাগ দ্বেষের সাক্ষাৎ হেতুত্ব প্রকৃতিতে নাই বটে, কিন্তু প্রকৃতির কিঞ্চিৎ অপেক্ষা আছে। প্রকৃতি সন্নিধানে দণ্ডায়মান থাকিয়া নানাকার গ্রহণ না করিলে আমাদের তত্তৎ নানাকারে রাগদ্বেষের উৎপত্তি হইত না। আইস আমরা প্রাকৃতিক নানা সংস্থানে রাগদ্বেষ ত্যাগ করি, তাহা হইলে, বিষহীন উরগের মত, প্রকৃতি দণ্ডায়মানা থাকিয়াও আমাদিগকে জ্বালা যন্ত্রণা দিতে অসমর্থ হইবে। প্রকৃতিকে আমাদিগের উপর উপদ্রব করিবার ক্ষমতাহীন করিতে হইলে প্রকৃতির শোধন আবশ্যক নহে। আমাদের নিজেরই ভ্রম-দোষ, লালসাদোষ, সংশোধন প্রয়োজন। তাহা হইলেই অর্থাৎ পুরুষ নিজ নিজ অসঙ্গতা বিবেকপূর্ব্বক বুঝিয়া লইলেই আধ্যাত্মিক, আধি-

ভৌতিক ও আধিদৈবিক, এই ত্রিতাপের অত্যন্ত উচ্ছেদ হইবে এবং সেই অত্যন্ত দুঃখনিবৃত্তিই পরম পুরুষার্থ। যে বিবেকদ্বারে পুরুষের অসঙ্গতা প্রতিপাদিত হয়, তাহার উপার্জ্জন কোনও কঠিন অনুষ্ঠানের অপেক্ষা রাখে না; যৎকিঞ্চিৎ বাক্যব্যয়েই কার্য্য সমাধা হয়। কোনও শ্রম নাই, সমাহিতচিত্তে ব্যাপারটী বুঝিয়া লইলেই হয়।

এক সময়ে প্রকৃতির নানাকার ছিল না। সুষুপ্তির মত প্রকৃতি একাকার ছিল, অব্যক্ত অর্থাৎ ঈষদ্ব্যক্ত মাত্র ছিল। আমরা চেতন পুরুষগুলি নিকটেই ছিলাম। আমাদের পরস্পর সান্নিধ্যবশতঃ প্রকৃতির ক্ষোভ হইয়াছিল; চুম্বুক সন্নিধানে যথা লৌহ চঞ্চল হয়, চন্দ্র সমীপে যথা সাগর তরঙ্গায়িত হয়, অগ্নির নিকটে যথা ঘৃত তরল হয়। ক্ষোভ হইলে সমানাকার প্রকৃতির নানা বিষমাকার দেখা গেল; এবং আমরা যে বহু চেতন স্বচ্ছ পুরুষ-স্ফটিক নিকটে ছিলাম, সেই আমাদের কাহারও উপর প্রকৃতির নানাকারগত অন্যতম জবার লাল ছায়া, কাহারও উপর অপরাজিতার নীল ছায়া, কাহারও উপর চম্পকের পীত ছায়া পড়িল। আমরা অসঙ্গ পুরুষ বটে এবং নীল লোহিতাদি ছায়া বাস্তবিক হইলেও, ছায়া সহ আমাদের "সম্বন্ধ" অতাত্ত্বিক বুঝিতেছিলাম; এমন সময়ে কি জানি কোন কারণে স্বপ্রবিষ্ট ইব ছায়া দেখিতে দেখিতে ভ্রম হইয়া পড়িল এবং "ইব"টী ভুলিয়া সত্য ছায়া সম্বন্ধের অভিমান ঘটিল। পরের গচ্ছিত টাকা যথা অনেকদিন নিকটে থাকিলে তাহাতে মমতা হয় ও প্রত্যর্পণে অনিচ্ছা জন্মলাভ করে; যথা পালিত পুত্রে স্নেহ অতর্কিতভাবে সংজাত হয়। আমরা ভ্রমে আমাদিগকে সত্যই ক্রুদ্ধলাল, ভীতনীল, প্রণয়রুগ্নপীত বুঝিয়া নানা ব্যবহার করিতে আরম্ভ করিলাম এবং দুঃখের ও দুঃখানুবিদ্ধ অর্থাৎ দুঃখপরিণামী, সুখের ভোক্তা হইয়া প্রকৃতির অধীন ইব

হইয়া পড়িলাম। এই যে আমাদের বন্ধন, এই যে প্রকৃতির সহ মমত্বাদি সম্বন্ধ স্থাপন ইহা তাত্ত্বিক নহে; ইহা ইব মাত্র, আভিমানিক মাত্র। এই ব্যাপারটী যে ব্যক্তি গুরুমুখে অপরোক্ষভাবে শুনিয়া, বুঝিয়া, অপরোক্ষ করিতে পারিবে, সে নিজেকে সদা শুভ্র মুক্ত শুদ্ধ স্ফটিক অসঙ্গ পুরুষ বুঝিয়া মুক্ত হইবে। যাহার এই বিবেক অপরোক্ষভাবে না হইবে, সে নিজ স্বীকৃত ভ্রমে ভ্রান্ত হইয়া আপনাকে বদ্ধ বুঝিবে ও বদ্ধ থাকিবে। সে জবা অপরাজিতার ছায়া স্পর্শকে সত্য বুঝিতে থাকিবে ও রাগদ্বেষ অবিদ্যা, অস্মিতা ও মৃত্যুর অভিনিবেশ রূপ পঞ্চক্লেশক্লিষ্ট হইয়া ত্রিতাপতপ্ত জীবনযাত্রা দুঃখে নির্ব্বাহ করিতে থাকিবে। শিষ্য, তুমি আপনাকে প্রকৃতি হইতে বিবিক্ত, পৃথক্ অসঙ্গ পুরুষ বুঝিয়া মুক্ত হইয়া যাও। শিষ্য আপত্তি করে যে, কপিলের সাংখ্যমতে দুঃখনিবৃত্তি হইবার সম্ভাবনা থাকিলেও সাক্ষাৎ সুখ প্রাপ্তির কোন বন্দোবস্ত নাই; কিন্তু সাক্ষাৎ অভয় সুখই ত ইষ্ট; দুঃখ পরিহার মাত্র ইষ্ট নহে। ঔদাসীন্যের ও অসঙ্গতার অধিক ধারাবাহিক সুখ চাই। অধিকন্তু পরিহার ও নিরতিশয় হইতেছে না। ভয় থাকিয়া যাইতেছে। সেই প্রকৃতি দণ্ডায়মানা ও পুরুষ সন্নিহিত থাকিবে। বিবেকের পরে, মুক্ত হইবার পরে যে পুনরায় পূর্ব্ববৎ কোনও কারণে পুরুষের প্রকৃতি সঙ্গ, প্রকৃতির অংশবিশেষে মমতানুরাগ ও অংশবিশেষে দ্বেষবুদ্ধি ভবিষ্যতে হইবে না, হইতে পারিবে না তাহার জামিন কি আছে? ভবিষ্যতে সত্য না হউক, ভ্রমেও যদি উক্ত প্রকৃতি সঙ্গ হয়, তবে ভ্রম হইলেও, দুঃখ ভোগটা ত সত্যই ঘটিয়া যাইবে; বন্ধনটা মিথ্যা হইবে না।

কপিল মহাশয় ভরসা দেন যে, বদ্ধ পুরুষ নিজের অসঙ্গতা পাকা বুঝিয়া লইলে, প্রকৃতি ভর্জ্জিতবীজবৎ পড়িয়া থাকিবে, তাহাতে আর

অঙ্কুরোদ্গম হইবে না, আর সে মুক্ত পুরুষকে লুব্ধ মুগ্ধ করিতে পারিবে না।

কিন্তু হায় কপিল, বরষার দিনে কি কখন ছোলাভাজা খাইয়া সুখ পাও নাই? যেদিন বরষা হইবে সেইদিন বন্ধনমুক্ত পুরুষকে প্রকৃতি "ভাজা" আকারেই মজাইবে। তাহার প্রতিবিধান ত কিছুই কর নাই।

সমাধি-মন্দির ঃ—শিষ্যের কপিলমতে অরুচি। কপিলাশ্রম ত্যাগ করিয়া সে ইষ্টানুসন্ধানে চলিল। "অভয় সুখ দেলায়্ দে রাম" শিষ্যের এই চীৎকৃত হইলে পতঞ্জলির সমাধিভঙ্গ হইল। মুনি, শ্বাসকে নাসাভ্যন্তরচারী, দৃষ্টিকে ভ্রূমধ্যে স্থিরা ও মেরুদণ্ডকে জ্যামিতিক সরল-রেখার মত ধারণ করিয়া নিশ্চিন্তাবস্থায় ছিলেন। সহসা শিষ্যকে দেখিয়া বলিলেন; ক্ষণবিলম্বে প্রয়োজন নাই; যদি অভয় সুখ পাইতে চাও, বাবাজি, তবে আমার কথা শ্রবণ ও পালন কর, শীঘ্র চক্ষু মুদিত কর, গাঢ় নিদ্রা স্বীকার কর, তাহা হইলে কপিলের প্রকৃতির দণ্ডায়মানা থাকা না থাকা উভয় সমান হইবে। তোমার সমাধি হইলে প্রকৃতি তোমার গোচর হইতে পারিবে না এবং সুকোমল ছায়াদ্বারে পরশ-বিভোল করিতে অসমর্থা হইবে। শিষ্য বলে, ঠাকুর, তোমার দশা স্বচক্ষে দেখিলাম; আমার চীৎকারে তোমার মত ওস্তাদের সমাধি ভাঙ্গিল ও দণ্ডায়মানা কাপিল প্রকৃতির সহ পুনঃ পরিচয় ঘটিয়া গেল। সুতরাং আমার মত অপক্ক শিষ্যের সমাধিস্থ হইয়া চিরকাল নিরাপদে অবস্থান করার কোনও ভরসা নাই। চলিলাম।

বিরাট-পূজা ঃ—অত্র রামানুজ পুরোহিত, শিষ্য যজমান। আমি শব্দে সচরাচর দেহ-সম্বলিত ব্যাবহারিক "আমিকে" বুঝায়। কিন্তু আমি যখন বলি "আমার দেহ" তখন আমার দেহটাকে, সহজেই আমার সম্পত্তি ঘটীবাটী গৃহ ছত্রাদির অন্যতম বুঝি। উক্ত দেহ-সম্পত্তির স্বত্বাধিকারী "আমিটাকে" কিন্তু তত সহজে বুঝি না; স্বত্বাধিকারী বলিয়া

বুঝি বটে, কিন্তু সম্পত্তিগুলিকে যথা দীর্ঘ বা ক্ষুদ্রাবয়বী, কঠিন বা কোমল, নূতন বা পুরাতনাদি গুণ সাহায্যে গুণসহযোগে, বেশ ভাল করিয়া বিষয়রূপে, ইদং রূপে, ইন্দ্রিয়গোচর রূপে গ্রহণ করি, তথা স্বত্বাধিকারী "আমি" কে স্বত্বাধিকারী গুণযুক্ত এবং সম্পত্তিগুলির দ্রষ্টা বলিয়া যোগে-যাগে মাত্র বুঝি। আমিটার অবয়ব নাই, ইহা ইন্দ্রিয় নহে এবং ইন্দ্রিয়গোচর নহে; ইন্দ্রিয়গুলি ও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য যাবতীয় বস্তুগুলি ইহারই গোচর। ইহাও লক্ষ্য করিতে হইবে যে, আমিটাকে যে যোগেযাগে বুঝি সে আমিই বুঝি বা বুঝে, অপর কেহ নহে। যে কেহ আপনাকে "আমি" বলে, সে হয় সাবধানে বলে বা অসাবধানে বলে। যখন বলি আমার দেহ, তখন আমিটা ও আমার দেহটা দুইটাকে পৃথক বস্তু রূপে উল্লেখ করা হয়। আমিটা স্বত্বাধিকারী এবং আমার দেহটা আমার ছত্র টুপি লাঠিরই মত একটা অন্যতম সম্পত্তি। আমিটা নিরবয়ব, ভাব রূপ, নিরাকার, সাক্ষী; আমার দেহটা সাবয়ব, ভাবরূপ, সাকার, সাক্ষ্য। অসাবধানে আমি শব্দ উচ্চারিত হইলে, উক্ত উভয় সাক্ষী সাক্ষ্য, মিলিত ভাবে একটা ব্যাবহারিক আমিকে বুঝায়। রামানুজের মতটা পরিষ্কার করিয়া বলিবার সময় "ব্যাবহারিক আমি" অথবা "ব্যাবহারিক আত্মা" শব্দে, সাবয়ব দেহ সহ দেহের সাক্ষী নিরবয়ব স্বত্বাধিকারী আত্মাকে একযোগে মিলিত ভাবে বুঝিব। এবং আমি শব্দে বা "আত্মা শব্দে শুদ্ধ কেবল নিরবয়ব, সাবয়ব দেহ হইতে পৃথক্, সাবয়ব দেহের সাক্ষী স্বত্বাধিকারীকে বুঝিব।

একাধিক নিরবয়ব বস্তুর উল্লেখ সময়ে, যদ্যপি, অবয়ব-রাহিত্য বশতঃ ক্ষুদ্র, বৃহৎ, বিশেষণের প্রয়োগ অযৌক্তিক, তথাপি প্রয়োজন হইলে বোধ-সুগমতার জন্য একটী নিরবয়বকে ক্ষুদ্র, অপর একটীকে বা বৃহৎ বলা হইবে।

আমার দেহ বলিলে, আমি ও দেহ এই দুই পৃথক্ বস্তু বুঝায়। আমার আত্মা বলিলে কিন্তু দুইটী পৃথক্ বস্তু বুঝাইবে না। যথা রাহুর শির বলিলে একই বস্তু বুঝায়, কারণ রাহুর সমগ্র অবয়বটী একটী শির-মাত্র; যথা শিলা পুত্রের শরীর বলিলে একই বস্তু বুঝায়, সমগ্র নোড়াটাই নোড়ার শরীর, তদ্বৎ আমার আত্মা অর্থে একই "আমি" বুঝায়। অত্র ষষ্ঠী বিভক্তি দ্বিতীয় বস্তুকে সমর্পণ করিতে কুণ্ঠা প্রাপ্ত হয়।

গোটাকয়েক ব্যাবহারিক ক্রমি কীট ও শত কোটী ব্যাবহারিক রক্তবীজ আমার দেহটার ভিতরে' বসবাস করিতেছে। তাহারা প্রত্যেকে নিজে নিজে "আমি" "আমি" বলিয়া বুঝে ও ব্যবহার করে। কখন কোনও এক খাদ্য খণ্ডে দুইটী ক্রমির লোভ হইলে তাহারা পরস্পর বিবাদ করে। রক্তবীজগুলি নির্দ্দিষ্ট উপায়ে সঙ্গত হইয়া বংশ বৃদ্ধি করে, তাহাদের বাসাবাটী রূপ আমার দেহে ব্রণ ক্ষত হইলে বুদ্ধিপূর্ব্বক দলবদ্ধ হইয়া ক্ষতস্থলের সংস্কার, মেরামৎ করে; বসন্তাদি শত্রু কীট বাসাতে প্রবেশ করিলে তৎসহ প্রণালীপূর্ব্বক যুদ্ধ করে। এবং তাহারা অন্যোন্য পৃথক "আমি" "আমি" "আমি" এইরূপ বুঝে। অত্যন্ত বিস্ময়ের ব্যাপার এই যে, শতকোটী রক্তবীজগণ, যাহারা শতকোটী পরস্পর নিরপেক্ষ ব্যাবহারিক "আমি"র সমূহ, তাহাদিগকে ও তাহাদের বাসাটী আমার দেহটাকে অবলম্বন করিয়া, একত্রীভূত একটা সম্পত্তি ধরিয়া লইয়া, সেই সম্পত্তির স্বত্বাধিকারী একটা ভাব রূপ নিরবয়ব সাক্ষী "আমি" শব্দের, "আমি" ভাবের উদয় হয়। এই উদিত আশ্চর্য্য নিরবয়ব আমিটা, আত্মাটা, শতকোটী স্বাধীন রক্তবীজ "আমি" বৃন্দের, "আত্মা" বৃন্দের তুলনায় একটা পৃথক স্বাধীন আত্মা। ইহা বৃহৎ নিরবয়ব; রক্তবীজাত্মাগুলি ক্ষুদ্র নিরবয়ব। ক্ষুদ্র-

গুলি পরস্পর পৃথক এবং উক্ত বৃহৎ হইতেও পৃথক্ অস্তিত্ববান্ এবং যেন ক্ষুদ্রগুলি বৃহৎটিকে আশ্রয় করিয়াই আছে।

তদ্বৎ ব্যাবহারিক আমি, ব্যাবহারিক রাম, ব্যাবহারিক শ্যাম ইত্যাদি ব্যষ্টি জীবগণ উক্ত ব্যাবহারিক রক্তবীজের মত। ব্যাবহারিক আমরা, আমি, রাম, শ্যামাদি, যে বৃহৎ জগৎ বাসাবাটীতে অবস্থান করিয়া, ব্যবহার সম্পন্ন করিতেছি সেই বৃহৎ বাসাটী, যাহার নাম বিরাট দেহ, এবং তত্রগত বাসিন্দা ব্যাবহারিক আমরা, এই উভয়ে বাসা ও বাসিন্দাগণকে, একযোগে লইলে যে বস্তু হয়, সেই বস্তুকে যে নিরবয়ব আত্মা "আমার দেহ" এরূপ কথা বলিতে পারে, তাহারই নাম বিরাট পুরুষ, ঈশ্বর, সমষ্টি আত্মা, বিরাড়াত্মা। এই বৃহত্তম নিরবয়ব পরমাত্মার তুলনায় ব্যাবহারিক ব্যষ্টি জীবগণের দেহ খোলস বিনিযুক্ত, দেহাতিরিক্ত, নিরবয়ব জীবাত্মাগুলি, ক্ষুদ্র নিরবয়ব আত্মা।

জীবের দেহাভিমান থাকিলেই দেহ কারাগারে বদ্ধ জীব পাওয়া গেল। দেহ পৃথক্ ও আত্মা পৃথক্, ইহা যে ব্যাবহারিক জীব অপরোক্ষ করিবে, সে নিজে ক্ষুদ্র নিরবয়বাত্মা এবং সে বৃহৎ নিরবয়ব পরমাত্মাতে যথা ক্ষুদ্র তরঙ্গ বৃহৎ সমুদ্রে তদ্বৎ, সংলগ্ন ও তৎসহ সমান সত্তাক বুঝিবে, দেখিবে। যে জীব উক্তরূপ অপরোক্ষ করিবে সে যথাসময়ে ক্ষুদ্র তরঙ্গের বৃহৎ সমুদ্রে অবগাহন, তিরোভাবের মত, পরমাত্মাতে প্রবেশ পূর্ব্বক, অবগাহন পূর্ব্বক মুক্ত হইবে। যে জীব উক্তরূপ অপরোক্ষ করিবে না, সে বদ্ধই থাকিয়া যাইবে। ক্ষুদ্র জীবাত্মার বৃহৎ পরমাত্মায় অবগাহনটী পরমানন্দের; অত্যন্ত সুখের; সে সুখের উপমা, দৃষ্টান্ত জগতে নাই। বৃহদারণ্যকে ইহার ইঙ্গিতমাত্র দিয়াছেন। নরনারীর পবিত্র নিবিড় স্নেহ-আলিঙ্গনেও আত্মায় আত্মা মিলিত হইতে পারে না; চন্দনলেপ বা কণ্ঠহার অবতরণেও নির্দ্দয় দেহ ব্যবধান থাকিয়া

সুখের মিলনে বিঘ্ন উৎপাদন করে। নিরবয়ব জীবপরমমিলনে বিঘ্ন লেশ নাই। বুঝিয়া লও যে, জীব পরমের দুর্ল্লভ অথচ নির্ব্বিঘ্ন মিলনে কত সুখ।

শিষ্যের আপত্তি এই যে ক্ষুদ্র জীবাত্মা, লহরীর মত, কেহ পরমাত্মা-সমুদ্রে মিলাইয়া গেল, কেহ গেল না বদ্ধ রহিল; কিন্তু যে জীবাত্মামুক্ত হইল, সে যে নূতন লহরীরূপে সমুদ্রাত্মাতে পুনরুদিত হইয়া পুনরায় বদ্ধ হইবে না, তাহার সুনিশ্চিত ব্যবস্থা রামানুজ দেন নাই। রামানুজের মুক্তি অভয় নহে, সভয়ই। সুষুপ্তের মত মুক্তের পুনরুত্থান ভয় থাকিয়া যাইতেছে।

মুমুক্ষু ঃ---দেখা যাউক অশীতিবর্ষের বৃদ্ধ প্রামাণিক বুদ্ধ মহাশয় কি বলেন? রামানুজের প্রস্তাবিত বৃহত্তম নিরবয়ব সমষ্টি পরমাত্মা এবং তাহার বৃহত্তম প্রকাণ্ড অবয়বী ব্রহ্মাণ্ড-শরীর, উভয় একযোগে নিরতিশয় বৃহৎ পদার্থ হইল। ক্ষুদ্রাংশগুলি, ব্যষ্টি ক্ষুদ্র নিরবয়ব জীবাত্মা ও সেই ক্ষুদ্রাত্মার অবয়বী ক্ষুদ্র জীবশরীর এবং ক্ষুদ্র নদী পর্ব্বতাদির অধিষ্ঠাতা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নিরবয়ব দেবদেবী ও সেই দেবদেবীর অবয়বী নদী শরীর, পর্ব্বত শরীর, বৃক্ষ শরীর ইত্যাদি। বুদ্ধ বলেন উক্ত ব্যষ্টি পৃথক পৃথক ক্ষুদ্রাংশগুলির কথা দূরে থাকুক যাবতীয় ক্ষুদ্রাংশগুলির সমষ্টি, বৃহত্তম, নিরবয়ব পরমাত্মা এবং সেই পরমাত্মার বৃহত্তম অবয়বী ব্রহ্মাণ্ড শরীর একত্রীকৃত হইয়া যাহা হয়, তাহা আমার মুঠার ভিতরে। তাহা আমার দৃশ্য, আমার সম্পত্তিবৎ আমার হস্তামলকবৎ, আমার চিন্তার বিষয়ীভূত, আমার আলোচনার বিষয় মাত্র। সমগ্রটা আমার দৃশ্য হওয়ায়, গ্রাহ্য হওয়ায়, নিরবয়ব পরমাত্মাটী আমার দৃশ্যৈকদেশ মাত্র হইতেছে; এবং সাবয়ব ব্রহ্মাণ্ড শরীরটী আমার দৃশ্যের অপর বক্রী দেশ হইতেছে। বৈরাজ নিরবয়ব প্রকাণ্ডতম

আত্মা ও বৈরাজ সাবয়ব প্রকাণ্ডতম দেহ উভয়ে একযোগে আমার পূরাদৃশ্য।

বৃদ্ধ লোকটা অতি সাহসী। তাহার মতে "আমি"ই বড়; পরমাত্মা ও পরমাত্মার শরীর একত্র হইয়াও আমির দৃশ্য, "আমি" অপেক্ষা সুতরাং মর্য্যাদায় হীন, অল্প, ন্যূন্। আমার অধিক কিছু নাই। আমিটা, আত্মাটা অসমোর্দ্ধ। আমি ভূমা।

বৃদ্ধ মিথ্যা বলেন নাই। রামানুজের ঠাকুরও ঠিক তাহাই বলিয়াছেন। একদা নারদ ভগবান্‌কে জিজ্ঞাসা করেন যে, বৃহত্তর বস্তুটী কি? ভগবান্ বলেন যে শ্রবণ কর। দেখ, পৃথিবী একটা বড়-বস্তু; তাহার বেষ্টন-পরিখা সমুদ্র। সমুদ্র পৃথিবী অপেক্ষা বড়। অগস্ত্য একগণ্ডূষে সমুদ্র পান করিয়াছিল সুতরাং অগস্ত্য সাগর অপেক্ষা বড়। সেই অগস্ত্য বৃহদাকাশে একটী ক্ষুদ্র নক্ষত্র মাত্র। এমন বৃহদাকাশ "আমার" প্রতি লোমকূপে বর্ত্তমান! এত বড় আমি ভগবান্, বিশাল হইতে সুবিশাল হইয়াও, হে নারদ, তোমার হৃদয়ের এক কোণে অবস্থিত। সুতরাং নারদ তুমিই বৃহত্তম। নারদ, তোমার শক্তি অপরিসীম, মন্ত্রবলে তুমি প্রকাণ্ড দেহ সমেত প্রকাণ্ড বিরাট্ পুরুষকে কবলীকৃত করিতেছ।

বৃদ্ধ রামানুজের পরমাত্মাকে খণ্ডন করিবার জন্য, "আত্মা"রূপ মহাস্ত্রের, অহং ব্রহ্মরূপ "ব্রহ্মাস্ত্রের", সাহায্য গ্রহণ করিয়াছিলেন। পরে কণ্টক দ্বারা কণ্টক উদ্ধারের পরে উভয় কণ্টক তুচ্ছবোধে ত্যাগ করার মত এই "আমি"রূপ মহামন্ত্রের ত্যাগ, উচ্ছেদ, সর্ব্বনাশ করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইয়াছিলেন। কিন্তু বুদ্ধ বৃদ্ধ ও জীর্ণ; আত্মা নিত্যনূতন, যুবা। যুবার সহিত সংগ্রামে বৃদ্ধ জয়লাভ করিতে পারে নাই! বুদ্ধ যে প্রণালীতে আত্মার সর্ব্বনাশ করিবার জন্য আত্মার

সহ যুদ্ধ করিয়াছিলেন, তাহার বিবরণ নিম্নে লিপিবদ্ধ করা গেল। বুদ্ধের বুদ্ধিতে দুঃখ বস্তু বুল-ডগের মত কামড়াইয়া ধরিয়াছিল। বুল-ডগ কামড়াইয়া ধরিলে তাহার প্রভু ছাড়িয়া দিতে বলিলেও ছাড়ে না এবং বুল-ডগের মাথাটা কাটিয়া লইলেও মৃত বুল-ডগের মৃত মাথা কামড় ছাড়ে না, তদবস্থই থাকে। বুদ্ধ মতে জগতে দুঃখ ত আছেই; যাহা কিছু সুখ আছে তাহা ক্ষণস্থায়ী দুঃখ-পরিণামী, দুঃখানুবিদ্ধ সুতরাং সেরূপ সুখও দুঃখরাশিভুক্ত। যথা কথঞ্চিৎ সুখদ বস্তুর প্রাপ্তিতেও ভয়; পাছে সুপুত্রটী মরিয়া যায়, মনোহর ফুলটী ঝরিয়া যায়, সুন্দর যৌবনকে জরামরণ অপদস্থ করে। এই দুঃখের দুশ্চিন্তা বুদ্ধের মেজাজ ভাল থাকিতে দেয় নাই। তিনি দুঃখের উচ্ছেদ করিতে অসমর্থ হইয়া দুঃখের ভোক্তাকে, আমিটাকে হত্যা করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন। অভিপ্রায় যে রোগীর মৃত্যু হইলে, রোগ আক্রমণ করিবার পাত্র না পাইয়া আপনা অপনি বাধ্য হইয়া নির্ম্মূল হইবে। একটা শূন্যমাত্র থাকিবে। বুদ্ধ যদি সন্ধান পাইতেন যে শয়তান অর্থাৎ দুঃখবস্তু কিছু একটা বিদ্যমান নাই, শয়তানের জন্মস্থান নাই বলিয়া তাহার জন্মই হয় নাই; তাহা হইলে আত্মার সর্ব্বনাশ, নির্ব্বাণ করিবার জন্য উদ্যম করিতেন না। বরং আত্মাকে বাঁচাইয়া রাখিয়া সুখের ভোক্তা করিবার চেষ্টা করিতেন। আত্মাই পরানন্দ, পরম প্রেমাস্পদ; বুদ্ধ তাহার প্রতি প্রীতি বশতঃই, তাহার উদ্ধার করিতে না পারিয়াই তাহাকে দুঃখের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি দিবার জন্যই, তাহাকে নির্ব্বাপিত, হত করিবার যত্ন করিয়াছিলেন। আত্মা নির্ব্বাপিত হইতে রাজী হয় নাই। বুদ্ধ আত্ম-নির্ব্বাণে সচেষ্ট থাকা কালেই মরিয়াছেন; আত্মা এখনও বাঁচিয়া আছে।

আমাদের দুঃখ সাক্ষাৎ ব্যাবহারিক কণ্টক, ক্ষুধা ব্যাধি হইতে

ঘটে, কখনও প্রাতিভাসিক কিছু বা ভ্রম হইতেও দুঃখ হয়; ভ্রমটা ভ্রম হইলেও দুঃখভোগটা সত্যই বটে। মন্দান্ধকারে হিতৈষী পিতাকে দস্যু বোধ হইলে হৃৎকম্প, পলায়নকালে ভূপতিত হইলে আঘাত, আঘাতহেতু দীর্ঘকাল স্থায়ী ক্ষতাদি সত্য সত্যই পীড়াদায়ক। কোন পথিককে মন্দালোকে ঘোষজা মনে করিয়া তাহাকে গৃহে আনয়নপূর্ব্বক উত্তম পানভোজনাদি দ্বারা সমাদরে তাহার সৎকার করার পরে, যদি নিজ ভ্রম বুঝিয়া তাহাকে বলা যায় যে, ওহে তুমি ত ঘোষজা নহ; তাহাতে কোনও লাভ বা প্রতীকার নাই; উক্ত পানভোজনাদি সংগ্রহে, দুঃখে অর্জ্জিত অর্থের অযথা ব্যয় ত পূর্ব্বেই হইয়াছে। সমগ্র ব্যাবহারিক ও প্রাতিভাসিক প্রকৃতিজ দুঃখ এবং দুঃখভোক্তা, রোগ, রোগী দুইএরই যাহাতে উচ্ছেদ হয় এমন যুক্তিকৌশল আবিষ্কার করিতে বুদ্ধ যত্নবান্ হইয়াছিলেন। ক্ষুৎপীড়া দূর করিবার জন্য অন্নসংগ্রহের চেষ্টা না করিয়া, উদরের উচ্ছেদ কামনা করিয়াছিলেন। সত্য যে কি বস্তু বুদ্ধ তাহার আবিষ্কারে মনোযোগ করেন নাই। সত্যবস্তুর নির্ণয় করা তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল না।

যথাপ্রাপ্ত পূর্ব্বসঞ্জাত সংস্কারকৈংকর্য্য বশতঃ তাঁহার বুদ্ধিতে দোষলেশ ছিল। তাহাই তিনি দুঃখ যে আছে এবং আত্মার দুঃখভোক্তৃত্ব যে আছে, ইহাই সত্য বলিয়া, যথোচিত পরীক্ষা না করিয়াই, ধরিয়া লইয়াছিলেন। এবং তাহা স্বীকার করিবার পরে সুতরাং দুঃখ ও ভোক্তা আত্মার উচ্ছেদ করিবার প্রক্রিয়াপদ্ধতি আবিষ্কারের জন্য চিন্তাশক্তির প্রবল প্রয়োগ করিয়াছিলেন। দেশ, বহির্দ্দেশ, অন্তর্দ্দেশ; কাল, অতীত কাল, বর্ত্তমানকাল, ভবিষ্যৎকাল; দেশে কালে অবস্থিত ঘট, পট, দ্বিচন্দ্র, প্রতিবিম্বাদি বস্তু; কালে বিদ্যমান সুখ, দুঃখ, ক্রোধ, পিতাপুত্রাদি সম্বন্ধ, প্রভৃতি বস্তু, অর্থাৎ প্রকৃতির সকল বিশিষ্টাকার-

গুলি বুদ্ধের মতে ভিন্ন ভিন্ন বিজ্ঞান মাত্র, স্বপ্নদৃশ্যবৎ। বহির্দ্দেশ যে একটা কিছু আছে—ঘট কিছু আছে, এবং বহির্দ্দেশে ঘট আছে বলিয়াই যে আমার ভিতরে বহির্দ্দেশ বিজ্ঞানও বহির্দ্দেশস্থ ঘটবিজ্ঞান হইতেছে তাহা নহে। বহির্দ্দেশ কিছু তত্ত্বতঃ নাই, বহির্দ্দেশে বাস্তবিক ঘটও কিছু নাই।

আলনস্কারের মনোরাজ্যবৎ, স্বপ্নদৃশ্যবৎ বহির্দ্দেশ বা বহির্দ্দেশস্থ ঘটাদি হেতু নিরপেক্ষই স্বয়ং সিদ্ধই ঘটবিজ্ঞান, বহির্দ্দেশবিজ্ঞান, ঘটের বহির্দ্দেশে অবস্থান বিজ্ঞান, আমার ভিতরেই বা আমাতেই আছে! দর্পণের পশ্চাতে দেশ দেখা যায় ও তত্রাবস্থিত প্রতিবিম্ব দেখা যায়। কিন্তু উক্ত দেশ ও উক্ত প্রতিবিম্ব বস্তু বাস্তবিক নাই; তাহাদের প্রতীতি মাত্র, বিজ্ঞান মাত্রই আছে। ক্ষুদ্র এক রাত্রিতেই স্বপ্ন বহুবর্ষব্যাপী অতীতাদি কাল ও সেই দীর্ঘ কালেই কোনও বালকের ক্রমে যৌবন, বার্দ্ধক্যপ্রাপ্তি দেখা যায়। কিন্তু উক্ত দীর্ঘকাল বাস্তবিক নাই; কাল ও কালদৈর্ঘ্যের প্রতীতি মাত্র, বিজ্ঞান মাত্রই আছে। জাগ্রৎ সময়ে কোনও বিষয়ে গাঢ় মনোনিবেশবশতঃ দীর্ঘকাল অতিবাহিত হইলেও অল্পকাল বলিয়া প্রতীতি হয়। এই অল্পকালের "অল্পতা" বাস্তবিক নহে; অল্পকালের প্রতীতি মাত্র, বিজ্ঞান মাত্রই আছে। এইরূপ যুক্তিতে পাওয়া গেল যে, বেশ কঠিন বদ্ধ, সুস্থির জগৎ কিছু নাই; আছে কেবল নানা বিজ্ঞান ও তাহার ধারা। একটী একটী করিয়া অনেকগুলি বিজ্ঞানের দ্রুত উদয়, তরল অস্থির জলের প্রবাহের মত। তাহাদের ধারা পারম্পর্য্যের নাম, নদী নামের মত, অহং ধারা, অহং বিজ্ঞান, আত্মা, আমি। ধারা বিজ্ঞানটা স্বয়ংসিদ্ধ নহে; ইহা সাপেক্ষিক বিজ্ঞান ও খুচরা বিজ্ঞানগুলির অপেক্ষা রাখে; পরে পরে বহু বিজ্ঞান না থাকিলে ধারা থাকিত না; খুচরা বিজ্ঞান-

গুলিরই ধারা বলিয়া ধারাবিজ্ঞানটী, খুচরা বিজ্ঞানগুলির অপেক্ষা রাখিয়াই উদিত হয়। ধারাবিজ্ঞানটীও একটী বিজ্ঞান, অথচ খুচরা স্বয়ংসিদ্ধ বিজ্ঞান হইতে কিঞ্চিৎ ভিন্নরূপও বটে,। নানাপুষ্পলোপ সহ মালার লোপ, অপরিহার্য্য ভাবে হয়। পুষ্পগুলির লয়ের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত মালা থাকে; মালাটী আপুষ্পলয় বর্ত্তমান থাকে। পরে থাকে না। তদ্বৎ খুচরা বহু বিজ্ঞানগুলির সম্যক্ লয়ের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত অহং বিজ্ঞান থাকে। অহংটী আলয়-বিজ্ঞান বর্ত্তমান থাকে। পরে থাকে না। দীপশিখাটী বহুতর শিখার দ্রুত প্রবাহ; বহুতর শিখাগুলির উচ্ছেদে তাহাদের দ্রুতপ্রবাহের উচ্ছেদ অর্থাৎ দীপ-নির্ব্বাণ অবশ্যম্ভাবী। স্বয়ং-সিদ্ধবিজ্ঞানগুলির উচ্ছেদে সাপেক্ষিক অহং বিজ্ঞান সুতরাং উচ্ছেদ প্রাপ্ত হয়।

এই বার বুঝিয়া লও বুদ্ধের প্রক্রিয়া—কাল বা বহির্দ্দেশও তত্রাবস্থিত প্রকৃতি কোন কিছু নাই। আছে বহুবিজ্ঞান ও তাহাদের পারম্পর্য্য। লাগাও দৃঢ় ধ্যান; ধ্যানং নির্বিষয়ং মনঃ; কোনও বিজ্ঞানের উদয় না হয় এমন দৃঢ় ধ্যান ধর। বিজ্ঞান মাত্রের উদয়-রাহিত্যে, খুচরা বিজ্ঞানের সাপেক্ষিক অহং-বিজ্ঞানও লুপ্ত নির্ব্বাপিত হইবে। সুতরাং অহং বেচারা দুঃখভোগ সহ্য করিতে আর বর্ত্তমান থাকিবে না। রহিবে না দুঃখ, রহিবে না দুঃখভোক্তা অহং বিজ্ঞান, রহিবে না দুঃখদাতা খুচরা বিজ্ঞান, রহিবে শূন্য। শূন্যই তত্ত্ব। কম্বলের লোম বাছাবৎ নেতি মুখে বুদ্ধের জন্য কিছুই অবশিষ্ট থাকে নাই।

শিষ্য বলিল হা হতোঽস্মি। ভাল লোকের কাছে বটে আসিয়াছিলাম। বুদ্ধ আমার সকল দুঃখ দূর করিল, কিন্তু একটা মহৎ দুঃখ আমার জন্য নূতন সৃষ্টি করিল। সেই মহৎ দুঃখটী এই যে, তবে কি আমি আর নাই? আমি কি না থাকিয়াই আছি!

বুদ্ধ, তুমি গয়াতে নির্ব্বাণ পাইয়াছ, গয়াতে পিণ্ডদেহ সমর্পণ করিয়াছ; আমারও উদ্ধার-কল্পে বোধ হয় গয়াতেই পিণ্ডদান ব্যবস্থা করিতে চাও।

বেদান্ত—ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য শিষ্যকে প্রবোধ দেন। বলেন যে বুদ্ধদেব বুদ্ধগয়ার মঠে স্বোপার্জ্জিত সম্পত্তি রক্ষা করিয়া আমার হস্তে তাহার ভারার্পণ করিয়া গিয়াছেন। তিনি বায়াত্তর বৎসর বয়ঃক্রম হইবার পূর্ব্বে রামানুজের হস্ত হইতে অহং-তত্ত্বকে উদ্ধার করিয়াছিলেন; এবং পরে কিছু শূন্য পদার্থও অর্জ্জন করিয়াছিলেন, প্রবাদ আছে। বুদ্ধার্জ্জিত সম্পত্তি আমার আয়ত্তাধীন হইবার পরে আমি খাতাপত্র দলিলাদি হিসাব করিয়া "অহং" বস্তুটীকে পাইয়াছি; শূন্য পদার্থ কিছু আমার হস্তগত হয় নাই। বোধ হয় বস্তুটা শূন্য বলিয়াই পাওয়া যায় নাই। আমার জিহ্বা নাই "বলিলে" যথা জিহ্বা থাকাই সাব্যস্ত হইয়া পড়ে, তদ্বৎ আমি নাই বলিলে "আমি"র থাকাটাই সিদ্ধ হইয়া যায়। আত্মাটা পরমবস্তু, মহামহিম, হইলেও ইহার ক্ষমতার সীমা আছে; আত্মা আত্মহত্যা করিতে অক্ষম, আত্মাকে নিষেধ করিতে যে উত্তম করিবে, সেই ত নিজে আত্মা থাকিয়া যাইয়া অনির্ষিদ্ধ অশক্যনিষেধ হইয়া পড়িবে। "আমি আছি" এই জ্ঞান চক্ষুরাদি সকল প্রমাণ নিরপেক্ষ, অপ্রমেয়, স্বয়ংসিদ্ধ। বরং বন্ধ্যাপুত্র অর্থাৎ ভবিষ্যৎ কাল চিন্তার বিষয় হইতে পারে, কিন্তু "আমি নাই" এরূপ একটী জ্ঞানের জন্মলাভ হইতেই পারে না; নিপুণ হইলেও নট যথা নিজস্কন্ধে আরোহণ করিতে অক্ষম, সূর্য্য সর্ব্বত্র গতিশীল হইয়াও অন্ধকারে যাইতে পারে না, পুরুষ যথা মহাযোগী হইলেও নিজপত্নীকে বিধবা দেখিতে পারে না, তদ্বৎ আত্মা নিজসত্ত্বা অস্বীকার করিতে পারে না এবং অথচ আপনাকে বিষয়রূপে ইদংরূপে গ্রহণ করিতেও

পারে না। এই দুই না পারাটী, ক্ষমতার সীমা নির্দ্দেশটী, চরমবস্তুর মহিমাকে লঘু করে না, হীন করে না, বরং চরমবস্তুর অপলাপ করা অসম্ভব বুঝাইয়া, ইহা চরমবস্তুর চরমত্বের পোষক, সাধক ও অলংকার স্বরূপই। আমরা এইবার ভাল করিয়া বেদান্ত আলোচনা করিব।

সম্ব্যাপ্তি

(১)

দ্বিতীয় প্রস্তাবে বলা হইয়াছে যে, আত্মা আপনাকে অস্বীকার করিতে পারে না, "আমি নাই" বলা চলে না ; "আমি নাই" বলিলেও বক্তা-আমির লোপ সিদ্ধ হয় না। শব্দের জ্ঞাপকত্ব আছে, কারকত্ব নাই। যাহা নাই তাহা সৃষ্টি করিবার শক্তি, বা যাহা আছে তাহার অপলাপ করিবার সামর্থ্য, শব্দের নাই। শব্দ-অস্তি-আত্মার নিষেধ করিতে পারে না, জ্ঞাপন করিতে পারে। বুদ্ধ বলিয়াছেন বটে যে, আত্মার উচ্ছেদ শব্দ-উপদেশ দ্বারা করা যায় ; কিন্তু যে বস্তুর তিনি উচ্ছেদ করিতে যত্নবান হইয়াছিলেন এবং বিচার দ্বারা যাহার উচ্ছেদ করিতে সমর্থও হইয়াছিলেন তাহা বিম্ব নহে ; তাহা প্রতিবিম্ব মাত্র, তাহা I নহে me মাত্র ; তাহা দ্রষ্টা নহে, তাহা দৃশ্য মাত্র ; নির্ব্বাপণ যোগ্য বৌদ্ধ আত্মাটী আত্মা নহে, আত্মার নকল মাত্র।

বুদ্ধ বলেন যে পৃথক্ পৃথক বিজ্ঞানগুলি, নানাবিধ পুষ্পের মত এবং সেই বিজ্ঞানগুলির ধারা বিজ্ঞানটী বৌদ্ধ-অহংটী মালার মত। পুষ্পগুলি ছিন্নবিচ্ছিন্ন করিলে যথা তৎসঙ্গে মালার অভাব আপনা আপনি হইয়া যায়, তদ্বৎ নানা বিজ্ঞান গুলির অভাব সম্পাদন করিতে পারিলে সেই বিজ্ঞানগুলির ধারাটীও অপরিহার্য্যরূপে অভাবরূপ, অর্থাৎ নির্ব্বাপিত হইয়া যায়। বুদ্ধের এ কথাটা সত্য কথা। আইস আমরা এই বিজ্ঞান-ধারাটার স্বরূপ বুঝিয়া লইব। ইহা আত্মা নহে, ইহা আত্মার নকল।

বুদ্ধ, বুদ্ধ কেন সকলেই, বিচার সময়ে লঘু কল্পনাই স্বীকার করেন এবং কল্পনা-গৌরবকে দোষ বলিয়া ত্যাগ করেন। সহজে নাসিকা প্রদর্শন সিদ্ধ হইলে, মস্তকের পশ্চাৎদেশ দিয়া হস্ত ঘুরাইয়া নাসা প্রদর্শন করা অনাবশ্যক। পদ-সাহায্যে পলায়ন সম্ভব হইলে জানু সাহয্যে, অর্থাৎ হামাগুড়ি দিয়া পলায়ন করিবার প্রথা নাই।

বহির্দ্দেশ আছে তত্র ঘটবস্তু আছে, তদবলম্বনে একটা মানসিক ঘটচ্ছবি হয় এবং সেই ঘটচ্ছবিটাই ঘটবিজ্ঞান, এরূপ বলিলে কল্পনা-গৌরব হয়। কোনও একটা বহির্দ্দেশ ও তত্রাবস্থিত ঘটবস্তুর কোনও অপেক্ষা না রাখিয়াই, ঘটবিজ্ঞান হইতে পারে এবং হয়ও তাহাই; ইহাই লঘুকল্পনা এবং বুদ্ধের অনুমোদিত। বুদ্ধমতে বিজ্ঞান গুলি স্বপ্নদৃশ্যবৎ, আলনস্কারের মনোরাজ্যবৎ, তাহারা আপনাদিগকে ব্যক্ত করিবার জন্য স্বাতিরিক্ত প্রাকৃতিক কোনও বহির্বস্তুর অপেক্ষা করে না।

বিদেশে পুত্র মরিয়াছে। লোকমুখে পিতা শুনিলেন যে, 'পুত্র সুস্থ আছে। পিতার সুস্থ-পুত্র-বিজ্ঞান হইল। অত্র বহিস্থ সুস্থ-পুত্র বাস্তবিক নাই; অথচ সুস্থ-পুত্র-বিজ্ঞান আছে।

দর্পণের পশ্চাতে দেশ ও প্রতিবিম্ব বস্তুরূপ কিছু নাই; দ্বিচন্দ্র বাস্তবিকই নাই, অথচ দেশ-বিজ্ঞান প্রতিবিম্ব-বিজ্ঞান দ্বিচন্দ্র-বিজ্ঞান আছে।

স্বপ্নে দীর্ঘকাল নাই অথচ এক ক্ষুদ্র রাত্রিতেই স্বপ্নমধ্যে' বহু-বর্ষ-দীর্ঘ কালের বিজ্ঞান হয়।

বেদান্ত, বুদ্ধের লঘু কল্পনা মান্য করে। অথচ বেদান্ত বলে যে বিজ্ঞানের উদয়, বহির্বস্তুর অপেক্ষা না রাখিলেও যে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ও সর্ব্বনিরপেক্ষ তাহা নহে। বিজ্ঞানগুলি এবং তাহাদের ধারাটী বৌদ্ধ অহংটী উভয়েই সাক্ষ্য এবং সুতরাং সাক্ষীর অপেক্ষা রাখে।

বিজ্ঞানের অপর পারিভাষিক নাম প্রত্যয়। আমরা কয়েকটী খুচরা প্রত্যয়কে ও তাহাদের সমষ্টিতে অনুগত ধারাটীকে লইয়া পরীক্ষা করিব। “শ্যামসুন্দর” “পর্ব্বত উচ্চ,” “আমি দীন,” “তুমি রোগী” “যদু চিকিৎসক” ইত্যাদি প্রত্যয়গুলি, খুচরা প্রত্যয়। ইহাদিগকে পরে পরে সাজাইলে তাহাদের পরস্পর একটা সম্বন্ধ পাওয়া যায়; তাহাদের নাম ধারা প্রত্যয়, অহং-প্রত্যয়। আমি দেখি শ্যাম সুন্দর; আমি দেখি পর্ব্বত উচ্চ; আমি দেখি আমি দীন; আমি দেখি তুমি রোগী; আমি দেখি যদু চিকিৎসক। এই যে প্রতি খুচরা প্রত্যয়ে সর্ব্বত্র অনুগত “আমির দেখা” প্রত্যয় ইহার নাম অহং-প্রত্যয়, প্রত্যেক খুচরা প্রত্যয়ে ইহার নিত্য সাহচর্য্য, অর্থাৎ অবিনাভাব পাওয়া যায়। খুচরা প্রত্যয় গুলিও যেমন প্রত্যয়, খুচরা সাপেক্ষ ও, তৎসমষ্টিতে অবস্থানুগত, নিত্য সহচর, অহং-প্রত্যয়টীও তেমনই একটী প্রত্যয়। বুদ্ধ ও বেদান্ত উভয়েই মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করেন যে খুচরা প্রত্যয়গুলির বাধ হইলে সুতরাং “আমির দেখা” রূপ যে একটা ধারা প্রত্যয়, অহংপ্রত্যয়, তাহাও বাধিত হইবে। এবং হয়ও তাহাই। সুষুপ্তি মরণ মূর্চ্ছা সমাধিতে খুচরা প্রত্যয়গুলি ও অহং প্রত্যয় নামক তাহাদের লম্বা ধারা প্রত্যয় উভয়ই যুগপৎ লুপ্ত হয়।

এই অহং প্রত্যয়ের বিলাতী নাম me এবং গীতাদি শাস্ত্রে, সপ্তম ত্রয়োদশ ও পঞ্চদশ অধ্যায়ে, জীব ক্ষেত্রজ্ঞ বা পুরুষ। [অত্র মনে রাখিতে হইবে যে এই পুরুষ নামের নামী, যাহা দৃশ্য, তাহা গীতার পঞ্চদশে উক্ত ও কঠোক্ত দ্রষ্টা পুরুষ হইতে ভিন্ন ও ন্যূন]

কিন্তু কি খুচরা প্রত্যয়গুলি, কি তত্রানুগত নিত্য সহচর অহং-প্রত্যয়টী ইহারা যে সাক্ষী অবলম্বনে, যে সাক্ষীর অপেক্ষায় দণ্ডায়মান

হয় সেই সাক্ষীটাই সেই প্রত্যয়টাই আত্মা—"I"। বুদ্ধ এই "I" আত্মাকে তাঁহার হিসাবে লইতে ভুলিয়াছিলেন। সাক্ষ্য অহংপ্রত্যয় প্রতিবিম্ববৎ তাহার উচ্ছেদেও অর্থাৎ me-র উচ্ছেদেও, সাক্ষী, বিম্ব, আত্মা, 1, অক্ষতিগ্রস্ত হইয়াই থাকিয়া যায়। সুষুপ্তি হইতে সেই অক্ষতিগ্রস্ত, নিরমল, সমান আত্মা পুনরায় খুচরা প্রত্যয়কে ও অহং প্রত্যয়কে ইদংরূপে দেখিবার জন্য নিজে সাক্ষী উপাধি স্বেচ্ছায় অবলম্বন করিয়া কিঞ্চিৎ বিশিষ্ট হয়; পুনরায় কি খুচরা-প্রত্যয় কি অহং-প্রত্যয় উভয় দৃশ্যকে পরিবর্জ্জন করিয়া সুতরাং সাক্ষী নামও ত্যাগ করিয়া সমান, অবশিষ্ট সুষুপ্ত ও স্বরূপাবস্থিত হয়। বুদ্ধ অহং-প্রত্যয়রূপ দৃশ্যটীর লোপের জন্য কৌশল আবিষ্কার করিয়াছেন; তাহা এই যে দৃঢ় ধ্যানে খুচরা প্রত্যয়ের উদয়রাহিত্যে—খুচরা গুলিতে অনুগত—নানাপুষ্পে অনুগত এক মালার মত—অহং প্রত্যয়ের নাশ অবশ্যম্ভাবী! বেদান্ত বলে অহং প্রত্যয়ও একটী দৃশ্য মাত্র, তাহা মরিলেও, আত্মা মরে না। দৃশ্য লোপে, দ্রষ্টানাম লুপ্ত হইলেও দ্রষ্টা নামের নামী পুরুষটীর লোপ হয় না।

টিকি কাটিয়া দিলে বটে টিকিদারকে পাওয়া যায় না; কিন্তু মানুষটা বিনা-টিকি মৌজুদ থাকে।

বুদ্ধের পুষ্পমালা দৃষ্টান্ত তুচ্ছ করিয়া তাহাই বেদান্ত দৃষ্টান্ত দেন যে, শিখা নষ্টে শিখী নষ্ট, কিন্তু পুরুষ অনষ্ট।

অত্র খুচরা প্রত্যয় ও অহং প্রত্যয় উভয়ে একযোগে সমগ্র দৃশ্যবর্গ টিকির মত; এই টিকি আত্মা হইতে দূর করিলে আত্মার যে দ্রষ্টৃত্ব নাম বা উপাধি তাহাও দূরীভূত হইয়া যায়, কিন্তু চরম আত্মা তথাপি, অক্ষুণ্ণ, অনষ্ট পুরুষের মতই থাকে। ইহাকে বুদ্ধ হত্যা করিতে পারেন নাই; তিনি দর্পণ ভাঙ্গিয়া প্রতিবিম্বের হানি করিয়াছেন;

বিম্ব ঠিকই আছে। তিনি টিকি কাটিয়া, টিকিদার এই উপাধি লোপ করিয়াছেন বটে, কিন্তু মানুষটার ক্ষতি করিতে পারেন নাই। যখন সুষুপ্তিতে, না আছে খুচরা প্রত্যয়, না আছে অহং প্রত্যয় তখনও এবং যখন স্বপ্নজাগরে খুচরা প্রত্যয় আছে, অহং প্রত্যয়ও আছে, তখনও আত্মা সদা বর্ত্তমান। সুষুপ্তি সময়ে, আত্মাতে সাক্ষিত্ব উপাধি নাই; স্বপ্নজাগরে, আত্মাতে সাক্ষিত্ব উপাধি আছে। বুদ্ধহত অহংপ্রত্যয় আত্মা নহে; বুদ্ধ নিজে এবং বুদ্ধ-হত অহং-প্রত্যয় আত্মার সাময়িক, নিজ বিলাসগত কাদাচিৎক অস্থায়ী, দৃশ্য মাত্র। সুষুপ্ত আত্মা, অথবা আরও খোলষা বলিতে হইতে, স্বপ্নজাগর সুষুপ্তি এই তিন অবস্থা যিনি পর্য্যায়ক্রমে স্বেচ্ছায় স্বীকার করেন এবং স্বেচ্ছায় ত্যাগ করেন সেই চতুর্থ অর্থাৎ পারিভাষিক তুরীয় আত্মা যাহা, তাহা অপাপপুণ্যবিদ্ধ, অসমোর্দ্ধ, অভয়। তাহার মৃত্যু ঘটে না, তাহাতেই বরং বুদ্ধ অবুদ্ধ সকলেই, জলে বরফের মত, আকাশে খণ্ডমেঘের মত, অবশে মরিয়া মিলাইয়া যায়।

এই আত্মা কখনও বা উপহিত, যথা অহং পিতা, অহং দুঃখী, অহং বৃদ্ধ বস্তুর দ্রষ্টা, অহং অন্নভোক্তা, ইত্যাদি কখনও বা নিরুপহিত সুষুপ্ত। অথচ উভয় কালেই উপাধি দ্বারা এবংউপাধির অভাব দ্বারা অসংস্পৃষ্ট, নিত্যশুদ্ধি। স্ফটিকবৎ, নীল, লোহিত বা শুভ্র সকল অবস্থাতেই স্ফটিক স্ফটিকই। এই আত্মা উপস্থিত অবস্থার দ্রষ্টা দৃশ্য নহে। সুষুপ্তাদি নিরুপহিত অবস্থায় দ্রষ্টৃত্ব উপাধিও পরিবর্জ্জন পূর্ব্বক নিরুপহিতই,—দৃশ্য নহে। ইহা কদাপি দৃশ্য নহে। ইহা যে "কদাপি দৃশ্য নহে" ইহা আত্মার একটি লক্ষণ; ইহা দ্বারা অদৃশ্য, দ্রষ্টা, আত্মাটীকে কথঞ্চিৎ বুঝা যায়।

এই কথঞ্চিৎ বুঝাতে ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসার, আত্মপরিচয়-প্রাপ্তি-প্রয়াসের

তৃপ্তি হয় না। সেই জন্যই গ্রন্থবাহুল্য ; সেই জন্যই অন্যান্য লক্ষণের অবতারণা! লক্ষণগুলি দুই রাশিতে বিভক্ত। প্রথম স্বরূপ লক্ষণ, সৎ চিৎ আনন্দ এবং দ্বিতীয় তটস্থ লক্ষণ, জগৎ-জন্ম-স্থিতি-লয়াধিপত্যাদি। উক্ত উভয়বিধ লক্ষণ কখনও পৃথকরূপে কখনও বা একযোগে আত্ম বস্তুকে সমর্পণ করে। দেখাইয়া দেয় না, ইদংরূপে, "দেখাইয়া" দিতে পারে না, "বুঝাইয়া" দেয়। যথা রাহুকে সাক্ষাৎ দেখাইয়া দেওয়া যায় না, গ্রস্তচন্দ্র লক্ষণে বুঝান যায়। চন্দ্রগ্রহণ হইলে বলা যায় যে যে চন্দ্রকে গ্রাস করিয়াছে সেইটাই রাহু, বুঝিয়া লও। এই কথার সঙ্কেত ৭।৯০ পঞ্চদশীতে পাইবেন,—আত্মাতে ফলব্যাপ্তি নাই, বৃত্তিব্যাপ্তি আছে ; জীব ব্রহ্মকে বিষয় করে না। কিন্তু জীবের মনের "অহং-ব্রহ্ম" রূপ একটা বৃত্তি আকার অবস্থা পরিণতি হইতে পারে।

যুগযুগান্তর হইতে আত্মার কথা আলোচিত হইতেছে। কিছুতেই ইহাকে ইদংরূপে, ইন্দ্রিয় গ্রাহ্যরূপে, কর্ম্মকারক রূপে গ্রহণ করা যাইতেছে না। যে গ্রহণকর্ত্তা সেই যে আত্মা। বিশুদ্ধ কর্ত্তৃকারক আপনাকে বিশুদ্ধ কর্ম্মকারকরূপে পরিণত করিতে পারিতেছে না। চেষ্টাও ছাড়িতেছে না। বিম্ব নিজেকে ইতর বিম্ব করিতে পারিতেছে না, কিন্তু দর্পণ সংগ্রহ করিয়া তত্র গর্ভাধান দ্বারা প্রতিবিম্ব সৃষ্টি করিয়া তৎসাহায্যে আপনাকে বুঝিতে চেষ্টা করিতেছে। "আমি নাই" এরূপ প্রত্যয় ও হয় না, অথবা আমিটা যে কি তাহাও ঠিক গ্রহণ হইতেছে না, অর্থাৎ সমস্যা এই যে, আত্মাটা সদা প্রকট হইয়াও মহাগুপ্ত, আত্মাটা নিজ পরিচয়ের যে চেষ্টা সহস্রাধিক যুগ ধরিয়া করিয়া আসিতেছে ও অকৃতকার্য্য হইতেছে, ইহা বোধ হয় তাহার লীলাবিনোদ ও বড় সুখেরই লীলা-বিনোদ। আমরাও দেখিয়াছি যে, যখন যাহা পাই না, তখন তাহার প্রাপ্তি-চেষ্টাতে সুখ আছে এবং

যখন তাহা পাই তখন প্রায় তাহাতে আর আদর থাকে না। তাহাই বোধ হয় আত্মা ইচ্ছা করিয়াই এযাবৎ স্বপরিচয় প্রাপ্তির পথে যত্নপূর্ব্বক নানা কণ্টক নানা বিঘ্ন রক্ষা করিয়াছে। সেই নানা কণ্টক বিঘ্ন ভ্রমের ভিতর দিয়া তবে সত্যে নিজ পরিচয়ে উপস্থিত হইয়া আত্মতৃপ্ত আত্মা একটা যেন নূতন চরিতার্থতারূপ তৃপ্তিলাভ করে।

কেহ কেহ বলেন আত্মাটী অবাঙ্‌মনসগোচর। কিন্তু আমি আত্মা তাহাদের কথা শুনিব কেন? আমি "আমি"র সংবাদ জানি, কি জানি না, তাহা অপরের বলিবার কোনও অধিকার নাই। আমি মুখোষ পরি বা নরনারী না হইয়াও নরনারীত্ব স্বীকার করিয়া রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ করি, অপর-লোকেরা "আমিকে" চিনিতে পারুক আর নাই পারুক, আমি আপনার স্বীকৃত সহস্র আবরণের ভিতরেও নিজ নিরাবরণ স্বরূপকে জানি নিশ্চয়। অভয় আত্মার ইতিহাস সৃষ্টির আদিম কাল হইতে আত্মা স্বয়ং জগৎ খাতায় স্বহস্তে লিখিয়া রাখিয়াছে, অপরে তাহা পড়িতে না পারিলেও আত্মা নিজে তাহা পড়িতে পারে। তোমাদের আন্ধ্য তোমাদের থাকুক। আত্মা অন্ধ নহে।

স্ফটিক যথা রক্তজবার বা নীল অপরাজিতার ছায়ায় সত্য সত্য লাল বা নীল হয় না, সদাই শুভ্র থাকে, তদ্বৎ যদ্যপি দেহে মমত্ব, পুত্রে পিতৃত্ব, কার্য্যে কৈঙ্কর্য্যাদি সম্বন্ধ আত্মাতে জড়িত থাকিয়া উপাধি বিনির্ম্মুক্ত শুদ্ধ আত্মাকে দুর্ল্লভপ্রায় করিয়া রাখিয়াছে, তথাপি আত্মা সদা মুক্তই আছে। ব্যাপারটা বড়ই আশ্চর্য্য। কি "কুহকই" আত্মা জানে। জাগর হইতে স্বপ্নে, স্বপ্ন হইতে সুষুপ্তিতে, স্বপ্ন হইতে জাগরে, নিয়ত পুনঃ পুনঃ যাতায়াত করিবার কালে জাগর কালের দুশ্ছেদ্য সম্বন্ধ, বন্ধন ও দোষ গুণ গুলি অনায়াসে, অবলীলাক্রমে ত্যাগ করিয়া স্বপ্নে যায় এবং স্বপ্নকালের দুশ্ছেদ্য বন্ধনগুলি অনায়াসে ত্যাগ

করিয়া জাগরে আইসে, সকল বন্ধন নির্মুক্ত হইয়া সুষুপ্তিতে উলঙ্গ চলিয়া যায়। এত বড় Mir cle, অঘটন-ঘটনা আর নাই। অন্য যাবতীয় Miracle, দুই একটা অন্ধের চক্ষুদান, দু-চারিটা মৃতদেহে জীবন সঞ্চার, শতযোজনলম্ফ, গোবর্দ্ধনধারণ, কৌশল্যাদি বন্ধ্যাতে যজ্ঞমন্ত্রমাত্র-বলে সন্তানোৎপত্তি, ইহারা জাগর স্বপ্ন সুষুপ্তি বিচরণে আত্মার লেপ রাহিত্য রূপ বৃহৎ Miracle এর, অঘটন-ঘটন-পটুতার তুচ্ছ ক্ষুদ্রাংশ মাত্র।

পুরাতন পঞ্চাশৎ বৎসরের জীর্ণ দেহে আমার এত গাঢ় প্রীতি যে; আমি বলি "আমার" বয়ঃক্রম পঞ্চশৎবর্ষ। কিন্তু বয়স আমার ত নহে, তাহা দেহেরই; নিরবয়ব আত্মার বয়স বিশেষণ নাই; ইহা কাল ব্যাপিয়া, কাল অতিক্রম করিয়া কালেরও স্রষ্টা ইহা অস্তি। দেহে কণ্টক বিদ্ধ হইলে, "আমিতে" কণ্টকবেধ হয় না, অথচ দেহে মমত্ব বশতঃ আমি বলি যে, আমি কণ্টক-বিদ্ধ। স্ত্রীপুত্রেই বা প্রীতি কত। কেহ যদি বলে সংসার ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসী হও, তবে সংসারে আমার পক্ষপাত বশতঃ সংসারের শত্রু সে রূপ উপদেষ্টাকে প্রহার করিতে যাই।

কিন্তু হায়, এত যে প্রীতি তাহা, ক্ষণবিলম্ব না করিয়াই, নিতান্ত নির্দ্দয়ের মত, প্রিয় দেহ ও সংসার সহ, ত্যাগ করিয়া আমি সহসা স্বপ্নে চলিয়া যাই আমি তত্র সুস্থকায়, মধ্য বয়স, ঘনকুঞ্চিত কৃষ্ণকেশ, ঈষদরুণায়ত লোচন, লাবণ্যময়ী যুবতী দেহের দেহী; তত্রদেহে প্রীতিমতী হাস্য পরিহাসাদি রসালাপ-বিনোদিনী, পুষ্প-বাটিকা-বিহারিণী, গরবিণী। আবার তত সুন্দর দেহে তত প্রীতি-আদরও, নিতান্ত অরসিক, অস্থির মতির মত অকস্মাৎ সম্যক ত্যাগ করিয়া দেহমাত্র শূন্য বিদেহসুষুপ্তি স্বীকার করি। এই যে জাগরাদি বিচরণকালে আত্মার দ্বারা দৃঢ় দুশ্ছেদ্য উপাধি স্বীকার এবং অথচ তত্তৎ অবলীলাক্রমে ত্যাগ এবং

সুতরাং আসলে সদামুক্ত থাকা ইহা সকলেই জানেন। কিন্তু ব্যাপারটী কাহারও দ্বারা এ পর্য্যন্ত অপরোক্ষীকৃত হয় নাই।

আইস আমরা আবার আত্মার অঘটনঘটনপটুতার আলোচনা দ্বারা আত্মার পূজা করিব।

আমি জাগরে মনে করি যে আমি ক্ষুদ্র অল্পশক্তি দীন হীন। শিব গড়িতে গেলে বানর হইয়া পড়ে। মরা বাঁচাইতে পারি না। অন্ধকে চক্ষু দিতে পারি না। প্রিয় পুত্রের ব্যাধি আরাম করিতে পারি না। বিধবাকে স্বামী দিতে পারি না। বিপত্নীককে যজ্ঞসাধন ভার্য্যা দিতে পারি না। কিন্তু আমার স্বপ্ন আমিই ত স্বয়ং নিজে সৃষ্টি করি; অপর কেহ করে না। স্বপ্ন সৃষ্টি করিবার যে আমার শক্তি তাহা যে অপরিসীম তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। তত্র শিব গড়িতে ঠিক শিবই হয়; চন্দ্র, সূর্য্য, বাঘ, হাতী, পাহাড়, পর্ব্বত, এক রাত্রির স্বল্প সময়ে বহুবর্ষ-ব্যাপি দীর্ঘতা, ক্ষুদ্র গৃহাবকাশে বিস্তৃত প্রান্তর জনপদ, আমি স্বপ্নে, বিনা আয়াসেই, প্রস্তুত করি। কোথায় লাগে দুচারটীর চক্ষুদান, এক আধটা গোবর্দ্ধন-ধারণ; স্বপ্নে কটাক্ষ মাত্রে কত শত সহস্র জীব জন্তুর সৃজন সংহার করি। অথচ স্বপ্নকালে, ঠিক জাগর কালেরই মত, আমি আমিকে ক্ষুদ্র, স্বপ্নৈকদেশ, স্বল্পশক্তি, দীন, হীন, মনে করি। দেখ আমিই আমিকে ক্ষুদ্র মনে করি, অথচ হিসাবে বুঝি যে আমিই স্বপ্নস্রষ্টা, অপরিসীম শক্তিমান। স্বপ্নে আমারই অনুমতিতে বিশাল স্বপ্ন বর্ত্তমান। আমিই অল্প, আবার আমিই ত ভূমা। আমার অনুমতি নাই বলিয়া সুষুপ্তিতে কেহ থাকিতে পায় না, সকলেই সংহৃত হয়, তখন আমি সর্ব্বগ্রাস করিয়া থাকি। জাগরটাও একটা স্বপ্নতুল্য কিছু; স্বপ্নই। আমি মহামৎস্যবৎ জগৎ-নদীর কখন জাগর কূল দেখি, কখনও স্বপ্ন কূল দেখি, কখনও বা অকূল সুষুপ্তি-সমুদ্রে প্রত্যাবর্ত্তন করি, যত্র জগৎ-নদী, নাম রূপ ত্যাগ

করিয়াই অন্তগত। জাগর দর্শন কালে জাগর অভিমানী আমি, আমিকে ক্ষুদ্র হীন মনে করি; স্বপ্ন দর্শন কালে উক্ত জাগর অভিমান সহজেই ত্যাগ করিয়া স্বপ্নে নূতন একটা জাগরাভিমান লইয়া তত্র আমিকে ক্ষুদ্রহীন মনে করি; কিন্তু ভূমা আমি ত ক্ষুদ্র, দীন, হীন, নহি। স্ফটিক যথা সহজেই জবা সন্নিধানে লাল হয় ও জবাতিরস্কারে ও অপরাজিতা পুরস্কারে সহজেই লাল ত্যাগ পূর্ব্বক সহজেই নীল হয়—অথচ স্ফটিক লালও হয় না, নীলও হয় না; তদ্বৎ আমি জাগর স্বপ্ন সুষুপ্তিতে সদাই শুভ্র, মুক্ত। বন্ধন কদাপিই বাস্তবিক নাই বলিয়া মোক্ষটী প্রাপ্ত-প্রাপ্তি, কর্ণে কলম বা গ্রীবাস্থ গ্রৈবেয়ক প্রাপ্তিবৎ এবং মোক্ষটী পরিহৃত পরিহারও বটে, রজ্জুর সর্পাবরণ নিষেধবৎ। স্বপ্ন-স্রষ্টাও আমি, জাগর স্রষ্টাও আমি। আমি কেও কেটা নহে, এক অদ্বিতীয়, অসীম শক্তিমান, নিত্যমুক্ত। আমি লীলান্যায়ে জগৎ সংহার করি সুষুপ্তিতে; এবং লীলা ন্যায়েই জগৎ সৃষ্টি করিয়া দেখি, অথবা দৃষ্টিদ্বারেই সৃষ্টি করি। জগৎসৃষ্টি করিবার জন্য কোনও নিয়মের বশীভূত আমি নহি, নিয়মই আমার বশীভূত অর্থাৎ অনিয়মই আমার নিয়ম; আমার ইচ্ছাই নিয়ম। আমার ইচ্ছাতেই বৃক্ষচ্যুত ফল পড়ে; আমির ইচ্ছা হইলেই বৃক্ষ-চ্যুত ফল উড়িবে, পড়িবে না। আমিই তার-যোগে সংবাদ পাঠাই; আমি তার-বিনা সংবাদ পাঠাই। আমিই মানুষ হইয়া জলে ডুবিয়া মরি, আমিই মৎস্য হইয়া জলে ডুবিয়া বাঁচি, আমি সূর্য্য হইয়া অন্ধকারগতবস্তু প্রকট করি; আমিই সূর্য্য হইয়া প্রকট নক্ষত্রাদিকে গোপন করি; আমিই হত্যা করিয়া ফাঁসী যাই, অমিই জহ্লাদ হইয়া হত্যা করিয়া বেতন পুরস্কার লই; আমিই নর হইয়া নারীকে ভোগকরি, আমিই নারি হইয়া নরকে ভোগ করি; আমিই মানুষ হইয়া মিঠাই ভোগ করি, আমি মিঠাই হইয়া মানুষকে ভোগ করি না।

কথাটা বলিতে সহজ হইল, কিন্তু আমির স্বরূপটা পরোক্ষ করিয়াও অপরোক্ষ করা বাকী থাকিল। ভরসা রাখিতে হইবে যে "শনৈঃ কন্থা শনৈঃ পন্থা শনৈঃ পর্ব্বতলঙ্ঘনম্"।

যত ক্ষণ না অপরোক্ষ হইবে ততক্ষণ গ্রন্থকারও থাকিবে ও গ্রন্থপাঠকও থাকিবে। অনাদি অতীত কাল হইতে আত্মার কথা রচিত পঠিত হইয়া আসিতেছে। যে কেহ অত্মাকে অপরোক্ষ করিলেই, তৎক্ষণাৎ পঞ্চমাঙ্কের অপেক্ষা না রাখিয়াই যবনিকা পড়িয়া যাইবে স্বপ্নে যে ভবিষ্যৎ পঞ্চমাঙ্কের জন্য বৃহৎ আয়োজন সযতনে করা হইয়াছে, স্বপ্ন ভঙ্গ হইয়া তাহা সকলই ফোক্কা হইয়া যাইবে। সূর্য্যোদয়ে পূর্ব্বদিক ধার্য্য হইলেও যথা তত্র উত্তর দিক্ ভ্রম কিয়ৎকাল থাকায় দিঙ্মোহে পরম বিস্ময়রসের অবির্ভাব হয়, তদ্বৎ আত্মা অপরোক্ষীকৃত হইলেও পরিদৃশ্যমান নানা জীব জন্তুর সমষ্টি জগৎ যে আত্মাতেই অবস্থিত, আত্মা হইতে অপৃথক এই বোধ এবং জগৎটা যে আত্মা হইতে পৃথক ও নানা দোষ দুষ্ট, এই ঈষদ্ভ্রান্ত বোধ, এই উভয় বোধ যুগপৎ কিয়ৎকাল আত্মাকে বিস্ময়রস ভোগ করাইবে। পরে আত্মা শান্ত হইয়া অভয় হইবে।

যে সকল লক্ষণে আত্মপরিচয় হয়, তাহারা হয় স্বরূপ লক্ষণ সচ্চিদ্রস না হয়, তটস্থ লক্ষণ, জগজ্জন্ম স্থিতি লয়াদি।

ইহা বৈদান্তিকের ও ভক্তের উভয়েরই সমানুমোদিত। কিন্তু অত্র ঘোর বৈদান্তিক ও ঘোর ভক্ত, পরস্পর বিবাদ করিয়া সঙ্গ ত্যাগ করে। বিবাদ তটস্থ লক্ষণ লইয়া।

ভক্ত, জগতের সৃষ্টি ও জগৎ সৃষ্টির হেতুরূপা শক্তিকে বাস্তবিক বসিয়া অঙ্গীকার করে; বৈদান্তিক জগৎ সৃষ্টির জন্য আত্মাতে, আত্মাতিরিক্ত শক্তির অস্তিত্ব স্বীকার করে না, আপত্তি করে যে যদি অদ্বয় আত্মাতে সৃষ্টিশক্তিরূপ প্রচ্ছন্নদ্বৈত কিছু থাকে তাহা হইলে আত্মা কখনই

অভয় হইতে পারে না। যদি ভ্রান্ত বদ্ধ জীব, গুরুকৃপায় ও বহু পরিশ্রমে নিজ সাধনবলে জগদুচ্ছেদ পূর্ব্বক জগদ্বন্ধন হইতে ত্রাণ পাইয়া পাইয়া মুক্ত হয়, তথাপি পূর্ব্ববৎ কোন কারণে আত্মাবস্থিত সৃষ্টিশক্তি চঞ্চলা হইয়া ভবিষ্যতে জগন্নির্ম্মাণ করিলে, বদ্ধ জীবকে পুনরায় কৃচ্ছ্র সাধ্য অনুষ্ঠান, করিয়া পুনরায় মুক্ত হইতে হইবে এবং অথচ ভয় থাকিয়া যাইবে যে, পাছে আবার এবং বারম্বার জগৎ সৃষ্টি হইয়া জীবকে মুগ্ধ বদ্ধ, করে। সুতরাং জীবের আর অভয় হওয়া হয় না। ভক্তের অভিপ্রায় এস্থানে উদ্ঘাটন করিব না। বৈদান্তিকের কথা বলিব। কথাটি অতি সূক্ষ্ম; কথাটি উপস্থিত না বলিলেও চলিত। কিন্তু যখন প্রসঙ্গগত পাওয়া গিয়াছে তখন এই মহা নিগূঢ় কথার ইতিহাস সম্বন্ধে কিছু ইঙ্গিত মাত্র করিব ও করিয়া সরিয়া পড়িব ও ক্রমে ক্রমে ধীরে ধীরে বেদান্তকে কনিষ্ঠাধিকার হইতে আরম্ভ করিয়া সুখপাঠ্য করিবার যত্ন করিব। সরিয়া পড়িবার কারণ এই যে, ঘোর উচ্চাধিকারের কথা গঙ্গা-প্রপাতের মত, গঙ্গাধর ব্যতীত আমাদের মত ক্ষুদ্র গণের ইহার বেগ সহ্য করিবার ক্ষমতা নাই। ঘোর উচ্চাধিকারের কথা এই যে, মোটেই জগৎসৃষ্টি হয় নাই। জগৎসৃষ্টি কথাটি কাল্পনিক "আরোপ"। এই জগৎসৃষ্টি যদি হইত তবে যাহাকে এই জগতের স্রষ্টা বলা যাইতে পারিত সেইই অভয় আত্মা। এইরূপে পাকে প্রকারে জগৎসৃষ্টি অস্বীকার করার পারিভাষিক নাম "আরোপাপবাদ।" এই আরোপাপবাদ ন্যায়ে অভয় আত্মা সমর্পিত হইলে, জীব চরিতার্থ হইয়া যায়। তখন সৃষ্টিবিষয়ে কোনও বিতর্ক, কেন হইল, কে করিল, কিরূপে করিল ইত্যাদি প্রকারের প্রশ্ন আর উত্থাপিত হইবার প্রয়োজন থাকে না। উক্ত আরোপাপবাদ ন্যায়ের প্রয়োগটি একটা কণ্টক প্রয়োগের

মত; এতদ্বারা জগৎ কণ্টক উদ্ধৃত হইলে উভয় কণ্টকই পরিত্যক্ত হয়। স্বস্থ, অলয় আত্মা থাকিয়া যায়।

বেদান্ত ইহার বহু এবং মনোহর উদাহরণ সংগ্রহ করিয়াছে। রাম শ্যামকে বলিল যে, যে বাটীতে কাক্ বসিয়া আছে, তাহাই আমার বাটী। শ্যাম রামের কাক্ মার্কা বাড়ী চিনিল। পরে কাক উড়িয়া গেল; তখন রামের বাটী শ্যামের পরিচিতই রহিল। কাকটী তটস্থ লক্ষণ, কাক্-লক্ষণে বাটীর পরিচয় হইবার পরে বাটীর স্বরূপ লক্ষণ, দ্বিতল, লাল রং দেওয়া ইত্যাদি শ্যামের দৃষ্টিগোচর হইয়াছিল। তটস্থ কাক্ লক্ষণের অভাব হইলেও শ্যাম স্বরূপ-লক্ষণ দ্বারাই বাটী চিনিতে পারিল।

তদ্বৎ আচার্য্য শিষ্যকে বলিল যে, এই তটস্থ জগতের স্রষ্টাই আত্মা। শিষ্য আত্মাকে তটস্থ লক্ষণে জানিবার সময়ে, আত্মার আমিত্ব, সচ্চিদ্রসত্ব, স্বরূপ লক্ষণও দেখিয়া লইল। আচার্য্য পরে বলিবেন, যে, অদ্যাপি এই জগৎ সৃষ্টি হয়ই নাই জগৎ কাক্ উড়িয়া যাইবে। কিন্তু শিষ্য আত্মাকে তথাপি স্বরূপ লক্ষণেই চিনিতে পারিবে।

তামাসা দেখিবে যে, বড় বড়, পরম পণ্ডিত, ঋষিগণ জগৎসৃষ্টি বিষয়ে, যাহার যেমন ইচ্ছা, এক একটা পরস্পর বিভিন্ন প্রণালী লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। কেহ বলেন আকাশ হইতে বায়ু, বায়ু হইতে তেজ, তেজ হইতে রস, রস হইতে ক্ষিতির জন্ম; পরে তাহাদের নানা অনুপাতে মিশ্রণ হইতে বিচিত্র জগৎ পাওয়া যায়। কেহ বা বলেন তেজ হইতে রস, রস হইতে অন্নরূপ ক্ষিতি এবং তাহাদের পরস্পর মেলনে জগৎ সৃষ্টি হইয়াছে। কাহারও মতে জগৎটা স্বপ্নারম্ভের মত, হঠাৎ যুগপৎ প্রাপ্ত নানা বস্তু, তাহাদের অবকাশদাতা আকাশ, বস্তুর নবীনত্ব প্রাচীনত্ব হিসাবে অতীতাদি কাল, ইত্যাদির সমষ্টি এবং পরে

তাহাদের নানা ক্রমে ব্যবহার। তাঁহারা সৃষ্টির ভিন্ন ভিন্ন ক্রম নির্দ্দেশ করিয়া ঠিকই করিয়াছেন। তাৎপর্য্য সৃষ্টিতেও নহে; স্রষ্টৃত্ব ও সৃষ্টিরূপ তটস্থ লক্ষণে আত্মার পরিচয় লাভেই তাৎপর্য্য। সকলে একবাক্যে একই সৃষ্টিক্রম নির্দ্দেশ করিলে ঋষিবাক্যে শ্রদ্ধাবান্ পাঠকের সৃষ্টিটাকে সত্য বলিয়া ভ্রম হইতে পারিত। তাহা হইলে পাঠকের অনিষ্ট হইত।

সৃষ্টিটা বারুদের হস্তী; যেমন বারুদের তুবড়ী, হাউইকে আমরা ভাল বলি যদি অগ্নিযোগে তাহা উত্তমরূপে পুড়িয়া যায়; তদ্বৎ বারুদের হাতি-বাজীর কর্ণ লাঙ্গুলাদি অঙ্গের যথাবিন্যাসে ও নির্ম্মাণকৌশলে মনোযোগ যত্ন আবশ্যক নাই। বারুদ বর্ত্তিতে অগ্নি সংযোগ করিলে যদি সুন্দররূপে হাতি-বাজী পুড়িয়া যায় তবেই বলা যায় যে হাতী-বাজী ভাল বটে।

অর্থাৎ সৃষ্টির প্রক্রিয়া সংলগ্ন করিয়া বর্ণনার প্রয়োজন নাই। জগৎটা বারুদের হাতী, ইহাকে সহজে, সুন্দররূপে নিঃশেষে উড়াইয়া দিতে হইবে। কিন্তু সাধক হাতী পুড়িয়া যাইবার পূর্ব্বেই বাজীকরকে আত্মাকে চিনিয়া লউক, সৃষ্টি ও স্রষ্টৃত্বোপাধি লয়েও শিখানষ্টে শিখীনষ্ট অথচ অনষ্ট পুরুষবৎ আত্মাকে অবশিষ্ট পাওয়া যাইবে।

জগৎসা খোদার খাসী। ইহার কিছুদিন লালন পালন কর খোদার। দেখা পাইলেই, খোদার প্রীত্যর্থে উহাকে উৎসর্গ করিয়া, ভবিষ্যতে খাসীপালনের দায়মুক্ত হইবে। স্মরণ রাখিও যে বর্ত্তমানে পালনের তাৎপর্য্য নিজভোগে নহে। ইহা খোদার, ইহা উচ্ছিষ্ট না হয়।

লোকে বলে ভাত চড়িয়াছে, পচত্যোদনং, বলে "দেবদত্তো গ্রামং গচ্ছতি"; ভাতটি ভবিষ্যৎ; গ্রাম-গমনও ভবিষ্যৎ। অথচ প্রয়োগ বর্ত্তমান। বর্ত্তমানে যদি পাকস্থলী ভগ্ন হয়, তবে চাউলের ভাতরূপ ভবিষ্যৎ পরিণাম হইবে না। বর্ত্তমান পথিমধ্যস্থ দেবদত্ত যদি মরিয়া যায়

তবে ভবিষ্যৎ গ্রাম-গমনটী ঘটিবেই না। তদ্বৎ সৃষ্টি ব্যাপারটী ভবিষ্যৎ, অথচ প্রয়োজন বশতঃ ইহার বর্ত্তমানে উল্লেখ হয়, প্রয়োজনসিদ্ধি হইলে অর্থাৎ ভবিষ্যৎ সৃষ্টির স্রষ্টা যিনি হইলেও হইতে পারিতেন, এমন আত্মা প্রতি পাদিত হইলে, সৃষ্টি বিষয়ে পুনরালোচনা নিষ্প্রয়োজন বলিয়াই উত্থাপিত হয় না।

গ্রামে একটি বর্ষীয়সী বৃদ্ধা ছিল, তাহার নাম ছিল অভয়া ; কিন্তু অল্প বয়স্কেরা তাহাকে নাম ধরিয়া আহ্বান করা রুচিসঙ্গত নহে বুঝিয়া তাহাকে গোপালের মা বলিয়া ডাকিত। গোপালের মা নামে উক্ত বৃদ্ধাকেই সকলে চিনিতে পারিত। কিন্তু বৃদ্ধাটী বন্ধ্যা, তাহার গোপাল নামে ব অন্য কোন নামে কোনও পুত্র বা কন্যা হয় নাই। জগৎটা গোপাল ; অভয়া বৃদ্ধাই অভয় আত্মা।

ঘোর উচ্চাধিকারী বলেন যে সৃষ্টিশক্তি কিছু একটা বস্তু অভয় আত্মাকে প্রচ্ছন্নরূপে সদ্বিতীয় করিয়া বর্ত্তমান নাই। সৃষ্টি শক্তিটী ফলানুমেয়া, কার্য্যলিঙ্গক গম্যা। সৃষ্টিকে বাস্তবিক কার্য্য বলিয়া স্বীকার করিলে, তবে বটে শক্তি-কারণ অনুমিত হয় ; সৃষ্টিকে পচত্যোদনং বৎ ভবিষ্যৎ, কল্পিত আরোপ তটস্থ মাত্র স্বীকার করিলে, শক্তির অস্তিত্ব স্বীকার করিতে হয় না, এবং পুনঃ পুনঃ সৃষ্টির এবং বন্ধনের ভয় মুক্ত অকিঞ্চিৎকর সভয় মুক্তিই যে চরম বস্তু তাহাও স্বীকার করিতে হয় না।

বশিষ্ঠ জগৎকে "ভবিষ্যৎ" বুঝিবার চেষ্টা করিতেন। কিন্তু পারেন নাই। তিনি জগৎকে সাক্ষাৎ "বর্ত্তমান" কল্পিত, মনোরাজ্যবৎ মায়াময় দ্বিচন্দ্রবৎ, প্রতিবিম্ববৎ সুস্থির বৃক্ষের অস্থির ছায়াবৎ, স্বপ্নবৎ, কিঞ্চিৎ বুঝিতে হয় ত পারিয়াছিলেন। মত্তহস্তী দর্শনে পলায়নপর বশিষ্ঠকে উপহাস করিয়া কেহ বলিয়াছিলেন যে, ঠাকুর হাতী ত স্বপ্নের, তুমি

পলাও কেন্?" বশিষ্ঠ প্রত্যুত্তরে বলেন যে, হাতীও স্বপ্নের, আমার পলায়নও স্বপ্নের, তোমার ও তোমাদের উপহাসও স্বপ্নের।

বশিষ্ঠের শিষ্য শ্রীরামজী। রামজী যতবার সৃষ্টির রহস্যের কথা উত্থাপন করেন, ততবার যোগী বশিষ্ট তাহার উত্তর না দিয়া, আখ্যায়িকা আরম্ভ করিয়া আত্মার স্বরূপ লক্ষণ ও আখ্যায়িকার মধ্যেই সৃষ্টি যে ভবিষ্যৎ তাহার অল্প বিস্তর উল্লেখ করিতেন। বহু আখ্যায়িকা শুনিয়া শ্রীরামের অধিকার বৃদ্ধি হইলে তিনি নিজেই সৃষ্টি যে ভবিষ্যৎ তাহা কতকটা বুঝিতে পারিলেন। শ্রীরামের উক্ত প্রত্যয় সুদৃঢ়রূপে পরোক্ষ হইলে, তিনি একদিন গুরু সমীপে উপস্থিত হইয়া সে দিন আর সৃষ্টি বিষয়ে প্রশ্ন করিলেন না। বশিষ্ট বলিলেন, রাম তুমি কৃতার্থ হইয়াছ; তোমার প্রশ্ন শান্ত হইয়াছে, দেখিতেছি। যাও তুমি, মুক্ত। কিন্তু হায় শ্রীরামের অপরোক্ষানুভূতি হয় নাই, যদি হইত তবে ভবিষ্যৎ সৃষ্টিগত গ্রন্থলেখক বা গ্রন্থপাঠক ত বর্ত্তমানে পাওয়া যাইত না; তাহারা সকলেই শ্রীরামাপরোক্ষগত হইয়া মুক্ত হইত। তথাপি রামের উত্তম পরোক্ষ-জ্ঞান হইয়াছিল বলিয়া আমরা তাহাকে আদর করিয়া, খাতির করিয়া, মুক্তরাম বলিয়া থাকি। বস্তুতঃ রাম মুক্ত হন নাই। মুক্তি বস্তুও দুর্ল্লভ রামের; অধিকারেও ন্যূনতা ছিল। সীতা সতীকে বহুকষ্টে কঠোর ধনুর্ভঙ্গপণে পরোক্ষরূপে লাভ করিয়াও রাম তাঁহাকে রক্ষা করিতে পারেন নাই। অপরোক্ষ হইবার পূর্ব্বেই তাঁহার পিতৃসত্য পালনাদি নিম্নাধিকারের সংস্কারবিধিপারবশ্যদোষে মুক্তিসীতা দশমুণ্ড অর্থাৎ দশেন্দ্রিয় রাবণাসুরদ্বারা হৃতা হয়েন।

যদ্যপি রামমহাশয় যৎপরোনাস্তি শ্রমে, সমুদ্র বন্ধনাদি অলৌকিক, অসাধারণ উদ্যোগে পুনরায় সীতাকে উদ্ধার করিয়াছিলেন, তথাপি প্রজারঞ্জনাদি নিম্নাধিকারের বিধিবাধ্য থাকায় সীতাদেবীকে আয়ত্ত

রাখিতে পারেন নাই। সীতা সতী। তিনি এখনও জন্মস্থানেই নিহিতা আছেন। রামজী নকল স্বর্ণ সীতাকে আসলের প্রতিনিধি স্বীকার করিয়া, সন্দেশ ফেলিয়া ঠোঙ্গা চাটিয়া, হাঁদারাম নামে অদ্যাবধি পরিচিত হইয়া আসিতেছেন।

যাহাই হউক, ঘোর উচ্চাধিকারের কথা স্থগিত থাকুক। আমরা মুক্ত রাম নহি; আমরা হাঁদা রামেরও অধম; কনিষ্ঠাধিকারের নিম্নতম স্তরে বা অধিকতর নিম্নেই আমরা অবস্থিত আছি। বশিষ্ঠের মত আচার্য্যও নাই; আমরা শ্রীরামের মত যোগ্য শিষ্যও নহি। আমরা সৃষ্টি স্বীকার করিব। এবং নানা রোচক, ভয়ানক, অর্দ্ধসত্য, আলোচনার ভিতর দিয়া, কাঠের বিড়াল সাহায্যে সত্য ইন্দুর তাড়াইবার আশার মত, যথার্থ সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার আশা রাখিব। আচার্য্য যথার্থ সিদ্ধান্ত বলিলেও আমরা অনধিকার বশতঃ তাহার মর্ম্ম বুঝিতে পারি না; ছবি সুন্দর হইলে কি হয়, অন্ধ আমরা তাহা দেখিতে পাই না।

গুরু আমাদের চক্ষুর অজ্ঞান-তিমির নাশ করিয়া দিব্যদৃষ্টি দিবেন, তবে আমরা দেখিয়া কৃতার্থ হইব। গুরু যে সুতীক্ষ্ণ শলাকাদ্বারা নয়নাবরণ উন্মোচন করেন তাঁহার নাম "পাপত্যাগ, শুভসকাম অনুষ্ঠান, ক্রমে শুভ নিষ্কামাচরণ অভ্যাস।" তবে চিত্তশুদ্ধি হইবে; তত্ত্বমস্যাদি মহাবাক্য শ্রবণানন্তর তদর্থে মনন সামর্থ্য অর্জ্জিত হইবে; তবে শোধিত শ্রুতিবাক্যের মর্ম্মে নিদিধ্যাসন হইবে, তবে পরে আত্মসাক্ষাৎকার হইবে।

বেদান্তের একটি নিন্দা আছে যে, বৈদান্তিক পাপপুণ্য মান্য করে না। চরমে বটে পাপ ত পাপই; ত্যাজ্যই; পুণ্যও সুখভোগপ্রদ সুতরাং চিত্তবিক্ষেপকর বলিয়া পাপ। পাপপুণ্য দুইই ত্যজ্য। কিন্তু আরম্ভ মুখে পাপকে বৈদান্তিক যত ভয় করে, তত আর কেহ করে না।

চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত এই বটে যে, যাহা কিছু আত্মা হইতে পৃথক্ বস্তুতে

প্রবলরূপে চিত্তাকর্ষণ করে, তাহার নাম দেশে বা বিদেশে পাপ বা পুণ্য যাহাই হউক, তাহা পাপই। ইহাকে ভয় করিতে হয়।

প্রথমতঃ আমরা লৌকিক পাপ পুণ্যের স্বরূপ বিচার করিব।

ধাতুগত পাপপুণ্য কিছুই নাই। যাহা একজনের পাপ বলিয়া বোধ হয় তাহাই অপরে উদাসীন ভাবে গ্রহণ করে, অথবা হয়ত পুণ্য বলিয়াই স্বীকার করে। তদ্বৎ সমাজ ভেদেও একই ব্যাপার কোথাও পাপ কোথাও বা পুণ্য কোথাও বা উদাসীনরূপ বলিয়া স্বীকৃত হয়।

শাক্ত মাংসাহার উদাসীন ভাবে করে; বৈষ্ণব তাহা পাপ মনে করে। মুস্কিল আরম্ভ হয়, যখন বৈষ্ণব মাংস ভোজনকে পাপ বুঝে অথচ মাংস-ভোজনে তাহার অত্যন্ত লোভ হয়। অনিষ্ট জানিয়াও তত্রলোভই পাপ। স্পার্টা সহরে চোরের পুরস্কার হইত, আথেন্সে তাহার নির্ব্বাসন হইত। অল্প কয়েক বৎসর পূর্ব্বে লোকে বহুবিবাহ করিতে বা সতীদাহ করিতে কুণ্ঠিত হইত না, এক্ষণে হয়। তিব্বতে দ্রৌপদী এখনও পদস্থ আছে; ত্রিবাঙ্কুরে আইন দ্বারা দ্রৌপদীগণ অপদস্থ হইলে দুই তিন পুরুষেই তৎ-প্রদেশে এক স্ত্রীর বহুস্বামী গ্রহণ পাপ বলিয়াই অনুভূত হইবে। সম্প্রদায়-ভেদে খুল্লতাতকন্যাবিবাহ পাপ বা পুণ্য। বিধবা-বিবাহ কোথাও নিন্দনীয়, কোথাও বা প্রস্তুতান্নের ন্যায় উপাদেয়। শ্যালীকে বিবাহ করার প্রস্তাব এদেশে সমাদরে গৃহীত হয়, কিন্তু তদ্বিষয়ে, বিলাতের Parliament —বলবান্ হইয়াও ভীত ও পশ্চাৎপদ। অতি পূর্ব্বে মিসরাদি দেশে জনক-নন্দিনী বিবাহ চলিত ছিল। এখন সে প্রথা নাই। একই সূর্য্য কমলমণির প্রিয় ও পেচকের পাপ। একই গোবিন্দ রাধার নয়নতারা, কংসের চক্ষুঃশূল। লৌকিক পাপপুণ্যগুলি প্রায়ই সমাজভেদে ও কালভেদে ও পাত্রভেদে পুরুষানুক্রমে পালিত কৃত্রিম সংস্কারমাত্র। কিন্তু কৃত্রিম হইলেও পাপপুণ্য সংস্কারগুলি দৃঢ়, বলবান, ও

আমাদের প্রভু। বিখ্যাত খৃষ্টীয় দশাজ্ঞাও ধাতুগত পাপপুণ্য দেখাইতে পারে না। একই ক্রিয়া দেশ কাল পাত্র ভেদে পাপ বা পুণ্য বলিয়া পরিগণিত হয়। শাস্ত্রে বিচক্ষণগণ প্রতিপ্রসব স্বীকার করেন অর্থাৎ নিষিদ্ধেরও পুনর্বিধান করেন; আপৎকালে অমেধ্য ভোজন; পরম পতিকে পাইলে, পশুপতি ত্যাগ; প্রবাসে বিহিত শৌচাদি ক্রিয়ার শিথিলতা, কর্ত্তব্য বলিয়াই নির্দ্ধারিত হয়। কিন্তু ধাতুগত পাপপুণ্য নাই বা থাকিল। প্রত্যেক ব্যক্তিরই কোনও না কোন বিষয়ে পাপ সংস্কার ত আছেই। তাহা অপরের পক্ষে পুণ্য বা উদাসীনরূপ হউক; কিন্তু যাহার পক্ষে পাপরূপ, তাহার সেই পাপ হইতে রক্ষা ত পাইতে হইবে। পাপ-বোধটী এই যে, বিষয় বিশেষে অনিষ্ট বোধ আছে অথচ তাহাতে প্রবল-রুচি। 'বিজ্ঞ প্রবীণ রোগীও কোন খাদ্য বস্তুকে কুপথ্য বলিয়া জানিয়াও তত্র রুচিমান হয়', প্রসববেদনা অসহ্য দুরন্ত জানিয়াও স্ত্রীলোকে পুত্রমুখ লালসার বশবর্ত্তিনী হয়। মিষ্টান্নলোভী, অপমান ভয়সত্ত্বেও, অনাহূত হইয়াও, শ্রাদ্ধ বাটীতে উপস্থিত হয়। পতঙ্গ হন্তারক দীপের জন্য পাগল হয়। জীব ভিন্ন ভিন্ন ইন্দ্রিয় দ্বারা সুখভোগ করিতে চায়। চক্ষুদ্বারা রূপ, শ্রুতিপথে সঙ্গীত, নাশায় গন্ধ, ত্বকে কোমল স্পর্শ, জিহ্বায় রস এবং প্রিয়ালিঙ্গনে যুগপৎ পঞ্চেন্দ্রিয় সমর্পিত রসানুভব করিতে চাহে। এবং যখন বুঝেও যে তত্তৎ সুখলাভ প্রয়াসে ভবিষ্যতে নিশ্চয়ই অনিষ্ট হইবে, তখনও তত্র প্রবল আকর্ষণ অনুভব করে। জুয়াখেলার ঝোঁক, মদ্যাদিতে পিপাসাও উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত। পাপ তত পাপ নহে; অনিষ্ট বুঝিয়াও প্রবল প্রবৃত্তির বশ্যতাই বলবান্ পাপ। বেদান্ত কেন, সকলেই এই প্রবৃত্তি প্রাবল্যের বিরুদ্ধে খড়্গহস্ত এবং দৃঢ় সংযমাদি অভ্যাস করিতে বলেন। প্রথমতঃ তাহা কোনও উৎকৃষ্ট বিষয়ের, পুণ্যের, আচরণ দ্বারা করিতে হয়; পরে পুণ্যও যদি ক্ষুদ্রফল-স্বর্গাদিতে ইষ্টবুদ্ধি

জন্মাইয়া প্রবল প্রবৃত্তির উদ্বোধন করে, তবে পুণ্যেরও ত্যাগ অভ্যাস করিতে হয়। দেখ দান প্রবৃত্তি পুণ্য প্রবৃত্তিও উত্তম বটে, কিন্তু বলিরাজা অতি দানেই বদ্ধ হইয়াছিল। কবি বলিয়াছেন যে 'গুণ হয়ে দোষ হইল বিদ্যার বিদ্যায়' তবে মন্দের ভাল এই যে, যাহার যাহাতে অনিষ্টবোধ অথচ তত্র প্রবল প্রবৃত্তি মনের গোচর হইবে, সে তাহার সম্বন্ধে সংযমী হইবার জন্য যদি কোন বিশিষ্ট কর্ম্মাভ্যাস উচিত বিবেচনা করে তবে সে নিজ বোধ অনুসারে কোনও পুণ্য কর্ম্মই, নির্ব্বাচিত করিয়া লইবে। পুণ্যাভ্যাসের পরে যখন বেদান্তানুরোধে, ঐহিক সম্মানাদি ও পারলৌকিক স্বর্গাদি-ক্ষয়িষ্ণু ক্ষুদ্র অভ্যুদয় অপেক্ষা, নিঃশ্রেয়সকে অধিক ইষ্ট বুঝিয়া সাধক পুণ্য কর্ম্মও ত্যাগ করিবে, তখন তাহার দ্বারা যদি হঠাৎ কোনও কর্ম্ম ঘটিয়াই যায়, তাহা পূর্ব্বাভ্যাস বশে কোনও কিছু পুণ্য কর্ম্মই হইবে; তাহা অনভিবিষ্টচিত্তেই ঘুমাইয়া মশাতাড়নবৎ ঘটিবে। পাপ কর্ম্ম ঘটিবে না, যেহেতু পাপাভ্যাস ত পুণ্যাভ্যাস দ্বারা পূর্ব্বেই বিতাড়িত হইয়াছে। দণ্ডাপসারণে চক্র কিছুকাল ঘুরিতে থাকে, যে মুখে ঘুরিতেছিল সেই মুখেই ঘুরে, অকস্মাৎ বিপরীত মুখে ঘুরে না। পুণ্যদণ্ডে ঘুর্ণায়মান দেহ পুণ্যাপসরণে কিয়ৎকাল বাধিতানুবৃত্তি-ন্যায়ে কিছু পুণ্যই করিবে; পাপ করিবে না।

অতএব কনিষ্ঠাধিকারে পাপ ত্যাগ হইতে আরম্ভ করিয়া, অভ্যাস দ্বারা দুর্ব্বল চিত্তকে বলবান ও সংযমী করিয়া ক্রমে ক্রমে উচ্চাধিকার প্রাপ্ত হইয়া পুণ্যও ত্যাগ পূর্ব্বক কর্ম্মসন্ন্যাস কর, অনুক্ষণ, দিবানিশি একমাত্র আত্মার ভাবনা উপাসনা, অবিরল অবিচ্ছিন্ন নদী প্রবাহের মত করিতে রহ; তবে যদি অভয় আত্মার অপরোক্ষ জ্ঞান হয়। চিত্তের বিক্ষেপ মাত্র থাকিলে চলিবে না, কি পাপ বিষয়ে কি পুণ্য বিষয়ে; আত্মা পাইতে হইলে, অর্থাৎ "হইতে" হইলে মনে রাখিতে হইবে যে

আত্মা বিশ্বকর্ম্মা নহে, দুষ্কর্ম্মী নহে ; আত্মা অকর্ম্মী। উচ্চাধিকারে কর্ত্তব্য-কর্ম্ম কিছুই নাই; সকল কর্ত্তব্যের ত্যাগই তত্র কর্ত্তব্য। সেই ত্যাগও কর্ত্তব্যরূপ নহে; তাহা সহজ চেষ্টারহিত, স্বাভাবিক, জননীর সন্তান স্নেহের মত, অভিনিবেশে আমাদের শ্বাস প্রশ্বাসের মত, tadpole এর ল্যাজ ত্যাগবৎ।

কোনও কোনও কপট যোগী বলেন যে বেদান্তে যখন প্রমাণ হইয়াছে যে পাপপুণ্য কিছুই নাই, তখন আমরা সকলে যথেচ্ছাচারী হইতে পারি। তাহাতে কোন দোষ নাই। ইহারা নিম্নাধিকারে থাকিয়া উচ্চাধিকারের লম্বা কথা কহে। ইহারা অসত্যবাদী, ইহা-দিগকে চপেটাঘাত করিলে কোন দোষ নাই। ইহারা নিজে অমেধ্য-ভোজী, ঘোর কামী, স্বার্থবশতঃ পরদ্রোহে অকুণ্ঠিত ; কিন্তু কি তামাসারই কথা, ইহারাই ইচ্ছা করে না যে নিজের স্ত্রী লম্পট হউক বা পিতা চোর হউক বা পুত্র মাতাল যথেচ্ছাচারী হউক। খবরদার কপট যোগি! অকপট হও, স্বার্থ বশতঃ ন্যায়ের মর্য্যাদা লঙ্ঘন করিও না ; ব্যভিচারকে যদি দোষ বুঝ, তবে বুঝিও যে, নারীর ব্যভিচারও যেমন পুরুষের ব্যভিচারও তেমনই, চিত্রগুপ্তের খাতায় তুল্য রূপে বিবেচিত হইবে। নারীর সতীত্ব আছে এবং নরের সতীত্ব বলিয়া কিছু নাই, এমন ভুল বুঝিও না। সামাজিক ব্যবস্থা চালাইবার সময় ন্যায়ের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া ব্যবস্থা দিবে। চিত্রগুপ্ত বড়ই শক্ত, সে সমাজের কোনও খাতির রাখেনা। কেহ পবিত্র থাক ভালই, ব্যভিচার বা অন্যদোষ ঘটিতে দিও না। যদি ঘটিয়াই যায়, ভীত হইও না। নরনারী অকপটে পরস্পরের চিত্ত-দুর্ব্বলতা ক্ষমা করিবে। উন্নতির পথে অন্যোন্য সহায়তা করিবে ; অল্প দোষীকে পদদলিত করিয়া অধিক দোষ করিতে বাধ্য করিবে না। ক্ষমা যদি

করিতে পার, তবে ত নিজে যখন অপরাধী হইবে তখন ক্ষমা পাইবার অধিকারী হইবে। অপিচ, অনুতপ্ত দোষীকেই নিজ দিব্য-শীতল ক্রোড়ে লইবার জন্য কাঙ্গালের ঠাকুর পতিত-উদ্ধারণ গোবিন্দ আগুসার। Lost sheer, Prodigal son জগাই মাধাই বৃত্তান্তই ত ভূরিদাতা জগদম্বার বরাভয়- প্রদদক্ষ-মুক্ত-হস্তের পরিচয় দান করে। যীশু মহারাজ অসতী নর নারীকে "Sin no more" এই মহামন্ত্রে চট্ করিয়া সতী করিতে পারিতেন। যতদিন মনের গোচরে পাপ বুদ্ধি থাকিবে ততদিন ইষ্টপ্রার্থী প্রত্যেক ব্যক্তিরই অবনত মস্তকে নিজের কনিষ্ঠাধিকার অঙ্গীকার করিয়া, সংযমাভ্যাসে অপ্রমত্ত, সাবহিত, থাকিতে হইবে। বিক্ত বিক্ষেপ থাকিলে, আত্মেতর কোনও বিষয়ে বিন্দুমাত্র চিত্তের প্রবৃত্তি থাকিলে, গ্রন্থোদ্ধৃত উত্তম পরোক্ষ জ্ঞান লাভেও ফল হইবে না—দুর্লভ অভয় আত্মার সাক্ষাৎকার, অর্থাৎ নিজ স্বরূপ সম্বন্ধে অপরোক্ষানুভূতি, কিছুতেই হইবে না। ভক্তের ইষ্ট ভগবান, বৈদান্তিকের ইষ্ট নিজ স্বরূপ; কিন্তু কি ভক্ত, কি বৈদান্তিক, উভয়েরই জগতে ঔদাসীন্য সম্বন্ধে, ঐক্যমত আছে। গাছের পাড়া, তলার কুড়ান দুইই চলিবে না; কুক্কুটীর অর্দ্ধাংশ সুসিদ্ধ করিয়া খাইবে, অপরাংশ ডিম্ব প্রসব করিবার জন্য রাখিবে, তাহা হইবে না। স্রকচন্দন-বনিতা ভোগও চলিবে অথচ অভয় হইবে এরূপ আশা করিও না। Mammon ও God উভয়ের মন রক্ষা করা চলে না। ভবিষ্যৎ ইষ্টের জন্য আপাততঃ মনোহর অনিষ্টকে সম্যক ত্যাগ করিতে হইবে।

কনিষ্ঠ হইতে উচ্চাধিকারের ক্রমপথের দৃষ্টান্ত দিব।

বালকে খড়্গচালনা শিক্ষাকালে কাঠের তরবারি গ্রহণ করে; পরে সুশিক্ষিত হইয়া আসল ক্ষুরধার খড়্গ চালনা করে। কনিষ্ঠের পক্ষে বেদান্ত খড়্গের সমান। পাপপুণ্য কিছুই নাই ধরিয়া জীবন-

যাত্রা আরম্ভ করিলে, কাঠের তলোয়ারের পরিবর্ত্তে আসল লইয়া ব্যবহার করা হইবে। শিক্ষানবীশ অপরিপক্ক সাধকের নিজ খড়্গাঘাতে নিজ শরীর ক্ষতবিক্ষত হইয়া যাইবে। মনে করিও না যে, তবে বুঝি পাকা হইয়া বৈদান্তিক পাপপুণ্য জ্ঞাতসারে আচরণ করে; এবং নিপুণভাবে চালিত বলিয়া খড়্গ তাহাদিগকে স্পর্শ না আঘাত করে না। তাহা নহে, পাকা বৈদান্তিক কর্ম্মসন্ন্যাসী, সে পাপ কি পুণ্য কিছুই করে না। এই স্থলে একটা কথা বুঝিয়া লইতে হইবে। দৃষ্টান্ত দার্ষ্টান্তিক সহ চৌরস হয় না; হইলে উভয়ে একই বস্তু হইত। দৃষ্টান্তের তাৎপর্য্য লইতে হয়।

পৃথিবী কমলা লেবুর মত বলিলে পৃথিবীকে অম্লরস বুঝিতে হইবে না। অন্ধকে যদি বলা যায় দুগ্ধ বকের মত এবং বক কাস্তের মত; তবে স্পর্শপরিচিত কাস্তের মত হওয়ায় দুগ্ধ পাছে গলা কাটিয়া ফেলে এই ভয়ে অন্ধ যদি দুগ্ধ না পান করে, তাহা হইলে বলিতে হইবে যে অন্ধ দৃষ্টান্তের তাৎপর্য্য লইতে অন্ধ হইয়াছিল। তাৎপর্য্য লইতে পারে নাই এবং অমৃত সমান দুগ্ধ পান হইতে সুতরাং বঞ্চিত হইয়াছিল।

অসহায় অথচ বুদ্ধিমান কোকিল-ডিম্বটা কাকের বাসা আশ্রয় করিয়া কাকবক্ষতাপে ফুটিয়া উঠিয়া কোকিল হয়। তখন সে উড়িতে সমর্থ হইয়া, তবে কাকের বাসা ত্যাগ করে ও নিজ কুহুরবে নিজে আনন্দে বিভোর হইয়া স্বাধীনভাবে অনন্ত গগনে বিচরণ করে। চতুর কনিষ্ঠাধিকারী এই রক্তমাংস গঠিত তুচ্ছ মানবদেহকে নিজ প্রয়োজনে, কাকের বাসার মত আদর করিয়া আশ্রয় করে, ও পাপত্যাগ, পুণ্যানুষ্ঠান, সাধুসঙ্গাদি উপায়ে ফুটিয়া উঠিয়া অধিক অধিকার অর্জ্জন করিয়া, দেহাভিমান ত্যাগ করিয়া, ত্যক্ত পাপপুণ্য, কর্ম্মমুক্ত, স্বাধীন

হইয়া সোঽহংগীতে কলাবৎ হইয়া উচ্চাধিকারের উর্দ্ধপদবীতে, স্বমহিমায়, স্বস্থানে, অভয় হইয়া স্বরূপাবস্থিত হয়।

শ্বাশুড়ী সংসারের শ্রমসাধ্য কর্ম্মগুলি করিবার জন্য বধূকে নিয়োগ করিতেন। বিধিনিষেধ ভয়ে হউক, সহজে হউক, বধূ অনলস হইয়া কর্ম্মগুলি সম্পাদন করিতেন। একদিন শ্বাশুড়ী দেখিলেন যে কর্ম্মরতা বধূ অন্তঃসত্ত্বা; তৎক্ষণাৎ শ্বাশুড়ী বলিলেন "বউ মা, তুমি আর কর্ম্ম করিওনা, যদি হঠাৎ কিছু কর্ম্ম কর, দেখিও যেন হাল্কা কর্ম্ম হয়।" ক্ষুদ্র স্বর্গাদিফলপ্রদ বিধি নিষেধ-বদ্ধ কর্ম্ম গুরুতর অভিনিবেশ সহ অর্থাৎ "অহং করোমি" ভাবে আর করিবে না; করিলে গর্ভস্থ পরোক্ষজ্ঞানরূপী শিশুর হানি হইবে।

শ্বাশুড়ী আচার্য্য বা অন্তর্য্যামী; বধূ আদৌ কনিষ্ঠাধিকারী, পাপত্যাগী, পুণ্যকৃৎ; বধূই পরে "অহমাত্মা" এই পরোক্ষজ্ঞানবান্ ও

যজ্ঞে চিহ্নিত পবিত্রবৃষকে আর লাঙ্গল বহন করিতে হয় না।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি "কর্ম্মী" শ্রীরাম পিতৃসত্যপালন, প্রজারঞ্জনাদি বিধিসংস্কার-কৈংকর্য্য ত্যাগ করিবার উপযুক্ত সময় উপস্থিত হইলেও ত্যাগ করিতে অসমর্থ হইয়াছিলেন ও আনন্দময়ী সীতা সতীকে অপরোক্ষানুভব করিতে পারেন নাই। মাতৃ-স্তনের প্রতিনিধি বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ লেহনবৎ আসল হারাইয়া নকল স্বর্ণসীতাকে বৃথা আশ্রয় করিয়াছিলেন।

পাপত্যাগ অভ্যাসে দ্বিজত্ব হয়; দ্বিজে প্রদত্ত হইলে তবে দীক্ষা ফলবতী হয়। কাম ক্রোধ ক্ষুধা নিদ্রাদি পাপজয়ের রহস্য বলিব। প্রথমতঃ বটে, কাম জাগিতেছে, কিন্তু বলপূর্ব্বক তাহার ক্রিয়া দেওয়া হইতেছে না, এই অভ্যাস করিতে হয়। কিন্তু তখনও অজিত কাম সাক্ষাৎ বর্ত্তমান, যেহেতু মনকে আক্রমণ করিতেছে। তখন

কাম ক্রিয়া বটে সংযমিত, নিরুদ্ধ, কিন্তু কামটী জিত নহে। কামের চিত্ত—বিক্ষেপকরত্বাদি গুরুতর দোষ-দর্শন অভ্যাস পাকে কাম জয় হয়। তখন কামের কোনও স্বগত নিদর্শন পাওয়া যায় না। যথা পুরুষ ভগিনী, কন্যা, বা মাতাকে দেখিয়া সহজেই কামী হয় না, তদ্বৎ তখন পুরুষ যাবতীয় নারীকে দেখিয়া কামী হয়ই না; যথা নারী ভ্রাতা পুত্র পিতাকে দেখিয়া সহজেই কামী হয় না; তদ্বৎ নারী তখন যাবতীয় পুরুষকে দেখিয়া সহজেই মোটেই কাম অনুভব করে না। যথা দোকানে গো শূকরাদির মাংস দেখিয়া হিন্দুর তাহা ক্রয় পূর্ব্বক স্বাদ গ্রহণ করিবার ইচ্ছালেশ উদিত হয় না। ইহাই কাম-জয়। দ্বিজত্বটীও এই সঙ্গে বুঝিতে পারা যাইবে। বালক বালিকার কাম নাই, তাহাদের পক্ষে কামজয়ও নাই। বালক বালিকার যৌবন হইলে তাহারা কাম বুঝিতে পারে এবং তত্র রত থাকিবার কালেই ভাগ্যবান্ সুজন হইলে সংযম অভ্যাস করে; ক্রমে উচ্চাধিকারে কামজয় হইয়া যায়; তখন মনে স্বার্থ কাম জাগেই না। ইহাই দ্বিজ হওয়া, ইহা পুনরায় ঠিক বালক বালিকা হওয়া নহে, বালক বালিকার "মত" হওয়া। তাহাদের দ্বিজত্ব প্রাপ্তির পরে স্বগত কাম থাকে না কিন্তু কাম কি বস্তু তাহা জানা থাকে এবং অন্যান্য ব্যক্তিতে পরস্পর কামের উদ্ভব হইলে তাহা দেখিয়া চতুর দ্বিজ ব্যাপারটা বেশ বুঝিতে পারে। যীশু নাইকোডিমসকে এইরূপ দ্বিজ হইতে বলিয়াছিলেন। গোস্বামী বলেন যে এতটা ও এইরূপ কামজয়ী হইয়া তবে রাধা-গোবিন্দের অলৌকিক-প্রণয়-পবিত্র-নিকুঞ্জ ভবনে নর্ম্মসখী ললিতাদির প্রবেশানুমতি প্রাপ্তি ঘটিয়াছিল। মেয়ে হিজড়ে পুরুষ খোজা হইয়া তবে কর্ত্তাভজার ব্যবস্থাও দ্বিজত্বেরই কথা। লৌকিক পিতামাতা নিজে স্বগত লোভী নহে, অথচ কামের বা কাম মিশ্র প্রেমের বা বিশুদ্ধ প্রেমের তত্ত্ব, অল্প বা বিস্তর অবগত থাকিয়া

পুত্রবধুর বা কন্যা জামাতার গূঢ় মিলনে পরমানন্দ অনুভব করেন; অলৌকিক বৃন্দাবন-বিলাসের কথা কি আর বলিব; তত্রজিতকামা, রাধা শ্যামেরও মান্যা-ললিতাদি প্রিয় সখীগণ দ্বারা রাধা-গোবিন্দের লীলা সহায়তা হইতে ললিতাদির এবং রাধা-গোবিন্দেরও যে কি আনন্দ হইত, তাহা পরোক্ষ চর্চ্চা করিতে করিতে যাবৎ না ললিতাদি ভগবতীর কৃপায় অপরোক্ষ হয় তাবৎ বুঝিবার উপায় নাই।

উক্তরূপে ক্রোধাদি জয় বুঝিবে। পূর্ব্বে যে সকল কারণে ক্রোধাদি হইত, সেই সেই কারণ বর্ত্তমান, অথচ যদি ক্রোধ হয়ই না এরূপ হয় তবে বলা যায় যে, ক্রোধাদি জয় হইয়াছে। ইহাও দ্বিজত্ব। ক্রোধ হইতেছে, কিন্তু হঠ পূর্ব্বক ক্রোধের ক্রিয়া হইতে দেওয়া হইতেছে না, এরূপ হইলে ক্রোধ-জয় বলা যায় না। বটে তাহা সাধনাবস্থা, কিন্তু তাহা সিদ্ধাবস্থা নহে।

ক্ষুধার পীড়া চিত্তকে আত্মালোচনা হইতে, প্রবল আকর্ষণ করে। যে "এক" ব্যক্তির দ্বারা আত্মা অপরোক্ষ হইলে সকল জীবের মুক্তি হইবে তাহার ইতঃপূর্ব্বেই ক্ষুধা-জয় হইয়া যাইবে। আত্মসৃষ্ট জগৎ, আত্মার ইচ্ছাতেই সেই "এক" ব্যক্তির অনুকূল ভৃত্যবৎ হইবেই। স্নেহময়ী জননী যথা, শিশুর দ্বারা ক্ষুধায় কাতরতা অনুভূত হইয়া তাহার ক্রন্দন করিবার পূর্ব্বেই শিশুকে স্তন্য দিয়া থাকেন এবং সুতরাং ক্ষুধার যন্ত্রণা যে কি বস্তু তাহা শিশুকে অনুভবই করিতে হয় না; তদ্বৎ সাধককে জগৎ গত ভ্রাতা, বন্ধু বা যে কোনও সম্বন্ধী যথাসময়ে জঠরে জ্বালা উদয় হইবার পূর্ব্বেই বরাবর কিছু খাওয়াইয়া যাইবে।

নিদ্রাজয়টী উক্তরূপ আশ্চর্য্য কিছু। সাধকের সুষুপ্তি রহিত হইয়া যাইবে এবং কি জাগরে, কি স্বপ্নে তাহার যে কোন দেহে অভিমান হউক, সাধক সেই দেহের দেহী হইয়া অনবরত আত্মার চর্চ্চাই করিতে

থাকিবে। জাগরে স্ববশে আত্মচিন্তা, স্বপ্নে অবশে ইতর চিন্তা এরূপ হইবে না।

প্রস্তাবাংশের নিষ্কর্ষ এই হইল যে আমাদের উপস্থিত পাপ পুণ্য বোধ, ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির, ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ে, আছে, অর্থাৎ আমরা মন্দ জানিয়াও কোনও কোনও কর্ম্ম করিবার জন্য প্রবলরূপে আকৃষ্ট হই। আমাদের চিত্তের সেই দুর্ব্বলতা, দৃঢ় সংযমাভ্যাসে দূর করিতে হইবে। ক্রমে চিত্ত বলবান্, অবিক্ষিপ্ত ও শুদ্ধ হইবে। তখন যদি বুঝা যায় যে পাপ পুণ্য কিছু নাই, আনন্দ স্বরূপ আত্মা হইতে প্রাদুর্ভূত যে কোনও বস্তু, সকলই রসরূপ, কেহই সয়তান নহে, সবই রসের, চিনির, জমাট স্বরূপ, কি বাঘ, কি গোলাপ, তখন সুতরাং অবশে রসরূপ জগৎ হইতে, আমি ভক্ত হইলে রসানুভব করিব ও বৈদান্তিক হইলে স্বয়ং রস স্বরূপ হইব।

প্রসঙ্গাগত পাপ পুণ্যের সংক্ষিপ্তালোচনা শেষ হইল। এক্ষণে আত্মার লক্ষণ চিন্তিত হইবে। একই অদ্বিতীয় স্বরূপ লক্ষণের নানা নাম ; আত্মা, সৎ, চিৎ, আনন্দ, ব্রহ্ম, অহং, ওঁ বম্, প্রণব, সামান্য, কেবল, প্রত্যক্, স্বাস্থ্য, নির্বিশেষ নির্গুণ, নির্বিকল্প, নিরুপাধি, মঙ্গল, রস, মধু, শিব, অভয় ইত্যাদি।

নানা তটস্থ লক্ষণগুলি যথা, জগৎদ্রষ্টা অর্থাৎ "ঈশ্বর সাক্ষী" ; এবং জগৎ স্রষ্টা পাতা সংহর্ত্তা অর্থাৎ "ঈশ্বর কর্ত্তা"।

আমরা বাল্যকাল হইতে শিক্ষা পাইয়াছি যে আত্মা, সৎ, চিৎ ও আনন্দ চারটী পৃথক বস্তু। তাহা ভুলিতে হইবে। বেদান্ত বলে—একই বস্তুর চারটী নাম, আত্মা, সৎ, চিৎ, রস। একটী নামের উল্লেখে অপর গুলিকে অভেদে বুঝিতে হইবে। চারটী নামই একটী বস্তুর নিত্য সহচর ও সমর্পক।

আমি আছি ; আমিই বুঝি যে আমি আছি এবং আমি যে বুঝিতেছি

যে আমি আছি, ইহাই আনন্দ। অত্র দেখ, আমি "আত্মা" আছি বলিয়া "সৎ" এবং অহমস্মি "বুঝি" বলিয়া "চিৎ", এবং আমির যে অভাব নাই, আমি যে মৃত নহি, আমি যে অসৎ নহি, "আমি"র যে মৃত্যু নাই, ইহাই ত "আনন্দ"। গীতাদি শাস্ত্রে বারংবার বলা আছে যে আত্মা অজয়, অমর, অক্লেদ্য অচ্ছেদ্যাদি। কিন্তু শ্রোতা বক্তা কেহই তাহা অপরোক্ষ করে নাই, সুতরাং সকলেরই মরণভয় আছে। আশা আছে একদিন না একদিন "আমি"র ইহা অপরোক্ষ হইবেই যে, মৃত্যু বলিয়া সদ্‌প্রতিদ্বন্দ্বী কিছু নাই; থাকিতে পারে না। এক একটী মৃত্যু এক একটী নিরীহ স্বপ্ন ভঙ্গ মাত্র। স্বপ্ন ভঙ্গে, স্বপ্নগত যাবতীয় শত্রু মিত্রাদি সম্বন্ধী ও উদাসীনগণের সহ স্থায়ীরূপে বিচ্ছেদ হয়; ইহাই মৃত্যু। স্বপ্নভঙ্গের পরে, মৃত্যুর পরে, অন্য একদল শত্রু মিত্রাদি সম্বন্ধী ও উদাসীনগণের সহ বসবাস ও জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে হয়। ইহা একটী নূতন স্বপ্ন, এই স্বপ্নভঙ্গের নাম আর একটী মৃত্যু; এই মৃত্যুতে এই স্বপ্নগত যাবতীয় জীব সহ স্থায়ীরূপে বিচ্ছেদ হইয়া যায়। অপর একটী স্বপ্নরাজ্য উপস্থিত পাওয়া যায়। কিন্তু এতগুলি মৃত্যুর ভিতরেও সেই "একই", আমি, আত্মা সদা বর্ত্তমান; ইহা কি আনন্দের কথা নহে?

পাওয়া গেল আত্মা, সৎ, চিৎ, রস, পর্য্যায় শব্দ। আমাদের তথাপি বাল্যকালের শিক্ষা-সংস্কার-দোষে চারটী শব্দের পৃথক চারিটী অর্থেরই গ্রহণ হয়। সৎ-শব্দার্থটী অতি সহজে উপলব্ধ হয়; বুঝিতে সহজ হইবে বলিয়াই ছান্দগ্য সৎ শব্দের প্রতিপাদ্য সদাত্মার প্রসঙ্গ করিয়াছেন, আমরাও প্রথমে তাহাই করিব; পরে ক্রমে চিৎ রস শব্দার্থের আলোচনা করিব। কিন্তু বিলম্বে হউক ক্ষতি নাই, চারিটী শব্দই যে এক অভয় সামগ্রীর নাম তাহা হৃদয়ঙ্গম করিতেই হইবে।

ছান্দোগ্য আত্মাকে সৎ নামে, বৃহদারণ্যক আত্মা নামে, তৈত্তিরীয়

আনন্দ নামে, প্রশ্ন ওঁ নামে, মাণ্ডুক্য শিব নামে, Jesus I নামে, মহম্মদ খোদা নামে, তন্ত্র কৈবল্য নামে, তলবকার ব্রহ্ম নামে, কঠ পুরুষ নামে, ঐতরেয় প্রজ্ঞা নামে, গীতা ও দেবী সূক্ত অহং নামে, নির্দ্দেশ করিয়া আত্মার উপাসনা করিয়াছেন অর্থাৎ সন্নিকটে দৃঢ়াসন করিয়াছেন। কিন্তু সত্য কথা বলিতে কি, কেহই তাদাত্ম্য স্থাপন করিতে পারেন নাই। যে কেহ পারিবেন তিনি নিজে মুক্ত হইবেন ও তৎসঙ্গে অন্য সকলেই মুক্ত হইবে। আমরা সমান সৎ হইতে অসমান অর্থাৎ নানা বিশেষাকার সৃষ্টি মানিয়া লইয়াছি। সেই সৃষ্টির কোনও রকমের একটা গল্প রচনা করিব; গল্প শুনিলে অপুণ্যবান্‌ও পুণ্যবান হইবে। ইহা সাহস করিয়া বলিলাম। অভয়ের কথা লিখিতে যদি সাহস না হইবে, তবে আর হইবে কবে? পাঠক পাঠিকা এই গল্পটীকে এবং এই গল্পটীকেই ভাষান্তরিত করিয়া, অন্যচ্ছন্দে বদ্ধ করিয়া, নিজ নিজ রুচিকর নানা রকমে সাজাইয়া, পুনঃ পুনঃ পাঠ করিবেন। পুনঃ পুনঃ পাঠের নাম জপ; প্রাচীন মহামহোপাধ্যায় বেদব্যাস ব্রহ্মসূত্রে আফলোদয় জপ, অর্থাৎ অসকৃৎ আবৃত্তির উপদেশ করিয়াছেন।

নিমিত্ত কারণ কুম্ভকার, উপাদান কারণ মাটী সংগ্রহ করিয়া, ঘট-কার্য্য উৎপাদন করে। কার্য্য ঘটে, উপাদান কারণ মাটীকে অবিকৃত অবস্থায়, কিন্তু একটা বিশেষ সংস্থানে, বিশেষ আকারে, ঘটাকারে পাওয়া যায়। কার্য্য ঘটে কিন্তু নিমিত্ত কারণ কুম্ভকারকে বর্ত্তমান পাওয়া যায় না।

উর্ণনাভ নিজেই আপনাকে সূত্ররূপে সংস্থিত করিয়া অর্থাৎ নিজেই নিমিত্ত নিজেই উপাদান হইয়া জালরূপ কার্য্য তৈয়ার করে। কার্য্যে উপাদান কারণ ত নিশ্চয়ই অনুগত, অন্বিত, অনুবর্ত্তিত, অনুপ্রবিষ্ট, নিত্য সহচর থাকিবেই। অত্র উর্ণনাভ উপাদান হওয়ায়, সে কার্য্য জালে

আছেই এবং নিজেই নিমিত্ত হওয়ায় উপাদান সহ নিমিত্ত রূপেও উর্ণনাভকে তৎকার্য্য জালে পাওয়া যায়।

জল যখন মেরু প্রদেশস্থ বরফের উপাদান এবং নিমিত্ত উভয়ই, তখন নিমিত্ত জল, উপাদান জল সহ, কার্য্য বরফে অবশ্যই উপস্থিত থাকে। [পাঠক পাঠিকাগণ স্থূল দৃষ্টান্তের মর্ম্ম মাত্র লইবেন।]

তদ্বৎ অদ্বয় সমান সৎ নিজে নিমিত্ত কারণ ও নিজেই উপাদান কারণ হইয়া নানাকার জগৎ- কার্য্যরূপ ধারণ করিয়াছেন। এই নানা, বিশিষ্ট আধার গুলিতে উপাদান সৎ ও উপাদান সঙ্গে নিমিত্ত সৎকে অনুপ্রবিষ্ট পাওয়া যায়। এই সদনুগত নানাকার গুলির সমষ্টিই জগৎ; জগৎগত যাহা কিছু তাহা আমাদের, হয় ইন্দ্রিয়গোচর, না হয় কল্পনাগোচর। ইন্দ্রিয়গোচর বা কল্পনাগোচর যাহা নহে, তাহার প্রসঙ্গই হইতে পারে না। যাহাদের প্রসঙ্গ হয় তাহারা, ইন্দ্রিয় গোচরই হউক বা কল্পনাগোচরই হউক, তাহারা অস্তি অর্থাৎ সদনুগত ও ইদংরূপে গ্রাহ্য কোনও অন্যতম বিশেষাকার। অসৎ কিছু নাই, যেহেতু থাকিলেই অস্তিত্ববান্ অর্থাৎ সৎ বস্তু হইয়া যায়। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, সামান্য সৎটী অদ্বন্দ্বিত, Absolute; ইহার প্রতিদ্বন্দ্বী, Relative অসৎ কিছু নাই; যদি থাকিত তবে "থাকিয়াই" সৎ হইত ও প্রতিদ্বন্দ্বিত্ব ত্যাগ করিয়া সদ্ভুক্ত হইয়া সতের অদ্বন্দ্বিতত্ব বজায় ও জাহির করিয়াই দিত।

স্বপ্নারম্ভের মত, সদাত্মা নিজ নিমিত্তোপাদানে বিসৃষ্ট, বিসর্জ্জিত, নানাকার বিশিষ্ট জগৎ দেখিলেন। যুগপৎ প্রস্তুত জগতের নানা বস্তু, তাহাদের অবকাশদাতা দেশ; বস্তুগুলির মধ্যে জীর্ণত্ব ও নবীনত্ব সম্পাদক অতীতাদিকাল; অবয়বী ঘটাদি, অনঙ্গ কাম শোকাদি, ও নানা জীবের পিতা পুত্র শত্রু মিত্রাদি সম্বন্ধ পাওয়া গেল। সমগ্র জগৎটা সন্নিমিত্ত সদুপাদান, সমান অস্তিত্বের একটা বিশেষরূপ মাত্র, জগৎ রূপ মাত্র।

জগৎটা সৎ প্রতিযোগী নহে; অসৎ নহে। যাহা কিছু প্রতিদ্বন্দ্বিত্ব, Relativity, তাহা জগতের নানা অংশাশ্রয়ে আছে। যিনি জগৎ স্রষ্টা তিনি Absolute, তিনি Relativity অতিক্রম করিয়া, দ্বন্দ্বাতীত হইয়া বর্ত্তমান; তিনিই জগতের জন্মদাতা তিনিই সৃষ্টজগৎগত, নানা জগদংশ, পরস্পর Relative দ্বন্দ্ব গুলির সত্বাদাতা, সুতরাং তাহাদের জন্মেরও পৌর্ব্বকালিক, মহামহিম, তিনি স্বয়ং সিদ্ধ, স্বমহিম্নি প্রতিষ্ঠিত, কোনও কিছুর নিরপেক্ষ। এই নির্দ্দোষ নিরতিশয় শুদ্ধ সমান সৎ কোটী কোটী বিরুদ্ধ বস্তুতে অনুপ্রবেশ করিয়া, বিরুদ্ধ বস্তুকে সত্বাদান করিয়া, তত্র তত্র সন্নিবিষ্ট থাকিয়াও, ষোল আনা, যৎপরোনাস্তি নিজ শুদ্ধতা অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছেন; হাততালি যথা "বাহবা" ও "দূওও" প্রত্যেকের উপাদান অথচ অবিকৃত হাততালি মাত্র; দশন-বিকাশ যথা নিরীহ হইয়াই সুমধুর হাস্যেও বিকট বিদ্বেষে অনুগত থাকে; মাটীর ঠাকুর ও মাটীর কুকুরে যথা মাটী নিরপরাধ মাটী মাত্র থাকে, যথা সুর্য্যাবস্থিত জ্বালাকর ও চন্দ্রস্পৃষ্ট মনোহর আলোক রশ্মি আলোকরশ্মিই মাত্র; পারদ যথা তাপমান যন্ত্রে বিশিষ্ট স্থানাবস্থিত হইয়া জীবন্তের তপ্তশোণিতবৎ উষ্ণ বা মৃত্যুর মত হতাশ শীতল হইলেও পারদ নিজে উদাসীনই।

তদ্বৎ জগতে, সর্ব্বত্র, কি ইন্দ্রিয়গোচর, কি কল্পনাগোচর বস্তুতে, উপাদান শুদ্ধসৎকে অনুগত হিসাবে পাওয়া যায়। যদি কখনও সংশয় হয় তখন নিজেই বা আচার্য্য সাহায্যে উপাদান, সমান, উদাসীন, বিশুদ্ধ, অবিকৃত সৎকে তত্তৎ বিশেষাকারে অশংসন্নিতরূপে অনুগত দেখিয়া লইতে হইবে।

মন্দান্ধকারে বা আমার ইন্দ্রিয়ের অপাটবে যদি অনুগত উদাসীন রজ্জুকে না দেখিতে পাই এবং তত্রস্থলে সর্প, পুষ্পমালা, বংশ, জলধারা,

ভূচ্ছিদ্র বা অন্য কোনও সদৃশ বস্তুর উপলব্ধি হয়, তবে আলোক ত আছে, আচার্য্য ত আছে, বিচার দৃষ্টি ত আছে ; তৎ সাহায্যে অনুগত রজ্জু নিশ্চয় দৃষ্ট হয় হইবে।

চরম সৎটী চরম বিশেষ্য ; ইহা কখনও বিশেষণ হয় না, অন্যান্য বস্তু কখনও বিশেষ্য হয়, কখনও বিশেষণ হয়। তাহারা স্থূল বিশেষে ক্ষুদ্র বিশেষ্যই হউক আর বিশেষণই হউক, কিন্তু চরমে তাহারা সকলেই চরম সমান সতের বিশেষণ।

ছোট ঘট, পুরাতন ঘট, ভাঙ্গা ঘট ইত্যাদি। অত্র ঘট বিশেষ্য ছোটত্ব পুরাতনত্ব, হীনাঙ্গত্ব, ঘটের বিশেষণ।

দীর্ঘ পট, ছিন্ন পট ইত্যাদি অত্র পট বিশেষ্য ; দীর্ঘত্ব, ছিন্নত্ব, পটের বিশেষণ।

ঘট অস্তি, পট অস্তি ইত্যাদি, অত্র অস্তিত্ব বিশেষ্য, চরম বিশেষ্য, ঘটত্ব ও পটত্ব অস্তিত্বের বিশেষণ। সমান অস্তিত্বটী ঘটাকারে, ঘট বিশেষণে বিশিষ্ট এবং পটাকারে পট বিশেষণে বিশিষ্ট।

ছোটত্ব, পুরাতনত্ব, হীনাঙ্গত্ব, দীর্ঘত্ব, ছিন্নত্ব, ইহারাও প্রত্যেকে অস্তি এবং প্রত্যেকে সমান অস্তিত্বের নানা ভিন্ন আকার। পুরাতনত্ব, হীনাঙ্গত্ব দীর্ঘত্ব ছিন্নত্ব প্রত্যেকেই সমান অস্তিত্বের বিশেষণ।

চরমবলবান বিশেষ্য সৎএর নিকট, ছোটত্বাদি বিশেষণের ত কথাই নাই, দুর্ব্বল বিশেষ্যগুলিও অর্থাৎ পটাদিও সকলেই নিজনিজ পাগড়ী নামাইয়া স্পর্দ্ধা ত্যাগ করিয়া, ক্ষুদ্রবিশেষত্বরূপ মর্য্যাদা বর্জ্জন করিয়া চরম সতের বিশেষণত্ব স্বীকার করে।

বড় তামাসা হইয়াছে। সমান সৎটী স্বপ্রচার করিয়া সদ্বিলাসরূপ জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন। আমরা ফাঁকি দিয়া জগতের এবং জগতে প্রতি অংশের একটা না একটা বিশেষাকার বা উপাধির সহ তত্র তত্র

নিত্য সহচর নিত্যানুগত সৎকে ইদংরূপে দেখিতে পাইতেছি ; যথা মাটীর হস্তী, রথে, মৃত্তাণ, তথাই ঘটে দ্বিচন্দ্রে প্রতিবিম্বে সত্তাণ। অবশ্য উপাধিটী সসীম হওয়ায় আমরা ক্ষুদ্র উপাধি সংলগ্ন সৎকে ক্ষুদ্ররূপে দেখি ; ভূমারূপে নহে। বিশিষ্ট উপহিত সৎটী সাক্ষ্য শ্রেণীতে আসিয়া পড়িয়াছে। কখনও আশা হয় যে যদি হঠ পূর্ব্বক সকল উপাধিগুলিকে ভুলিতে পারি এবং তত্র তত্র অনুগত সৎ যদি পিণ্ডীকৃত, পুঞ্জীভূত হয়, তবে বুঝি বা ভবিষ্যতে সমান সৎকেও দেখিতে পাইব। কিন্তু সে আশা বৃথা। যে আমি দ্রষ্টা হইয়া সমান সৎকে দেখিতে আশা করি, সকল উপাধির সহ তদন্তর্গত অন্যতম "দ্রষ্টৃত্ব" উপাধিরও লয়ে যে "আমি" নেতি মুখে সমর্পিত হয় সেই আমিই সমান সৎ ; সুতরাং দেখিবার সময় 'দ্রষ্টৃত্ব' না থাকায় দেখিতে পাইব না ; বর্ত্তমানে বটে বুঝিতে পারি যে অহংই অস্মিরূপ, অস্তিরূপ। সমান আমি, সমান আমিকে, সুষুপ্ত আমিকে দেখিতে পারি না ; কর্ত্তৃকারক, নিজের কর্ত্তৃকারকত্ব বজায় রাখিয়া বিশিষ্ট, উপহিত, কর্ম্মকারক হইতে পারে না। উপাধিতে যে অনুগত সৎ দেখা যায় তাহা দর্পণগত প্রতিবিম্ব দেখার মত নকল বস্তু দেখা মাত্র। বৃক্ষ দেখা নহে, বৃক্ষের ছায়া দেখার মত। যাহাই হউক আমরা গোটাকয়েক জগদংশে অবিকৃত, নিষ্কলঙ্কিত সৎএর কৌতুককর অনুপ্রবেশ দেখিয়া লইব।

যাহা কিছু ইন্দ্রিয়গোচরে বা কল্পনাগোচরে আছে বলিয়া বোধ হয়, তাহাতেই, তাহা আছে বলিয়াই, সৎ, অনুগত হইয়া বর্ত্তমান এবং আছে "বোধ" হয় বলিয়াই তত্র চিৎ বর্ত্তমান এবং বোধ আমারই হয় বলিয়া আমি, আত্মা বর্ত্তমান। সৎটী ত অচেতন নহে ; ইহা চিৎ। বস্তুর "থাকা" হইলেই তত্র অস্তিত্ব ও থাকার বোধরূপ চিৎ আমার বোধ হিসাবে আত্মা এই তিন, সচ্চিদাত্মা, অনুগত থাকিবেই।

পট একটী অবয়বী বস্তু ; পট অস্তি, পটাবয়ব অস্তি, অবয়ব অস্তি। বটে কোন না কোন বস্তু আশ্রয়েই অবয়ব থাকে ; অবয়ব আশ্রয়— বস্তু হইতে পৃথকরূপে ইন্দ্রিয়গোচর নহে ; কিন্তু ইহা পৃথক রূপে কল্পনা গোচর বটে এবং সুতরাং ইহা অস্তি বটে, অসৎ নহে।

সুখ একটী নিরবয়বী। শোক অপর একটী নিরবয়বী। সুখ অস্তি, শোক অস্তি, নিরবয়বত্বও অস্তি।

অবয়ব নিরবয়ব উভয়ে একটী দ্বন্দ্ব। দ্বন্দ্বটী অস্তি, দ্বন্দ্বাংশ অবয়ব অস্তি, দ্বন্দ্বাংশ নিরবয়বত্ব অস্তি।

জীবন ও মৃত্যু একটী দ্বন্দ্ব। অত্র দ্বন্দ্বটী ও দ্বন্দ্বাংশ দুইটীই প্রত্যেকে অস্তি। অস্তিত্বটী কিন্তু দ্বন্দ্ব অতিক্রম করিয়া, কোনও দ্বন্দ্বের কোনও অংশে অলিপ্ত, অদুষ্ট হইয়া অস্তি ; দ্বন্দ্বগুলির সৃষ্টির পৌর্ব্বকালিক অস্তিত্বটি, সমান সৎটি, তৎকালে এবং সৃষ্টির উত্তর কালেও নির্দ্বন্দ্ব, অদ্বন্দ্বিত, জগতের দ্বন্দ্বগুলিতে থাকিয়াও দ্বন্দ্বগত বিরোধে অস্পৃষ্ট অশুদ্ধ। ভাল অস্তি, মন্দ অস্তি। দুগ্ধ অস্তি, বিষ অস্তি। দুগ্ধের পুষ্টিকরত্ব অস্তি। বিষের মারকত্ব অস্তি। যথা মাটীর ঠাকুরে ও মাটীর কুকুরে মাটী মাটী মাত্র, ঠাকুরও নহে কুকুরও নহে, তদ্বৎ অস্তিত্ব দুগ্ধে থাকিয়া দুগ্ধও হয় নাই, দুগ্ধের পুষ্টিকরত্বে থাকিয়া পুষ্টি-করও হয় নাই ; বিষে থাকিয়া বিষ হয় নাই, বিষের মারকত্বে মারক হয় নাই। দুগ্ধবিষাদি সহস্র সহস্র বিরুদ্ধ বস্তু প্রত্যেকেই সদনুপ্রবিষ্ট, সদনুপ্রবিষ্ট বলিয়াই ত আছে। ইহারা সকলেই সদাশ্রয়ে আছে, অথচ নিজ নিজ দোষগুণে সৎএর ক্ষতি বৃদ্ধি করে না। যথা গাভীস্থ দুগ্ধ গাভীর পুষ্টি করে না ; সর্পস্থ বিষ সর্পকে বধ করে না ; তদ্বৎ এক অদ্বিতীয় সমান সতের নানা বিরুদ্ধ বিশেষাকার, কি দুগ্ধ কি বিষ সদবলম্বনেই আছে অথচ সৎকে পুষ্ট বা বিষাক্ত করে না। এবং

সুষুপ্তিতে, দুগ্ধবিষাদি দুগ্ধাকার বিষাকার ত্যাগ করিয়া যথা ঠাকুর ঘরে শুদ্ধাচারী ব্যক্তি অপবিত্র বস্ত্রাদি ত্যাগে উলঙ্গ হইয়া প্রবেশ করে, তথা শুদ্ধ সমান মতে প্রবেশ করে; তত্র পুষ্টিকরত্ব মারকত্ব লইয়া যায় না। ঘটে দুটী বস্তু আছে; এক 'মাটী,' অপর পৃথূদরত্ব জলাহরণ-সামর্থ্য ইত্যাদি 'ঘটত্ব'। ঘট ভাঙ্গিয়া যখন মাটীতে পৌঁছায়, তখন ঘটত্ব মাটীকে 'অপ্রাপ্য এব' রজ্জুতে নিবৃত্ত হয়; তদ্বৎ আত্মায় বিলাস-রূপ দুগ্ধ-বিষাদির সমষ্টি জগৎ আত্মাকে 'অপ্রাপ্য এব' আত্মাতে নিবৃত্ত শান্ত হয়। তৈত্তিরীয় 'যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ' শ্রুতিধৃত যতঃ অর্থে যস্মিন্, এবং নিবৃত্তি অর্থে অবগাহন, বাধ। অবয়ব অবয়বী ঘট, নিরবয়ব নিরবয়বী সুখ সবই অস্তি; ইহাদের জন্মদাতা, ইহাদের পৌর্ব্বকালিক অস্তিত্বটী, সমান, কিন্তু অবয়বী নহে, নিরবয়বীও নহে, সুখও নহে, দুঃখও নহে; ইহা বিকল্পনা-লেশশূন্য, নির্বিকল্প, অভয়ানন্দ।

ভ্রমও অস্তি; কল্পনাও অস্তি; কল্পিত বস্তুও অস্তি; ইহারা ইদংরূপে বোধগোচর বলিয়া, অস্তিও বটে, চিৎও বটে; সদনুগতও বটে, চিদনুগত ও বটে। আমির গ্রাহ্য বলিয়া আত্মানুগতও বটে।

রজ্জুসর্প দৃষ্ট হইলে বুঝিতে হইবে যে, সর্পই অস্তি; পরে রজ্জুদর্শনের সমকালে ও ভবিষ্যতে, সর্পরূপ ভ্রমটি, স্মৃতিরূপ ও অতীত কাল অবলম্বনে অস্তি; অতীতকালও অস্তি। আশ্চর্য্য দেখ! যাহা "অতীত" তাহা যখন চিন্তার বিষয় হইল তখনই তাহা বর্ত্তমান অস্তিরূপ হইল। তদ্বৎ "ভবিষ্যৎ" কাল, বন্ধ্যা পুত্র, ভবিষ্যৎ হইয়াও চিন্তাগোচর হওয়ামাত্র বর্ত্তমানও অস্তিরূপই। ইহা এক অঘটন ঘটনা ও লক্ষ্য করিবার যোগ্য।

জবা-সান্নিধ্যে স্ফটিকলৌহিত্য অস্তি, প্রতিবিম্ব অস্তি, দ্বিচন্দ্র অস্তি, মনোরাজ্য অস্তি, স্বপ্ন অতীতকালাশ্রয়ে স্মৃতিরূপে বর্ত্তমানে বুদ্ধির গোচর

অস্তি বটে। দিঙ্মোহ অস্তি। অন্ধকার অস্তি; ইহাকে চক্ষু বুজিয়া দেখিতে হয়, অথবা ইহাকে সূর্য্যোদয়ের বার ঘণ্টা পরে চক্ষু খুলিয়া ও ইদংরূপে দেখা যায়। সুষুপ্তি অস্তি, বীজরূপে অস্তি; বীজকে বৃক্ষের মত চক্ষু দ্বারা দেখা যায় না বটে। কিন্তু বিচারদৃষ্টিতে বীজকে, সুষুপ্তিকে দেখা যায়। যে চক্ষুর অগোচর বস্তু হইতে এই বৃক্ষ হইয়াছে তাহাই বীজ; তাহা অস্তিরূপ, তাহা অসৎ নহে। যে আমি সুষুপ্ত ছিলাম, সেই আমিই যে গ্রন্থরচনা করিতেছি, এই প্রত্যভিজ্ঞা দ্বারা সুষুপ্তি যে অতীতাবলম্বনে অস্তি তাহা বর্ত্তমানে স্বীকার করিতে বাধ্য আছি। যথা হংস ডিম্ব প্রসব করে, তথাই অশ্ব ডিম্ব প্রসব করে এরূপ কথা শুনিলে অনেক লোক নিঃসংশয়ে অশ্বডিম্ব অস্তি স্বীকার করে। পক্ষীর বা কচ্ছপীর দুগ্ধ এবং অশ্বডিম্ব কল্পনাগোচর এবং সুতরাং অস্তি। সমান অস্তিত্বের যথা ঘট দ্বিচন্দ্রাদি বিশেষাকার, তদ্বৎ কচ্ছপীর দুগ্ধ, অশ্বডিম্বও সমান সতের বিশেযাকার। তবেই পাওয়া গেল যে, সমান সৎটী অশ্বডিম্বেও অনুপ্রবিষ্ট।

এই যে "নিশ্চয় জানা" যে দ্বিচন্দ্র, প্রতিবিম্ব, দর্পণে দৃষ্টদেশ নাইই, অথচ সাক্ষাৎদৃষ্ট সদনুবর্ত্তিত অস্তিরূপ, ইহা অত্যন্ত বিস্ময়াবহ; নিশ্চয়ই জানা আছে যে দ্বিচন্দ্রাদি নাই। অথচ "না থাকা"র জ্ঞানকে পরাজয় করিয়া বলপূর্ব্বক দ্বিচন্দ্রাদি যে সমক্ষে দণ্ডায়মান থাকিতে পারে ইহা সমান সৎএর অঘটনঘটনপটুতা, মহিমা।

এক সমান সৎই ব্যবস্থিত নিত্য নিয়ত। ইহার সকল বিশেষাকারই বিশেষণই, উপাধিই, অব্যবস্থিত, অনবস্থিত, flux, অনিত্য, অনিয়ত। দেখ মহাবলবান্ কালকেও ছোট বড় করা যায়। দৃঢ়মনোনিবেশে শকুন্তলা দুষ্মন্ত-চিন্তায় দীর্ঘকালকে ছোট করিয়াছিলেন। স্বপ্নে দুঘণ্টাকে বহুবর্ষদীর্ঘ করা যায়। দেশকেও ছোট বড় ও নূতন করিয়া নির্ম্মাণ

করা যায়। সকলেই জানেন যে, স্বপ্নে ক্ষুদ্রগৃহে বহু-যোজন-বিস্তৃত অবকাশ তৈয়ার হয় এবং জাগ্রতে ও স্বপ্নে দর্পণের ভিতর নূতন দেশ সৃষ্টি করা হয়। কাল দেশ বলবান্ হইলেও আত্মার নিকট তুচ্ছ। তাহারা সৎকর্ত্তৃক দৃষ্ট সৃষ্ট; "কালদেশ অস্তি" এই হিসাবে কালাকার ও দেশাকার দুইটী, সমান সৎএর বিশেষাকার মাত্র, এবং সুষুপ্তিতে সমান সৎ প্রত্যাহার করিলে কালাকার দেশাকার দুইটী, অন্য যাবতীয় ঘট পটাদি বিশেষাকারের মতই অন্তর্হিত হয়। চন্দ্র সূর্য্যও "আমির" অধীন। অন্ধকার রাত্রিতে স্বপ্ন সৃষ্টি করিয়া, স্বপ্নে একটা নূতন সূর্য্যকে সৃষ্টি করিয়া লই। যখন সুষুপ্তিতে, দেশকাল বস্তু, চন্দ্রসূর্য্য, সবই আমি উপসংহৃত করিয়া লই, তখন তাহারা সকলেই নিজ নিজ বিশেষাকার ত্যাগ করিয়া সমান হইয়া, সমান সৎএ নিমজ্জিত অবগাহিত, লীন, বাধিত হইয়া যায়। তাঁহাদের দোষগুণ ত সমান সতের দোষাকার ও গুণাকার মাত্র, অন্যতম বিশেষাকার মাত্র। এই দুই বিশেষাকার ও অন্য যাবতীয় বিশেষাকার সুষুপ্তিতে ত্যক্ত হয় ও দোষগুণ সুষুপ্তিতে পহুঁছায় না; তত্র তত্র অনুগত সৎ, সমান সতে সমান হইয়া যায়। সহস্র বিরোধে অনুপ্রবিষ্ট সমান সৎ যে, বিরোধি দোষগুণে অসংশ্লিষ্ট তাহার এক চমৎকার পৌরাণিক চিত্র আছে। তাহা শিবজীর চিত্র।

এই ব্যবস্থিত সমান-সৎ-শিবজীকে কিছুতেই ছোট বড় বা অবয়ব নিরবয়ব বা বীজরূপ কোনও উপাধির ভিতর ধরিয়া, জমাট করিয়া, রাখা যায় না। ইহা নিরতিশয় স্বাধীন, স্বতন্ত্র; স্বেচ্ছায় অনায়াসে স্বপ্রচার ও প্রচার প্রত্যাহার করিতে সমর্থ ও নিত্য শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত।

ইনি অবয়ব নিরবয়ব, সাকার নিরাকার, দোষগুণ, বিষামৃত, কঠিন তরল, নরনারী, বধূ ননন্দা, সুখশোকাদি দ্বন্দ্বগুলির, তত্রতত্র অনুপ্রবেশ দ্বারা সত্ত্বাদাতা, সুতরাং তাহাদেরও পৌর্ব্বকালিক কেবলং শুদ্ধং অভয়ং

অকায়ং অব্রণং অস্নাবিরং অপাপপুণ্য-বিদ্ধং অসহায়, সহায় নিরপেক্ষ, স্বস্থ. ইনি স্বমহিম্নি প্রতিষ্ঠিত আছেন। পরে যেমনি তাহাতে দেখা গেল উষার মত ঈষদ্বিকশিতা, একটী সুন্দরী ইচ্ছাশক্তি, অর্দ্ধসমানরূপিনী অর্দ্ধবিশেষরূপিনী, কতকটা অভেদরূপিনী, শিব তখন আর "কেবল" নহেন; শিব তখন ঈশ্বর অর্দ্ধনারীশ্বর। নারী তখন অচঞ্চলা, শিব শরীরে দৃঢ়বদ্ধা, শিবানুগতা।

আরও পরে দেখা গেল যেন, দেবী শিবশরীর হইতে বিসৃষ্টা, চঞ্চলা, অপার যৌবনা; কিন্তু বিসৃষ্টা হইলে কি হয়, শিবানুগতাই; সদনুপ্রবিষ্টা, সতী। কোনও বস্তু সদনুপ্রবেশ অর্থাৎ শিবানুগতি অতিক্রম করিবে অথচ বিদ্যমান থাকিবে তাহা হয় না। উক্ত দেবী জগন্মাতা, মহামায়া, ঈশ্বরের ঐশ্বর্য্যরূপিনী, নিত্যষোড়শী, আদ্যাশক্তি; তিনি শিবানুগতা সুতরাং ভদ্রকালী, এবং শিবব্রতা বলিয়াই প্রিয়শিব সমক্ষে উদ্গতরোমাঞ্চা। সেই বিচিত্র রোমাঞ্চই ত নানাকার বিশিষ্ট বিচিত্র জগৎ এবং তাহা নিজ প্রেয়সীর রোমাঞ্চ বলিয়াই শিবসুখদাতা।

সেই নানাকারগুলি পরস্পর বাধক, বিরোধী। তাহারা কিন্তু সকলেই শিবানুগতি বশতঃ নিজ নিজ অন্যোন্য বিরোধ সত্ত্বেও, নিজ নিজ বিরোধ ত্যাগ করিয়াই. একযোগে তাহাদের অধিষ্ঠান শিবের সাধক, শিবের সমান সত্তার সাক্ষ্য দিবার জন্যই দণ্ডায়মান।

শিবের গলে সর্প, নিকটেই সর্পভুক ময়ুর; মস্তকে শীতল গঙ্গা, ললাটে প্রজ্বলিত বহ্নি; জীবন স্বরূপ সুশুভ্র রজত কান্তি, কণ্ঠে মরণ চিহ্ন-বিষনীলিমা। খাদ্য বলদ সহ খাদক সিংহ; বোকা লক্ষ্মী, সেয়ানী সরস্বতী; ধনপতি কুবের ভৃত্য অথচ দিগ্বসন; দগ্ধ মদন অথচ ঔরস পুত্র কার্ত্তিকেয়; অন্নপূর্ণা গৃহিনী, উপজীবিকা ভিক্ষা।

এবম্প্রকারে শিবাশ্রয়ে সহস্র বিরোধের অনির্ব্বচনীয় নির্ব্বিরোধে

সহাবস্থানই ত অঘটন ঘটনা। এই অঘটন ঘটনা শিবের কটাক্ষ মাত্রে হইয়াছে। এত বড় সাক্ষাৎ বিপুল ব্রহ্মাণ্ডটা পরমা শক্তির লীলা-বিলাস। ইহা রস-বিলাসই। যাহা সৎ শিব, তাহাই শক্তিচিৎ, তাহাই রস, আনন্দ, কল্যাণ। রস হইতে বিষ জন্ম লাভ করিতে পারে না। শিবরূপ আনন্দ হইতে শিব মহাশয়ের জন্য ভোগাপবর্গই উদ্গত হয়। শিবকল্যাণ হইতে শয়তানের জন্ম হয় নাই, হইতে পারে না বলিয়াই হয় নাই। দেখিতে ভয়ানক হইলেও চিনির বাঘ স্বরূপে মিষ্টই। মাতা, শিশুর সুখের জন্যই তাহাকে উর্দ্ধে পুনঃ পুনঃ নিক্ষেপ করিয়া পতনমুখে ত্রস্ত সন্তানকে হাস্যবদনে, সদয় হস্তে গ্রহণ করেন। শিশু শিশুত্ব অর্থাৎ অজ্ঞত্ব বশতঃই সেই সুখের ব্যাপারকে উল্লাসরূপ না বুঝিয়া শয়তানরূপ মনে করে। আইস আমরা বালকত্ব ত্যাগ করিয়া জগৎ বিসৃষ্টিকে, রসরূপ, উল্লাসরূপ বুঝিতে চেষ্টা করিব।

দেবী নিজে শিবানুগতা ; দেবীর বিচিত্র রোমাঞ্চরূপ জগৎ ও সুতরাং শিবানুগত ; জাগতিক বিরোধ গুলি, অন্যোন্য বিষতুল্য হইলেও, যথা: অগ্নি গঙ্গা, শিবাশ্রয়ে নির্ব্বিরোধে থাকিয়া মনোহর শিবময় জগতের শোভাবিবর্দ্ধন করিতেছে।

জগৎ প্রচারের পূর্ব্বে এবং জগৎ প্রচার সময়ে ও জগৎসংহারের পরে শিব সদাই নিরাবরণ উলঙ্গ। আমরা নিজের অল্পজ্ঞতা বশতঃ নিজ লজ্জা শিবে আরোপ করিয়া, একখানা বাঘছাল বা হস্তিচর্ম্ম দ্বারা শিবলিঙ্গ আচ্ছাদন করি ; কিন্তু স্বভাবনগ্ন শিব-শরীর হইতে বাঘছাল ও হস্তিচর্ম্ম আপনি খসিয়া পড়ে ; যথা স্বভাব-শুষ্ক পাথরকে জল ঢালিয়া আর্দ্র করা যায় না, জল পাথরে প্রবেশ করিতে না পারিয়া গড়াইয়া পড়িয়া যায়। যুগ যুগান্তর হইতে অসংখ্য নরনারী পিতামাতা কন্যা ভ্রাতা ভগ্নী এক যোগে জানত অজানত, ভারতে, ইজিপ্টে, ব্যাবিলনে সর্ব্বত্র উলঙ্গ

শিবের মৃন্ময় বা প্রস্তরময় মূর্ত্তিতে, আদিপুরুষের অথবা প্রকৃতিপুরুষের উপাসনা করিয়া আসিতেছে। জগতের নানা আকার শিবা-শ্রয়ে শিবাবস্থিত হইয়াও শিবকে আবরণ করিতে পারে নাই, স্পর্শই করিতে পারে নাই; যথা লৌহিত্য স্ফটিকাবস্থিত হইয়াও স্ফটিকে লব্ধপ্রবেশ হয় না, যথা জল কমল-পত্রের উপর মাধ্যাকর্ষণ সহায় হইয়া চাপিয়া বসিয়াও কমলকে স্পর্শই করিতে পারে না। একদিন শিবজী নেশা করিয়া বিশ্ব-রূপিণী সতীর, জড় অকিঞ্চিৎকর, উপাধি মাত্র স্বরূপ, মৃত দেহটাকে উপাদেয় সত্য মনে করিয়া, স্কন্ধে ধারণ করিয়া, দুঃখে নৃত্য করিলেন। তাঁহার অনুপাদেয়ে উপাদেয় বোধ হইল; অতস্মিন্ তদ্বুদ্ধি হইল। ঈশ্বর শিব, জীব হইলেন। শিবানুগত জগতের নানাকারের মধ্যে অন্যতমাকার সুদর্শন চক্র মহাশয় সেই সতীদেহ ছিন্ন ভিন্ন করিলে মুগ্ধশিব মুক্ত হইবেন। জীব"শিবোঽহং" বুঝিয়া লইয়া পরে শিব হইবেন। অন্যান্য যাবতীয় জীব ঈশ্বর-শিবাশ্রয়ে কিয়ৎকাল থাকিবে ও যথাসময়ে "কেবল"শিবে ডুবিয়া সমান হইবে। সুবিচারিত দর্শনেরই নাম সুদর্শন; সুদর্শনই জ্ঞান গুরু, আচার্য্য। একমাত্র সুদর্শনেই অতস্মিন্ তদ্বুদ্ধির বাধ হয়, অন্য দ্বিতীয় উপায় নাই।

সাক্ষাৎ দৃষ্ট সর্পের, নিপুণতর দর্শনে, অর্থাৎ সুদর্শনে, সর্পত্ব বাধিত ও রজ্জুত্ব দৃষ্ট হয়। গুঞ্জাফলরাশিতে অগ্নিবোধটা বাধিত হয়, যখন বিচার সুদর্শনে ধরা পড়ে যে, তাহা অগ্নি নহে; যেহেতু অগ্নি হইলে তাপ পাওয়া যাইত।

একজন Sign Board লিখিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিত। সে আপনাকে প্রচার করিবার জন্য Sign Board লিখিল যে "এই বাটীতে Sign Board লেখককে পাওয়া যায়" এবং সেই Sign Board সে নিজ গৃহদ্বারে লটকাইয়া দিল।

খোদা তদ্বৎ জগৎরূপ Sign Board নিজে লিখিয়া তাহার দ্বারা আপনাকে প্রচার করিয়া রাখিয়াছেন। জগৎরূপ Sign Boardএ লেখা আছে যে "এই জগতে অনুপ্রবিষ্ট আমি আছি; "যাহার "আমিকে" প্রয়োজন হইবে সে এই জগতে অনুসন্ধান করিলেই "আমিকে" পাইবে।"

ঈশ্বরের নাম খোদা। গুজরং খোদ ইত্যাদি বাক্য প্রয়োগে বুঝা যায় যে খোদা শব্দের ধাতু ঘটিত অর্থ "Self" "আত্মা" "আমি।" অনন্তর চিদানন্দের যথাসাধ্য প্রসঙ্গ করিব।

চিদানন্দ ব্যাপ্তি।

(৪)

অভয়ের মঙ্গলগীতি কল্যাণ রাগিনীতে গেয় ; গায়কের দোষে শুদ্ধ-কল্যাণ জঙ্গলা হইয়া পড়ে। মন্দের ভাল হয় যদি, মেঘ, মারোয়া ভৈরবাদি ঘোর দোষ না ঘটিয়া, কিছু ললিত বসন্ত বা বাহার স্পর্শরূপ লঘুদোষ, গীতিটীকে চলনসহি করিয়া রাখিতে পারে। দেখা যাউক।

পূর্ব্ব প্রস্তাবে যে জগৎ সৃষ্টি আমরা মঞ্জুর করিয়া লইয়াছি, তাহার প্রত্যেক অংশে সদন্বয় দেখিয়াছি। অদ্বিতীয় অসহায়, সহায়নিরপেক্ষ, স্বয়ংসমর্থ, সদাত্মা নিমিত্তোপাদান হইয়া, স্বপ্রচার করিয়া, সাক্ষ্য প্রস্তুত করিয়া, নিজে সাক্ষী হইয়াছেন। ইন্দ্রিয়গোচরই হউক বা কল্পনাগোচরই হউক, ঘট পট, সুখ শোক, প্রতিবিম্ব, ছায়া, দেশ, রজ্জুসর্প, মনোরাজ্য, দ্বিচন্দ্র, দিঙ্মোহ ; অশ্বডিম্ব, অতীতাদি কাল, **4th Dimension** প্রত্যেক বস্তুই, যখনই গোচর হয়, তখন "অস্তি"রূপেই গোচর হয়। সকল বস্তু গুলিতেই সৎ অনুপ্রবিষ্ট হইয়া আছে। সমান সৎটী যেন বস্তুগুলিকে সত্তা কর্জ্জ দিয়াছে ও বস্তুগুলি কর্জ্জ করা স্বত্বে স্বত্ববান হইয়া দণ্ডায়মান। সমান সৎ মহাজন যদ্যপি নিজ সত্তা ফিরাইয়া লয়, নিজানুপ্রবেশটী রহিত করিয়া দেয়, তবে বস্তুগুলি অগত্যা নিঃসত্ত্ব হইয়া নস্যাৎ হইবে। সুষুপ্তি মরণ মূর্চ্ছা সমাধিতে ঘটেও তাহাই।

ধনবানের বাটীতে ক্রিয়াকর্ম্মের দিবস চাকর নফরেরা তৎ-কালের জন্য 'মূল্যবান্' অলংকারাদি মনিবের নিকট পাইয়া, মনিবের

মানমর্য্যাদা প্রচার করিবার জন্য, সুসজ্জিত হইয়া গর্ব্বভরে, বিচরণ করে। পরদিবস অলংকারগুলি মনিবের তোষাখানায় জিম্মা করিয়া দেয়।

সমান সৎ যেন প্রভু, দৃশ্য বস্তুগুলি যেন ভৃত্য। ভৃত্যগুলি প্রভুর জগদুৎসবের সময় যেন প্রভুর নিকট হইতে যাচঞা-প্রাপ্ত, প্রভুদত্ত রঙ্গীন কাপড়, রূপাবাঁধা লাঠি, জরী বাঁধা পাগড়ীর মত, "সত্তা" পাইয়াছে। প্রভুর জগদুৎসবান্তে প্রভুর বস্ত প্রভুকে ভৃত্যগণ প্রত্যর্পণ করিবে, "সত্তা"শূন্য হইবে, "নিঃসত্ত্ব" হইবে। এই চমৎকার দৃষ্টান্তের নাম 'যাচিতমণ্ডন'।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, মানুষ অগ্রে মুখংব্যাদায় পরে নিদ্রিত হয় না; তাহার মুখব্যাদান ও নিদ্রা যুগপৎ ঘটে। মাটী যথা, ঘট তৈয়ারের পরে, ঘটে অনুপ্রবেশ করে না, ঘট তৈয়ার সমকালেই ঘটে মাটীর অনুগতি হয়; তদ্বৎ সমান সৎ নিজে নিমিত্তোপাদান হইয়া জগৎ সৃষ্টি করিবার সমকালেই, যুগপৎ তত্র অনুপ্রবিষ্ট হয়েন। গীতোক্ত "মমযোনি র্মহদ্ব্রহ্ম তস্মিন্ গর্ভং দধাম্যহং" বা পুরাণোক্ত কশ্যপের আদিদ্বন্দ্ব দিতি অদিতিতে গর্ভাধান দ্বারা প্রজাসৃষ্টি পদ্ধতি যে পূর্ব্বোত্তর কাল বুঝায়, তাহা একটা "ইব" মাত্র; লিখিবার ও তত্ত্ব বুঝাইবার ভঙ্গীমাত্র; মহৎযোনিকেও এবং দিতি অদিতিকেও সমান সৎই তাহাদের সৃষ্টিকালে তত্র যুগপৎ অনুপ্রবিষ্ট থাকিয়া নিজ সত্তাদান করিয়াই, তাহাদিগকে সত্তাবান্ করিয়াছেন।

মন্দির গাঁথিয়া পরে তত্র মানুষের প্রবেশরূপ লৌকিক দৃষ্টান্তটী আচার্য্য কনিষ্ঠাধিকারীর জন্য, কপিলাদিরূপ ধারণ করিয়া, উপদেশ করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে বৈদান্তিক সমান-অদ্বয় চেতন সৎএর "প্রতিদ্বন্দ্বী," দ্বৈতরূপিনী জড়প্রকৃতি আছেই। ভক্তিমতে প্রকৃতিও চেতন; পুরুষ যেমন চেতন, প্রকৃতি তেমনই চেতন; সেই যথাপ্রাপ্ত

উপাদানে, সমান চেতন সৎ মহাশয় নিমিত্ত হইয়া মৃত জড় দেহমন্দির নির্ম্মাণ করিলেন ও পরে তন্মধ্যে জীবরূপে সঞ্চার অর্থাৎ প্রবেশ করিয়া সহসা দেহ সমেৎ দাঁড়াইয়া উঠিয়া চলা ফেরা করিতে লাগিলেন, ক্ষুধিত হইয়া মিঠায়ের দোকানে বা শ্বশুরবাড়ী উপস্থিত হইলেন, আপনাকে "আমি" নামে বুঝিতে ও জাহির করিতে লাগিলেন। কথাটা ঠিক নহে; জড়া প্রকৃতির থাকাটাই, অস্তিত্বটাই, যে সমান সৎএর অনুগ্রহ, নিজস্ব। প্রকৃতি তত্ত্বতঃ ছিল না! সমান সৎ সেচ্ছায় নিজসত্তাকে, অসমান আকারে, অব্যক্ত বা ঈষদ্ব্যক্ত বিশেষাকারে, প্রকৃতিরূপে, নিজসমক্ষে খাড়া করিয়াছেন বলিয়াই প্রকৃতি আছে। তাহার পরে সেই মহৎযোনি প্রকৃতিতে গর্ভাধানই বল, আর যাহাই বল, হইয়াছে। বেদান্তের গূঢ় হইলেও, সুস্পষ্ট অভিপ্রায় এই যে, সৃষ্টি প্রক্রিয়ার বিবরণে পূর্ব্বোত্তর কালের উল্লেখটী, সৃষ্টি বা কাল প্রতিপাদন জন্য নহে; সমগ্রবিবরণগ্রন্থের তাৎপর্য্য স্রষ্টার স্বরূপ সমর্পণেই বুঝিতে হইবে।

বিষ অস্তি, দুগ্ধ অস্তি, কিন্তু সৎটী বিষে থাকিয়া বিষাক্ত হয় না, দুগ্ধে থাকিয়া হৃষ্ট পুষ্ট হয় না, এবং সৎটী সুষুপ্তিতে কূর্ম্মাঙ্গসঙ্গোপনবৎ সমানাকার হইয়া যায়। এই যে, অতি সহজে, অনায়াসে, অবহেলায় বিষামৃতের মত নানা বিরুদ্ধাকারে, জাগর স্বপ্নে, আত্মার স্বপ্রচার ও সুষুপ্তিতে প্রচার-প্রত্যাহার ইহা আত্মার অতি বড় মহিমা। এই মহিমার গীতিটী কল্যাণ গীতিই বটে, যেহেতু প্রচারকালেও প্রতিসংহারে আত্মা সদাশুদ্ধ থাকে। শুদ্ধ থাকাটা যে কল্যাণ তাহাতে সন্দেহ নাই। সাহসী বৈদান্তিক এতটা মহিমাতে, এত বড় কল্যাণেও অতৃপ্ত। তিনি সাহস করিয়া বলেন যে কল্যাণেরও কল্যাণ আছে। এবং তাহাই "নিরতিশয়" কল্যাণ। "এতাবানস্য মহিমা ততো জ্যায়াংশ্চ

পূরুষঃ" ; কৃৎস্ন জগদ্রূপে সহজে স্বপ্রচার ও সহজে স্বপ্রচার-সমাকর্ষণটা মহিমা মাত্র; ইহা যাহার মহিমা সেই পুরুষ নিজ মহিমা অপেক্ষা গরীয়ান্। তিনি প্রচার ও প্রচার-রাহিত্য করিলেও পারেন বটে, কিন্তু অনাবশ্যক অযোগ্য ও "অসম্ভব" বলিয়া করেন না, করেন নাই। সেই পুরুষটী নিজ মহিমারূপ স্বপ্নজাগর-সুপ্তিত্রয়েরও অধিক। সেই চতুর্থ অর্থাৎ পারিভাষিক অদ্বয় তুরীয়টীতে সৃষ্টি বীজরূপাদি দ্বৈত কিছু প্রচ্ছন্ন ভাবেও নাই। তৎসম্বন্ধে সৃষ্টি কথাটীকে ভবিষ্যৎ আরোপ মাত্র বলিয়া প্রকারান্তরে নিষেধ অর্থাৎ পারিভাষিক অপবাদ করাটী যেন মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা। সৃষ্টি যে কেবল "ভবিষ্যৎ" তাহা নহে, ইহা অধিকন্তু অসম্ভব, বিধবার ভালে সিন্দুরবৎ, অসম্ভব ভবিষ্যৎ।

অবশ্য আমরা এই "নিরতিশয়" কল্যাণ কথাতে ভয়ভীত হই; ভয়ের কারণটী আমাদের পরম শত্রু পূর্ব্বাভ্যাস। সকলেই জানেন যে, আমাদের সঙ্গলিপ্সা দৃঢ়াভ্যস্ত; আমরা ঠিক জানি যে, পোড়ো বাটীর ভিতরে বা জনহীন প্রান্তরে জনমানব বা কোনও অন্য ভয় হেতু দ্বিতীয় বস্তুমাত্র নাই; তথাপি তত্র যাইতে আমাদের দারুণ শঙ্কা হয়। উক্ত "নিরতিশয়" কল্যাণ সেইরূপ জনহীন, অত্যন্ত অদ্বয় সুতরাং নির্ভয়, অথচ যেন বড়ই ভয়ঙ্কর সভয়। তাহাই বুঝি শ্রীমদ্ ত্রিবেদী রামেন্দ্রসুন্দর মুক্তিকে অল্প কিঞ্চিৎ আবরণের ভিতরে রাখিয়াছেন। আমরা কিন্তু অত্র না হউক, প্রবন্ধের উপসংহারে তাঁহার মুক্তি-সুন্দরীকে, অবগুণ্ঠন সম্যক মোচন করিয়া দেখিব, দেখাইব।

আমরা আপাততঃ কিঞ্চিৎ পশ্চাৎপদ হইয়া আমাদের স্বীকৃত সৃষ্টিরই চর্চ্চা করিব; সৃষ্টি যে হয়ই নাই, এরূপ কথা স্থগিত রাখিব। কল্যাণ কথাই আলোচনা করিব; "নিরতিশয়" কল্যাণের প্রসঙ্গই করিব না।

জগতের প্রতি অংশে সদন্বয় দেখিয়াছি। এক্ষণে চিদন্বয় দেখিতে হইবে। যখনই কিছু "আছে" এরূপ বুঝিয়াছি, তখনই ত বুঝিয়াছি বলিয়াই চিৎ পরিচয় পাইয়াছি। এবং আমিই বুঝিয়াছি বলিয়া "আমি"কেও সর্ব্বত্র পাইয়াছি। কোনস্থলে সৎ চিৎ ও আত্মা এই তিনের কোনও একটীর অভাব পাওয়া যায় নাই, পরন্তু তিনেরই সদ্ভাব পাওয়া গিয়াছে।

কিন্তু মন্দভাগ্য আমরা বাল্যকাল হইতেই শিক্ষা পাইয়াছি যে জাগতিক বস্তু দুই প্রকার,—এক চেতন, অপর অচেতন। বিশেষ যত্ন করিয়া উক্ত শিক্ষার মূলোচ্ছেদ করিতে হইবে। বেদান্তে জড় শব্দে অচেতন বুঝায় না; দৃশ্যমাত্র বুঝায়; শ্যাম পর্ব্বত সঙ্গীত সুখাদি বুঝায়। অচেতন কিছুই নাই, থাকিতে পারে না; যাহা কিছু আছে তাহা চেতন সতের স্বপ্রচার, চেতন সতের সমসত্ত্বাক, সুতরাং চেতন। সকল বস্তুতেই চিদনুপ্রবেশ অব্যভিচারী যথা সদনুপ্রবেশ অব্যভিচারী। সৎ যেমন, অসৎ কিছু না থাকায়, অদ্বন্দ্বিত, তথা চিৎ ও অচিৎ কিছু না থাকায় অদ্বন্দ্বিত absolute। একই দেশে দুই রাজা হয় না। সমান সৎ একটী absolute এবং সমান চেতন পৃথক অপর একটী absolute এরূপ হয় না; হইলে প্রত্যেকে অপরের প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া absolute হওয়ার ব্যাঘাত করিবে। সুতরাং বুঝিতে হইবে যে একই অদ্বয় অদ্বন্দ্বিত absolute বস্তুর দুইটী পৃথক নাম মাত্র সৎ ও চিৎ।

সর্ব্বত্র সদনুগতি অপেক্ষা চিদনুগতি দেখিতে পাওয়া কিঞ্চিৎ কঠিন। স্থল বিশেষে ভ্রমে বোধ হইবে যে অত্র ত চিৎপ্রবেশ নাই। কিন্তু সুবিচারে চিৎ ধরা পড়িবেই।

দেখ, বাঙ্গালী বিহার দেশীয় লোকের সহিত কথালাপ করে; তজ্জন্য

উভয়ের বোধগম্য একটা ভাষা আছে ; বিহারী কাশীবাসীর সহ সেইরূপ উভয়ের পরস্পর পরিচিত ভাষাতে কথা কাহিনী কহে। বাঙ্গালা ভাষাই রূপান্তরিত হইয়া কাশীর ভাষা পঞ্জাবীর ভাষা ও কাবুলির ভাষায় মুখে মুখে পরিবর্ত্তিত হয়। ইতিমধ্যে বাঙ্গালা ভাষা বিহার কাশী পঞ্জাবের ভিতর দিয়া এতটা পবিবর্ত্তিত হইয়াছে যে পাশনীতে আর বাঙ্গালাকে চেনা যায় না। বিচারবৃদ্ধ শব্দ-বিজ্ঞান-বি~ কিন্তু বাঙ্গালাকে সুদূর কাবুলেও চিনিয়া লয়।

ঋষি নামক দ্রষ্টাগণ কূর্ম্মবরাহেও, ভগবানকে সুস্পষ্ট সাক্ষাৎ-দেখিয়া থাকেন। তৃণ গাভীপ্রবিষ্ট হইয়া দুগ্ধ; দুগ্ধ বালকগত হইয়া তত্র মধুর হাস্য; সেই হাস্য জননীর নয়ন পথগামী হইয়া মাতার উল্লাসরূপে ক্রমে পরিণাম প্রাপ্ত হয়। বিবেচক ব্যক্তি উল্লাসের আদিম উপাদান তৃণকে উল্লাসে বুঝিয়া লয়।

ডিম্ব হইতে কীট, কীট হইতে প্রজাপতি হয়। বিনা বিচার, সহজ দৃষ্টিতে ডিম্বকে প্রজাপতিতে ধরা যায় না, অথচ উভয় বস্তুই এক।

জল বরফে কঠিন হয়, ইক্ষুতে মধুর, নিম্বে তিক্ত হয়, বৈজ্ঞানিক সর্ব্বত্রই উদাসীন স্বভাব-তরল জলকে দর্শন করে।

মিশ্রি নির্ম্মিত বৃশ্চিক পাইলে চক্ষুদ্বারা না হউক, রসনা দ্বারা বৃশ্চিক ও বৃশ্চিকাংশ বিষে মিশ্রির পরিচয় পাওয়া যায়।

আইস, আমরা যাহাকে অচিৎ, জড় বলিয়া বুঝি তাহাতে নিপুণ দর্শণে চিৎকে বুঝিয়া লইব। দেখিতে হইবে যে বস্তুমাত্রেই, অস্তিত্বের মত চিৎ ও অব্যভিচারী। আমরা যত্ন করিয়াও চিৎএর অভাব ঘটাইতে পারি না।

জীবন্ত দেহে চিদ্ব্যাপ্তি আছে ; তত্র অগ্নিযোগে জ্বালা, শীতল স্পর্শে রোমাঞ্চ, তীব্রালোকে চক্ষুপীড়াদি চিদ্ব্যাপ্তির লক্ষণ। দেহ বর্দ্ধমান ;

বৃদ্ধিশীলতাও চিদ্ব্যাপ্তির লক্ষণ। বর্দ্ধমান দেহে নখলোম বর্দ্ধমান এবং বর্দ্ধমান বলিয়াই নখলোম ও চিৎযুক্ত। কিন্তু আশ্চর্য্য এই যে, নখলোমের স্থলবিশেষে অস্ত্রাঘাত করিলে বেদনা অনুভূত হয়, স্থলবিশেষে হয় না। তবে কি একই নখলোম স্থলবিশেষে চিৎ ও স্থলবিশেষে অচিৎ? বোধ হয় যেন বেদনা লক্ষণে লক্ষিত চিৎ হঠাৎ লুপ্ত হইয়াছে। কিন্তু ইহাও মনে রাখিতে হইবে যে, বৃদ্ধিশীলতাও উত্তম চিৎ চিহ্ন। যদ্যপি বেদনালক্ষণ গুপ্ত হয় হউক, তথাপি বৃদ্ধ-শীলতা লক্ষণেই সমগ্র নখলোমে বরাবর চেতনা স্বীকার করিতে হইবে।

জাগর হইতে হঠাৎ স্বপ্নপ্রয়াণ সময়ের অত্যদ্ভুত অন্তরাল অবস্থাতে চেতনাত্মাকে ধরা যায় না, কিন্তু অন্তরাল অবস্থাতে চেতন আমি ত বর্ত্তমানই, সন্দেহ নাই।

স্থূল দৃষ্টিতে গোময়কে অচিৎ বুঝিলেও তত্র বৃশ্চিকাদির উৎপত্তি দেখিয়া নিহিত চিৎকে বুঝিতে হয়।

গুড় ধান্য অচেতন বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু তাহারা সন্নিধাপিত হইয়া গুপ্ত চেতনাকে মদ শক্তিরূপে ব্যক্ত করে।

বর্দ্ধমান বৃক্ষ, বর্দ্ধমানতা চিহ্নেই, চিৎচিহ্নিত। অধিকন্তু বুদ্ধিমত্তা চিহ্নেও বৃক্ষ সচেতন বলিয়া প্রতিপাদিত হয়। বৃক্ষকে নিম্নমুখে বক্রবদ্ধ করিলেও বুদ্ধিমান বৃক্ষ নিজ কল্যাণের জন্য আলোকের দিকে উর্দ্ধমুখে আপনাকে প্রসারিত করে।

নিকটে যদি কেহ দণ্ড প্রোথিত করে, তবে বুদ্ধিমতী লতা, দূরস্থ দণ্ডাবলম্বন-চেষ্টা ত্যাগ করিয়া, পূর্ব্ব গতি ত্যাগ পূর্ব্বক নিকটদণ্ডাভিমুখিনী হয়।

অগ্নি প্রজ্বলিত হইলে তত্রধাবিত বায়ু দর্শনে, অগ্নিসহ পবনের সচেতন বন্ধুতার পরিচয় পাওয়া যায়।

সুদূর দেশ হইতে নদীর সমুদ্র উদ্দেশ্যে দ্রুত গতি লক্ষ্য করিলে নদীর সোৎকণ্ঠ সচেতন সমুদ্রপ্রীতি দেখিতে পাই।

কুমুদিনী নিজ স্বামী চন্দ্র সমীপে মুক্তাবগুণ্ঠিতা। কিন্তু স্বামীর স্বামী রবিঠাকুরকে দেখিয়া সচেতন লজ্জালংকৃতা কুলবধূর মত আত্মগোপন-পরায়ণা। প্রস্ফুটিতা, যৌবনমদগর্ব্বিতা, সূর্য্যমুখী, নির্লজ্জ স্বাধীন ভর্তৃকার মত, ঘুরিয়া ফিরিয়া অনবরত সূর্য্যাভিমুখে অবস্থান করে।

স্নিগ্ধ সুন্দর, নবোঢ়ার মত লজ্জাবতী সচেতন লজ্জা প্রসিদ্ধ বস্তু। প্রৌঢ়া পৃথিবীটীও কম পাত্র নহেন। কি জানি কোন্ প্রিয়জনকে স্মরণ করিয়া 'অদ্যাপি কাঁপিয়া উঠে থাকিয়া থাকিয়া'।

কঠিন পাষাণেও চিৎ আছে; পাষাণ হইতে অপূর্ব্ব সুন্দরী অহল্যা ও স্ফটিক স্তম্ভ হইতে মহারাজ নরসিংহ আপনাদিগকে ব্যক্ত করিয়াছিলেন; এবং এখনও পটে পাষাণে অঙ্কিত নরনারীর, দেব দেবীর, নীরবমুখর মূর্ত্তি আমাদের সহ যেন কথা কহিয়াই নানা বিচিত্রভাব জাগাইয়া, পাগল করিয়া তুলে। বঙ্গদেবতা জগদীশচন্দ্রও তড়িৎ সাহায্যে ধাতু পাষাণে চেতনার সন্ধান পাইয়াছেন।

নানা বিরুদ্ধ সিদ্ধান্তেও অবিরুদ্ধ চিৎকে পাওয়া যায়; যথা সৎকে বিষেও পাওয়া যায় এবং বিরুদ্ধ দুগ্ধেও পাওয়া যায়। রাজা পথে ঘাটে, নিশীথের সময়, নিয়মিত আলোকের বন্দোবস্ত করিলে একজন বলিল যে, হইল ভাল; পলায়মান চোরকে দেখিতে পাওয়া যাইবে ও ধরিবার সুবিধা হইবে। অপর ব্যক্তি কেহ বলিল যে, ভাল হইল না; চোর আলোকে পথঘাট দেখিতে পাইয়া স্বচ্ছন্দে পলাইবে, স্খলিতপদ হইবে না ও ধরাও পড়িবে না। সিদ্ধান্ত দুইটী উল্টা, কিন্তু বক্তা দুইজনই সচেতন।

কাহারও মতে দুষ্টের কারাদণ্ড হওয়া উচিত। কেহ বা বলে যে, তাহা ন্যায় সঙ্গত নহে; দুষ্টের কারাদণ্ড হইলে তাহার

নিরপরাধ পুত্র পরিজন, রক্ষকশূন্য হইয়া, বিনা আহারে কষ্ট পাইবে। নিরপরাধেরই দণ্ড বিধান করা হইবে। উভয় উকীলই সচেতন; এক চেতন, অপর জড় এরূপ নহে।

সচেতন গৃহস্থ বলে যে গ্রামই বসতি ও শ্মশান উজাড়। সচেতন সন্ন্যাসী বলে যে, গ্রামেই লোক মরে ও শ্মশানে রাশীকৃত হয়, সুতরাং গ্রামই উজাড় এবং মরঘাটই বস্তি।

উক্তরূপে সর্ব্বত্রই চিৎ দেখিয়া লইবে। অচিৎ কুত্রাপি নাই। যেখানেই জড় বুদ্ধি হইবে সেইখানেই দেখিবে যে, চিৎ আছেই, প্রকট না হউক, গুপ্ত নিহিত, নিদ্রিত। জগতে কোনও অংশই অসৎ, অচিৎ, নীরস, অনাত্মবান্ নহে।

অশক্য-নিষেধ আত্মারও, "আমি"রও অনুপ্রবেশ বুঝিয়া লও। আত্মা অপরাজিত, নিত্য উদিত, অনস্তমিত। প্রত্যেক বস্তু—গ্রহণ সময়ে, প্রত্যেক বস্তুর বোধ সময়ে, তাহা "আমি"রই বোধ। এই "আমি"টাকে ছাড়িয়া কোনও রূপে কোন বস্তু গ্রহণ বা বোধ হইবার উপায় নাই! পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে সৎ চিৎ ও "আমি" ইহারা তিন ভিন্ন বস্তু নহে; ইহারা একই বস্তুর তিন ভিন্ন নাম। এই তিনটিকে একযোগেই পাওয়া যায়, নিত্য মিলিত ইহারা, ইহাদের পরস্পর বিরহ নাই। যে কোনও বস্তু প্রসঙ্গাগত হইবে তত্র দেখা যাইবে যে সেই বস্তুর নিমিত্তোপাদান একই বস্তু, আত্মাই বল, আর চিৎই বল, আর সৎই বল।

শিশুতে আমি, বৃদ্ধেও আমি, স্বপ্নেও সেই এক আমি, জাগরে "বিকল"-খঞ্জ নরদেহেও আমি, স্বপ্নের "সকল" সুন্দর যুবতী দেহেও আমি, পর্ব্বতে আমি, সুষুপ্তির বিদেহেও আমি, তোমাতে আমি, তাহাতেও আমি, ভ্রান্তও আমি, ভ্রমেও আমি, যে দুঃখ আমাকে

সুখান্বেষণে উত্তেজিত করিয়া অন্তর্য্যামী গুরুরূপ, সেই দুঃখেও আমি। জন্ম জন্মান্তরে ও অমর আমিই; একই জন্মে "মত" পরিবর্ত্তিত হইয়া কত-বার জন্মান্তর হয়; একটাকে অপরটাতে চেনা যায় না; যথা সরীসৃপ কীট হইতে খেচর প্রজাপতি তথাই শৈশব হইতে যৌবন একটা নব-জীবন; পরন্তু সকল জন্মগুলিতে মনিগণের ভিতরে সূত্রের মত আমিটা একই। যে আমি জল দেখি, সেই আমিই জল আস্বাদ করি, সেই আমিই জলের শীতলতা স্পর্শ করি; সর্ব্বত্রই এক আমিরই প্রত্যভিজ্ঞা। মদ্বিলাসরূ পজগৎটাকে আমিই সুষুপ্তি হইতে "বিসর্জ্জন করিয়া" আমিই সত্তা কর্জ্জ দিয়া খাড়া করিয়াছি। আমিই মহাজন, জগৎ—খাতক; যে দাঁড়াইয়া আছে, সে যেন "আমি"র নিকট কর্জ্জ করা টাকার বলেই দাঁড়াইয়া আছে, টাকা আদায় লইলে জগৎ না:তোয়ান, নিঃসত্ত্ব হইয়া যাইবে।

আমি মরিব, আমার স্ত্রী পুত্রাদি পরিজন ভবিষ্যতে বাঁচিয়া থাকিবে, এরূপ বলিবার জন্য বক্তা আমিই এবং আমির স্বপ্নভঙ্গ হইবে, আমার স্বপ্নগত স্ত্রী পুত্রাদি পরিজন প্রতিবেশী কেহই ভবিষ্যতে থাকিবে না, সকলেই আমিতে মিশিয়া যাইবে, সকলেই আমির সহ একযোগে স্বপ্নবন্ধন হইতে মুক্ত হইবে, এরূপ বলিবার জন্যও বক্তা "সেই" এক অদ্বিতীয় অমর আমিই।

প্রসঙ্গাগত একটা কথা বলিবার বড় লোভ হইতেছে। তাহা এই যে, ব্যাকরণ শাস্ত্রটী গুপ্তবেদান্ত, আত্মপ্রতিপাদক। অহং শব্দটী ব্যাকরণে সর্ব্বনাম; সকল নাম, নদীর মত, অহং সমুদ্রে প্রবেশ করে, যদু, রাম, শ্যাম যাহাকেই জিজ্ঞাসা কর কে তুমি? প্রত্যুত্তরে সেই বলিবে যে "আমি"। ব্যাকরণ আরও বলে দেখ "শ্রেষ্ঠ" পুরুষটীর নাম "উত্তম" পুরুষ, অহং। ব্যাকরণে বিসর্গকে (বিসর্গ অর্থে বেদান্তে

সৃষ্টি বুঝায়) আশ্রয়-স্থান-ভাগী বলা হয়; তাহাই ত বটে। জগৎ বিসর্জ্জনটী অর্থাৎ দূর নিক্ষেপটী "ইব" মাত্র; বিসৃষ্ট জগৎটী আমির দূরস্থ নহে, ইহা মদাশ্রয়ভাগী, সৎপ্রতিষ্ঠ, চিৎ-বনিষ্ঠ রসতরঙ্গ।

জগতের নিমিত্তোপাদান সৎ হওয়ায় ও সৎ, চিৎ, আত্মা, আনন্দ একই বস্তুর চারিটী ভিন্ন নাম হওয়ায়, প্রত্যেক বস্তুতেই আনন্দকেও অব্যভিচারী পাওয়া চাই। দেখাইতে হইবে যে কুত্রাপি আনন্দের ব্যভিচার বা অভাব নাই, জগৎটা সর্ব্বতোভদ্র, কোনও অংশে অভদ্র নহে। দুঃখ-শয়তান বলিয়া কোনও কিছুর বোধ হইলে সূক্ষ্মবিচারে দেখিয়া লইতে হইবে যে তাহা ভ্রম মাত্র। দুঃখ-শয়তান রসেরই বিশিষ্ট জমাট আকার, মিশ্রির বাঘের মত চক্ষু প্রমাণে ব্যাঘ্র দেখিয়া ভয় হইলে চলিবে না, অন্য প্রমাণ প্রয়োগে তাহার রসতরঙ্গের পরিচয় পাইতে হইবে; বিচার লেহনে তাহার মধুরত্ব অনুভব করিতে হইবে।

জগতে সৎ চিৎ আত্মার প্রবেশ যত সহজে বুঝিতে পারা যায় তত সহজে রসব্যাপ্তি বুঝা যায় না। সুতরাং শয়তান-সম্বন্ধে নানা-ব্যক্তির নানা মত শিশু জিজ্ঞাসুর কোমল মতিকে ব্যাকুল করিয়া রাখিয়াছে। "অনন্যসহায়, এক অদ্বিতীয়, রস বস্তুই যে নিজে নিমিত্তোপা-দান হইয়া এ জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন এবং সুতরাং সমগ্র জগৎটাই যে রসময়," সৃষ্টির এই মৌলিক রহস্য লক্ষ্য না করিয়াই হতভাগা পূর্ব্ব বৃদ্ধগণ ও তদুপদিষ্ট হতভাগ্য আমরা দুঃখকে, সত্য বাস্তবিক "দুঃখরূপ" মানিয়া তদুচ্ছেদের জন্য বিস্তর কিন্তু নিষ্ফল প্রয়াস করিতেছি। কেহ বা যেন তেন প্রকারেণ স্রক্ চন্দন বনিতা সংগ্রহে উদ্যম করিতে বলেন; কেহ বা স্বর্গাদি প্রলোভনে দুঃখভোগকালেও নীতিপ্রতিপালন উপদেশ করেন. কেহ বা প্রাণায়াম দ্বারা মস্তিষ্ক মধ্যে সংজাত CO_2 বা খরিদা অহিফেন সাহায্যে দীর্ঘ নিদ্রানয়ন করিয়া দুঃখ হইতে দূরে

থাকিতে পরামর্শ দেন। বুদ্ধ বুঝিয়াছিলেন যে, দুঃখ হইতে চিরকালের জন্য দূরে থাকা অসম্ভব; দীর্ঘ সমাধির ও ব্যুত্থান আছে। তাহাই তিনি দুঃখ-বধের কোনও কৌশল আবিষ্কার করিতে অসমর্থ হইয়া দুঃখের ভোক্তা আমাকেই বধ করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন। কিন্তু মৃত্যুঞ্জয় অমর আমি মরে নাই।

ঘোর অন্ধকারে সুপ্রভাতের মত, ভূতভয়-ভীতের পক্ষে শ্রীরামের মত দুইটী পরমদয়াল অনাথবন্ধু, শয়তান যে শয়তানই নহে, পরন্তু পরম সুন্দর এই সুমঙ্গল ঘোষণা করেন। তাহাদের মধ্যে একজন বৈদান্তিক ও আর একজন প্রীতি মন্ত্রের উপাসক ভক্ত। বৈদান্তিক ও ভক্ত উভয়েই বলেন যে, দুঃখকে তাড়াইতে হইবে না, বধ করিতে হইবে না। দুঃখসর্প যে নাই-ই এবং সুখ রজ্জুই যে আছে তাহাই বুঝিতে হইবে। রাক্ষসকে খড়ের ও দুরন্ত রাবণকে অভিনয়ের ও বিরহ জ্বালাকে পরম উপাদেয় বলিয়া অপরোক্ষ করিতে হইবে। প্রথমতঃ বিচার-দৃষ্টিতে উত্তম পরোক্ষ করা চাই যে যাহাকে দুঃখ ভাবিতেছিলাম তাহা ত দুঃখ নহে, তাহা আনন্দই বটে। দেখিতে ভয়ঙ্কর হইলেও ছুরিকা ভয়ঙ্কর ত নহে, বিচার লেহনে দেখিতেছি যে ইহা মধুর মিস্রি, ইহা মিস্রির ছুরী। তেঁতুল ত নিন্দ্য টক্ নহে; ইহার আস্বাদ দূরে থাকুক, ইহার স্মরণেই যখন রসনা রসাল হয় তখন ইহা মিষ্টই এবং উপাদেয়। উক্তরূপে পরোক্ষ চর্চ্চা অভ্যাসে জগতে দুঃখরূপত্বের অভাব ও রসরূপত্বের সদ্ভাব অপরোক্ষীকৃত হইবে। ইহাই বৈদান্তিক ও ভক্ত লিখিত সুসমাচার।

আত্মাতে আনন্দ আছে। আনন্দই ত আত্মার ধাতু যথা জলই বরফের ধাতু। পঞ্চদশীকার গ্রন্থারম্ভেই মঙ্গল ঘটস্থাপনার মত আত্মার আনন্দরূপত্ব উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন "অয়মাত্মা পরানন্দঃ পর প্রেমাস্পদং

যতঃ।” বৃহদারণ্যকে মৈত্রেয়ী সংবাদে যাজ্ঞবল্ক্য বলেন যে “নবা অরে সর্বস্থ কামায় সর্ব্বং প্রিয়ং ভবতি আত্মনস্তু কামায় সর্ব্বং প্রিয়ং ভবতি [বেদান্তে এই আত্মার নাম “আমি” কিন্তু ভক্তি শাস্ত্রে ইহার নাম “তুমি” বা “তিনি”]। এমন কি যে আত্মহত্যা করে সে আত্মপ্রীতি বশতঃই করে। দেহসংযোগে আত্মা কষ্ট পাইতেছে সেই সম্বন্ধ উচ্ছেদ করিলে আত্মা হয় ত সুখী হইতে পারিবে, এই বিবেচনায় সে দেহের উপর বিদ্বেষ ও আত্মার উপর প্রীতি ধরিয়াই, দেহ নাশ করে।

প্রসিদ্ধি আছে যে দুঃখিনী বৃদ্ধা মৃত্যুর বাঞ্ছা করিয়া যমকে আহ্বান করিরাছিল এবং তাহার দেখাও পাইয়াছিল। কিন্তু স্বভাব-সিদ্ধ আত্মপ্রীতি বশতঃ কাঠের বোঝা তাহার স্কন্ধে উঠাইয়া দিবার জন্যই যমকে অনুরোধ করিয়াছিল! মরিতে চাহে নাই।

সাবিত্রীরও নিজ প্রাণেই মমতা ছিল। নিজে মরিবার উদ্যোগ আয়োজন বা ইচ্ছা করে নাই। নিজভোগ্য সত্যবানকেই বাঁচাইয়াছিল।

আমার ব্যাধি না হয়, পুত্র পরিবার সুখে বাঁচিয়া থাকুক ইত্যাদি চিন্তার সারভাগ ও উদ্দেশ্য এই যে তবে ত “আমি” সুখী হইব।

পরামাণিক না আসায় শ্মশ্রুকণ্টক তীক্ষ্ণধার হইয়াছে। তদবস্থ পিতা বা ভর্ত্তা শিশু পুত্রের বা উপযুক্ত ভার্য্যার সুকুমার বদন চুম্বন-কালে স্পষ্টই দেখিতে পায় যে শ্মশ্রুকণ্টক আঘাতে শিশুক্রন্দন করে ভার্য্যার আঁখি ছলছল হয়; কিন্তু তথাপি “আত্মানন্দী” পিতা বা ভর্ত্তা নিরদয় চুম্বনে বিরত হয় না।

শ্রীগোবিন্দ দুর্য্যোধনের প্রস্তুত স্বর্ণপাত্রে ঘৃতান্ন ত্যাগ করিয়া দরিদ্র বিদুরের ক্ষুদ্রান্ন স্বীকার করেন। সুতরাং দারিদ্র্য হেন কুৎসিত বস্তুকেও সৌভাগ্য বলিয়া স্বীকার করিতে হয়।

পাঠক পাঠিকা, আইস, অকপটে বুঝিয়া লও যে দারিদ্র্য দুঃখরূপ

নহে। তাহা যদি হইত তবে দারিদ্র্য-মোচন হইলে লোকে সুখী হইত। অনেক দরিদ্র ধনী হইয়াছে কিন্তু তাহারা কেহ-ই ত সুখী হয় নাই। এই কথাটা বুঝিতে পারিলে দরিদ্রের সংসার যে দারিদ্র্য বশতঃই বিষময় এরূপ ভ্রান্ত প্রবাদে আস্থা কমিয়া যাইবে, মনের মধ্যে একটা সুখময় জোয়ার আসিতে পারিবে। দেখ নাই কি যে মাঘ মাসের শীতে বৃষ্টিতে ভিজিয়া কম্পমান দরিদ্র গরুর গাড়ীর গাড়োয়ান "বতা দে সখী কোন গলিমে গিয়া মেরে শ্যাম" গীত গাইয়া থাকে; "মনে কর শেষের সেদিন ভয়ঙ্কর" গীত ত সে গাহে না।

বাঘে আনন্দ আছে, বাঘের শিশু এবং কুটুম্বিনী পরম উৎসাহে ঊর্দ্ধলাঙ্গুল হইয়া বাঘকে আলিঙ্গন করে। নরসিংহকে দেখিয়া ব্রহ্মা শিব ভীত হয়েন বটে কিন্তু সন্তান প্রহ্লাদ সহজ সহাস্যবদনে প্রিয়-পিতা নরসিংহের ক্রোড়ে বিনা দ্বিধায় সহজেই উঠিয়া যায়। আমরাও ত অবকাশ পাইলেই চিড়িয়াখানায় যাইয়া পিঞ্জরবদ্ধ সুশ্রী বাঘকে আদরের সহিতই দেখিয়া লই।

প্রতিবিম্বকে বালকত ভালবাসেই। প্রবীণ আমরাও কেশবিন্যাস-কালে ইচ্ছা করিয়া নিজ মুখে হাস্যতরঙ্গ উঠাইয়া, নানা মুখভঙ্গী করিয়া, দর্পণগত প্রতিবিম্বকে সুন্দরতর করিবার চেষ্টা করি এবং সুন্দরতর করিবার চেষ্টা করিয়া প্রতিবিম্বের প্রতি যথেষ্ট ভাল বাসারই পরিচয় দিয়া থাকি।

সময়ে সময়ে বাজারে তিক্ত উচ্ছে না মিলিলে দুঃখিত হই এবং লঙ্কা যতই বিষম ঝাল হয় ততই তাহাকে মিষ্ট বলিয়া স্বীকার করি।

ঘোর বাদলে বিদ্যালয় গমন হইতে অব্যাহতি পাইয়া কৃতজ্ঞ বালকগণ বৃষ্টিতে ভিজিয়া বৃষ্টির ও নিজের অতিশয় সন্তোষবিধান করে। এবং পরমারাধ্যা সহজ প্রেমবতী গোপীগণ ভরা বাদলে, মন্দির শূন্য না থাকিলে

স্বার্থপর নরনারীর কল্পনারও অগোচর, পরমানন্দ মহোৎসব অনুভব করেন।

রোগকেও ভাল বাসিবার লোক আছে। চিকিৎসক রোগকে ভালবাসে এবং নগরে রোগ কম হইলে Season টাকে "মন্দই" বোধ করেন। ইহা একটা কম কৌতুক নহে। দুর্ভিক্ষকে ভালবাসে তণ্ডুল ব্যবসায়ী, গোলাজাত চাউল দরে বিক্রয় করিয়া লাভবান হইবার জন্য।

চা খুব গরম হইলে এবং বরফে যদি পীড়াদায়ক শীতলতা হয়, তথাপি গরম চা ও ঠাণ্ডা বরফ ভালই বুঝি।

মৃত্যুকেও ভালবাসে এমন লোক দেখা যায়। যাপ্য ব্যাধিগ্রস্ত, অপমানিত, শোকসন্তপ্ত ব্যক্তি মৃত্যুকে বন্ধু মনে করে। শোকগ্রস্ত উচ্চ ক্রন্দনে যে একটা কিম্ভূত সুখাস্বাদ করে তাহা ভুক্তভোগীর অগোচর নাই।

আমরা রঙ্গালয়ে সীতার বনবাস, নীলদর্পণাদি অভিনয়, অত্যন্ত আদরের সহ অর্থব্যয় ও পরিশ্রম স্বীকার করিয়া দেখিতে যাই। বিয়োগান্ত ব্যাপার অতর্কিত পথে আমাদিগকে সুখ সমর্পণ করে সন্দেহ নাই।

জ্বরও ভাল, বেদানা খাইতে পাওয়া যায়; দদ্রুও ভাল, কণ্ডূয়নে সুখ আছে। বিষও ভাল; কবি সমাদৃত, রসরূপ বিরহজ্বালাকে আমাদের কতকটা বোধগম্য করিয়া চরিতার্থ করে। প্রথমা প্রণয়িনীর মৃত্যুর পরিণাম অনেক সময়ে শুভই। তাহা দ্বিতীয়ার পাণিগ্রহণে বিস্তর আনুকূল্য করে। জনৈক বিধবা তাহার সদ্যকবরিত প্রিয় স্বামীর আর্দ্র গোরের উপর পাখার বাতাস করিতেছিল। তাহার স্বামী মৃত্যুর পূর্ব্বে তাহাকে অনুরোধ করিয়াছিল যেন গোর শুষ্ক হইবার পূর্ব্বেই বিধবা না বিবাহ করে। কৃতজ্ঞ বিধবা স্বামীর মৃত্যুকে আনন্দরূপই বুঝিয়াছিল এবং কবর না শুষ্ক করিয়া দ্বিতীয় বিবাহ করিলে স্বাধীনতাদাতা স্বামী

সম্বন্ধে পাতিব্রত্য বিরোধী ঘোরাপরাধ হইবে ভাবিয়াছিল। পদাঘাত শিশু কৃত হইলে জননী তৃপ্ত হয়, এবং নখাদিক্ষত প্রিয়কৃত হইলে বিষাদের পরিবর্তে হর্ষেরই উদয় হয় জানিবেন। সে হর্ষ উচ্ছৃঙ্খল, এবং উচ্ছৃঙ্খল বলিয়াই অপরূপ। সখীগণের সস্নেহ বিদ্রূপউক্তি যে পরিতোষকর তাহা অনেকেই জানেন।

ভ্রমও রস। মদিরা পানে দরিদ্র আবুহোসেন আপনাকে বাদসাহ মনে করিয়া সুখ পাইত, তাহাই সে জানিয়া শুনিয়া, বাদসাহ-ভ্রম হইবে বলিয়াই ইচ্ছা করিয়া নেশা করিয়া ভ্রম স্বীকার করিত।

গালিও রস। বিবাহসময়ে গালি বিখ্যাত মধুর। দুঃখ যদি কোথাও থাকে তবে তাহা এই যে, সেই মধুর গালিবর্ষণ ঘন ঘন মনুষ্যের দগ্ধ অদৃষ্টে ঘটে না।

দিগ্মোহেও রস। বিস্ময় রস। আর বিস্ময়রস বালিকা বধূর। ধূমধাম সমারোহ আয়োজনে সংগৃহীত বৃহৎ সুন্দর বরকে, বালিকা বধূ পুতুল খেলার প্রিয় সঙ্গী বুঝিতে চায়। কিন্তু সুন্দরকে কুস্তীর পালোয়ান ও নখ দন্তাদি বিশিষ্ট সুন্দর বটে, কিন্তু পুরুষ ব্যাঘ্র দেখিয়া বিস্ময়াকুল হয়।

যদ্যপি এই প্রবন্ধটী ভক্তিবিষয়ক নহে, তথাপি ভক্তির কথা কিছু বলিব; বলাটা উচিত বলিয়াই আমার বিবেচনা হয়। অবশ্য ইহাও প্রকাশ রহিল যে, উপস্থিত আমি বেদান্তেরই উকিল; বেদান্তের বক্তব্যটাই আমাকে নিখুঁত করিয়া বলিতে হইবে।

জগতের রস রূপ সম্বন্ধে বৈদান্তিক ও ভক্ত উভয়ের একমত। "যথাপ্রাপ্ত" জগতে দুইজনই বৈরাগী। বাল্যকালে আমরা জগৎকে যে ভাবে দেখিতাম বয়োবৃদ্ধি সহকারে "সেই" জগৎকেই আমরা ভিন্নরূপে দেখি। অভিনয়কে সত্য বুঝিতাম, এখন বুঝি না। পুতুল ভাঙ্গিয়া গেলে বালক বড়ই ক্রন্দন করে; বাবা তুচ্ছ বস্তুর জন্য ততটা অনাবশ্যক প্রচুর কান্না

দেখিয়া হাস্য করে। বালক মনে করে যে, বাবা কি আহাম্মক্, আমার এত বড় ক্ষতি হইল, বাবা তাহা বুঝিতে পারিল না। সেই বালকই বাবা হইয়া নিজ পুত্রের খেলনা-ভঙ্গে বিলাপ দেখিয়া হাস্য করে। আমরাও বালক। আমাদেরও পুতুল আছে, যথা প্রিয় পুত্র, সখের কুকুর। তাহা ভাঙ্গিলে আমরা কাতর হই। তখন বেদবিৎ সমদর্শী পণ্ডিতগণ হাস্য করেন ও আমাদের সান্ত্বনার জন্য রোচক ভয়ানক যথার্থ কথায়, যথাধিকার, উপদেশ দেন। আমরা "যথাপ্রাপ্ত" জগতে ভাল মন্দ, হিতাহিত, শ্লীল অশ্লীল, সুখ-সয়তান দেখি। আমরাই পরে বিচার-দৃষ্টিতে যথাপ্রাপ্ত জগৎকে রসনিমিত্ত রসোপাদান বলিয়া পরোক্ষ করিব। শয়তানকে অভিনায়িক কৃত্রিমরাক্ষস এবং রসপোষক বুঝিব। বিরহ যে গরল নহে, স্বাদু সুধা তাহা বুঝিতে পারিব। ছেলেকে প্রিয় ও শত্রুকে দ্বেষ্য বুঝিব না। পুত্র শত্রু উভয়কেই রসনির্ম্মিত, মিশ্রির জমাট আকারবৎ দেখিব। তবেই হইল যে সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম। এই যে নূতন ভাবে জগৎকে দেখা, তাহাই, ইতঃপূর্ব্বে দৃষ্ট উক্ত "যথাপ্রাপ্ত" সুখ-সয়তান-যুক্ত জগতে বৈরাগ্য, অমনোযোগ, অনভিনিবেশ। ইহা পূর্ণ ভোজনের পরে অন্নে, কাম তৃপ্তির পরে পরস্পরে, বা শ্মশানে উপস্থিত হইয়া সংসারে বৈরাগ্যের মত অবিচারিত, তুচ্ছ, ক্ষণস্থায়ী বৈরাগ্য নহে। ইহা বিচারনিষ্পন্ন সুদৃঢ় বৈরাগ্য। এখন কথাটি এই যে, কিং কর্ত্তব্যমতঃ পরং! নূতন ভাবে যে জগৎ দর্শন হইতেছে, সেই জগতে ও বৈরাগী হইতে হইবে, কি অনুরাগী হইতে হইবে? এবং সেই অনুরাগই বা কি রূপ? অত্র বিচিত্র জগতের রসময়ত্ব বুঝিবার পরে পণ্ডিতগণের মধ্যে বিবাদ কলহ হইয়া দুইটী দল পাওয়া যায়। ঘোর বৈদান্তিক এবং ঘোর ভক্ত। ঘোর বেদান্ত বলে, জগৎ উড়াইয়া দাও। ঘোর ভক্তি বলে যে, যদি জগৎ রসরূপই হইল তবে তাহাতে বৈরাগ্য অভ্যাস করা হইবে না, তাহাতে নিরতিশয় অনুরাগীই

হইতে হইবে। (জীবগোস্বামী সঙ্কেত করিয়াছেন যে, ঘোর বৈদান্তিক ও ঘোর ভক্ত মিলাইয়া, অদ্বয় সুষুপ্তি ও সদ্বয় জাগরস্বপ্ন একত্রীভূত করিয়া তবে পূর্ণতত্ত্ব, পূর্ণসত্য পাওয়া যায়। তাঁহার কথা শুনেই বা কে, বুঝেইবা কে ? তেমন ভাগ্যবান্ ব্যক্তি বড় বেশী পাওয়া যায় না।) কে সত্য ! ঘোর ভক্ত, না ঘোর বৈদান্তিক ? এই প্রশ্নের মীমাংসা যাহাই হউক, ইহা সত্য বটে যে, সত্যটা বড় ঠিক্ ঠাক্ ; কিছু মাত্র ক্ষুণ্ণ হইলে তাহা "সত্য" হইবে না। **"A miss is a mile"**। বন্দুকের গুলি কাণের নিকট দিয়া যাওয়া আর লক্ষ্য মস্তকের একমাইল দূর দিয়া যাওয়া দুইই সমান-বিফল, দুইই মিথ্যা। মথি ষোড়শাধ্যায়ে বলিয়াছেন যে Soul অর্থাৎ সত্যটি সমস্ত জগদাধিপত্য হইতে বড়। ঘোর বৈদান্তিক ও ঘোর ভক্তের বিসংবাদের হস্ত হইতে সেই **Soul** টার উদ্ধার না হইলে আর রক্ষা নাই। কে বা উদ্ধার করে ? গ্রন্থকার ত "মত" উদ্ধার করিতে ব্রতী মাত্র ; Soul উদ্ধার করার ভার লইতে অযোগ্য ও অনিচ্ছুক। **Soul** উদ্ধার ব্যাপারটা গুরুতম। ইহা **Detective Story**র মত সাময়িক চিত্ত-বিনোদ-কর নহে। একদিন হঠাৎ ভ্রমণকালে বাতায়নপথে, বা ঝটিকার সময় গ্রামের উপকণ্ঠে জীর্ণ শিবমন্দিরের ভিতরে একখানা চাঁদবদন দেখিয়া কোনও অপক্কমস্তিষ্ক, ঈষৎ গোঁফের রেখা, বালক-যুবাদ্বারা সেই চাঁদ-বদনের স্বত্বাধিকারিণীকে, ক্ষুদ্র মানব-জীবনের, ক্ষুদ্রাংশ-যৌবনের জন্য ঔপন্যাসিক বিবাহসূত্রে হস্তগত করিয়া জীবন সার্থক করার মতও নহে। ইহা গুরুতম। ইহার আলোচনায় সাবহিত মনোযোগ আবশ্যক।

যথাপ্রাপ্ত সুখশয়তান সম্বলিত জগৎটা যেন পর্ব্বতের উপত্যকা। যাহারা জগৎকে রসময় বুঝিল, তাহারা যেন যথাপ্রাপ্ত জগতে উদাসীন। বৈরাগী হওয়াটা যেন যথাপ্রাপ্ত জগৎত্যাগ ও হিমাচলের কিঞ্চিৎ উর্দ্ধদেশে গমন। তত্র যেন দুইটী পথ। একটী হিমাচলের সর্ব্বোচ্চ-শৃঙ্গ বদরিকার

পথ, অপরটী যেন কেদার শৃঙ্গের পথ; কেদার শৃঙ্গটী সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে বদরিকাশৃঙ্গের তুল্যই উচ্চ। বদরিকা যেন বেদান্ত, নিরতিশয় অদ্বয়, অভয়, সমান-রস, সুষুপ্তি, সমাধি। কেদার যেন সদ্বয়, কিন্তু রসময়, স্বপ্ন জাগর। বদরিকা নিরাকার। কেদারে যেন প্রিয় দেবতা, প্রিয় বলিয়াই দেবতা, পরম সুন্দর বিগ্রহবান্ সপরিবার লীলাসক্ত। এই পথিসন্ধিতে কলহ; কেহ অদ্বয়-অভয়ে পক্ষপাতী, কেহ বা লীলা-বিগ্রহ সামীপ্য-লোভী।

অপক্ষপাতী, অলোভ, নিরপেক্ষ লোককে যদি কেহ জিজ্ঞাসা করেন যে, বদরিকা ভাল, কি কেদার ভাল? তবে সে উত্তর দিলে, হয়ত বলিবে দুইই ভাল; না হয় উত্তর দিবে না; উত্তর দেওয়া যে কঠিন তাহা স্বীকার করিবে; ও উল্টা প্রতিপ্রশ্ন করিবে যে, ওহে প্রশ্নকর্ত্তা, বল দেখি,—বাবা বড় কি মাতা বড়! বল ত তোমরা, "কাকো বন্দো কাকো নিন্দো? দুনো পাল্লা ভারী।" পিতা মাতা উভয়েই যখন আমাদের পূজ্য; কি করিয়া ছোট বড় করা যায়? তাঁহাদের কে বড় কে ছোট তাঁহারাই জানেন, হয় ত তাঁহারাও জানেন না। পাঠক পাঠিকা গ্রন্থকারের "মত" জিজ্ঞাসা করিও না। ভক্তির মরমের কথাটী লঘুকলেবরে উল্লেখ করিয়া সে যে বেদান্তের brief লইয়াছে, গ্রন্থকারকে সেই বেদান্তের বিস্তারিত ঘোষণা করিতে দাও। গ্রন্থকার উপস্থিত ক্ষেত্রে ভক্তির অনুরোধ রাখিতে পারিবে না। পাঠক পাঠিকার ইচ্ছা হয় তাঁহারা ব্রজ-বিলাস সম্পত্তির মহাজনগণের পুস্তকাদি পাঠ করিয়া আপনাদিগকে কৃতার্থ করিয়া লইতে পারেন। গ্রন্থকার হাতের তাস্ দেখাইতে প্রস্তুত নহে।

বেদান্ত বলে যে, নূতন ভাবে জগৎকে শয়তানী-বর্জ্জিত রসরূপ দেখিবার পরে যাহাতে ইহার অত্যন্ত অদর্শন, ভাণ-রাহিত্য ও উচ্ছেদ হয় তাহাই করিতে হইবে। নচেৎ পুনরায় পূর্ব্ববৎ কোনও কারণে এই

জগতে হয় ত "অভিনিবেশ" হইবে ; শয়তান না থাকিলেও শয়তান আছে এরূপ ভ্রম একং সুতরাং আপদ হইবে। অভয় অদ্বয় আত্মাতে প্রতিযোগী দ্বৈতরূপ শক্তি কিছু নাই এবং যদিও বা থাকে তাহাকে বিনাশ করিতে হইবে। নচেৎ শক্তি আবার জগৎ সৃষ্টি করিয়া মজাইবে।

ভক্ত বলে না, না, না। অদ্বয় আত্মাতে শক্তি আছেই, আত্মা শক্তিমান্। শক্তি শক্তিমতোরভেদাৎ তত্ত্ব অদ্বয়ই, অভয়ই পরমানন্দই। অগ্নির দাহিকাশক্তি বলিলে অদ্বয় অগ্নিই যুঝায়, অত্র ষষ্ঠীবিভক্তি দুইটী বস্তু দেয়ও এবং দেয়ও না। অগ্নি হইতে দাহিকা শক্তিকে সাক্ষাৎ পৃথক করা যায় না, অথচ কল্পনায় পৃথক ভাবিতে পারা যায়। কল্পনাই শক্তি। গোবিন্দ ও ঠাকুরাণী, তথা শিব-সোহাগিনী-কালী ও শিবজী inseparable হইয়াও, নিত্য মিলিত হইয়াও, কল্পনায় পরস্পর পৃথক্ হইয়া লীলা করেন। পৃথক হওয়াটা নিত্যমিলিতের যেন বিরহ, পরস্পর দূরে অবস্থান। দূরত্বের মাত্রা অল্প হইলে, ক্রীড়া-কৌতুক সময়ে বিরহের নাম মিলন। দূরত্বটা কিছু বেশী পরিমাণ হইয়া পরস্পর অদর্শন তক হইলে বিরহের নাম বিরহ ; সেই বিরহে বড় জ্বালা। বিরহান্তে, নিত্য মিলিতের যেন নূতন মঙ্গলমিলন কল্পিত হয়। পরে পুনরায় বিরহ পুনরায় মিলন, এই চিরন্তনকুশলধারাটী, বিবাহিতের মিলনের মত একঘেয়ে নির্বিঘ্ন, উৎসাহশূন্য, নিত্য মিলনকে, নিত্য তাজা, নিত্য নূতন করিয়া, বিঘ্নবহুল সুতরাং দুর্লভ পরমানন্দ রূপে সুব্যবস্থিত করে ; বিরহই ত রসসার। স্বকীয়াতে পরকীয়াভিনয়ই বিরহের আকর এবং বিরহই পরমানন্দ। অনন্যশরণ শ্রীমদ্‌ব্রজ-সুন্দরীগণের কৃষ্ণ-বিরহে যে বিষবৎ তীব্রোৎকণ্ঠা ও মিলনে গোবিন্দ-কণ্ঠলগ্নাগণের যে কিম্ভূত, অলৌকিক, বাষ্পাকুল, রুদ্ধকণ্ঠ, অলসানন্দ, তাহা সাধারণের বুদ্ধি-বচনাতীত, কিন্তু কৃপানুগৃহীত প্রীতি-দীক্ষিতের

"সহজ"-প্রতীত। বিরহ পীড়ার হৃৎকম্পান্দোলনই, ঠিক্ তদবস্থ থাকিয়াই, সুখ, মিলনের হৃৎকম্পান্দোলনে পরিণত হয়। গোষ্ঠগত গোবিন্দের অদর্শনে বা অভিসারিকার সুন্দরের উদ্দেশে ত্বরিত গমনকালে, প্রতিদিন ক্ষুদ্র বিরহে, পলকে প্রলয় জ্ঞান ও মিলনের শুভ সংঘটনে দীর্ঘকালে স্বল্প-বোধ; বিরহের অসহ্য জ্বালা এবং প্রিয়মিলনের অসহ্য পরমানন্দ এবং ইহার পৌনঃপুন্যই ভক্তি-মর্ম্ম। ভক্তিতে ব্রহ্মসমাধি না হউক, সুষুপ্তি মহাপাপ বলিয়া পরিগণিত। গোপী, কি স্বপ্নে কি জাগরে, হয় গোবিন্দ-সমীপবর্ত্তিনী, না হয় বিরহকালে গোবিন্দগুণ কীর্ত্তণে বা গোবিন্দের জন্য পুষ্পহার রচনায় তচ্চিন্তাপরায়না। অষ্টপ্রহর তাহাদের মন গোবিন্দ-লগ্ন। গোপী অষ্টপ্রহর গোবিন্দকে চায়, কি স্বপ্নে কি জাগরে; হয় গোবিন্দকে সমীপে পাইতে চায় অথবা অদর্শণে তচ্চিন্তায় মগ্ন থাকিতে চায়; সুষুপ্তিকে বা গোবিন্দ-চিন্তা-রহিতকালকে, মুহূর্ত্ত মাত্র হইলেও হতবিধাতার নির্দ্দয় নিগ্রহ মনে করে। বিরহে অশ্রু, মিলনেও অশ্রু। এবং এক কথায় সমগ্র ভক্তিশাস্ত্রের সার সর্ব্বস্বটী বলিতে হইলে ইহাই বলিলে যথেষ্ট হয় যে, গোবিন্দ চক্ষুর জল ঘুচায় না, মুছায়। নিত্য সঙ্গ দেয় না; বিরহ-বিষে কাতরা করিয়া পরে বারম্বার সঙ্গ দান করিয়া অশ্রুলাঞ্ছিত গোপী-বদন নিজ পটাঞ্চলে স্বহস্তে মুছাইয়া দেয়। প্রবীণ যথা কোনও অমঙ্গল বস্তু প্রার্থনা করিলে শিশুকে দেয় না; তদ্বৎ গোপী নিত্য-মিলন চাহে বটে, কিন্তু রসপ্রবীণ রসচতুর জানে যে তাহা কল্যাণকর সুখজনক নহে; গোপীকে নিত্য মিলন দেয় না, বিরহে কাঁদায়, ও পরে মিলিত হইয়া আদরের সহিত নিজে গোপীর বদন পদ্মহস্তে ধরিয়া মুছায়। কথাটা আবার বলি, পার যদি বুঝিয়া লও, গোবিন্দ চক্ষুর জল ঘুচায় না, মুছায়। কথাটাতে যে কত প্রীতি কত অনুরাগ; কথাটা যে কত মর্ম্মস্পর্শী তাহা আমরা

বুঝিয়াও বুঝিতে পারি না, ইহাই মহৎ পরিতাপ। যাহা বলা গেল তাহা ভক্তি সম্বন্ধে ঈঙ্গিতমাত্র জানিবেন। অবসরে ইহার অধিক বলা ঠিক নহে। অত্র বেদান্ত বলে,—বিরহ যখন জ্বালারূপ, তখন তাহা হেয়ই, অনুপাদেয়ই। তাহা হইতে অব্যাহতি পাওয়াই ইষ্ট। নিত্য মিলনই ঘটাও; যে কল্পনা দ্বারা বিরহ "ইব" ঘটে, সেই কল্পনার অত্যন্ত উচ্ছেদই কর, তাহা হইলে নৈরাকাঙ্ক্ষ্য হইবে; সুতরাং নূতন কোনও আকাঙ্ক্ষা-তৃপ্তির জন্য ভক্তির বা অন্য কাহারও আরাধনা বা আনুগত্য করিতে হইবে। আমরা কল্পনা উচ্ছেদের বৈদান্তিক প্রক্রিয়ার অবতারণা করিবার পূর্ব্বে জগতের রসরূপত্বের একটু বিস্তৃত আলোচনা করিব।

সমান আনন্দ নিজে নিমিত্তোপাদান হইয়া নানা অসমান আকারে জগৎরূপে স্বপ্রচার করিয়া নানা বিশেষাকারে অনুগত বিশিষ্টানন্দ আস্বাদ করিতেছেন; এ বিষয়ে বিঘ্ন সম্পাদন করিবার যোগ্যতা কাহারও নাই। বীর, রৌদ্র, অদ্ভুত, বীভৎস, ভয়, হাস্য, শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য এবং আদি মধুর সকলেই রস; নীরস কেহই নহে।

কত যে কাল পূর্ব্বে তাহার ইয়ত্তা নাই বৃহদারণ্যক বলিয়া রাখিয়াছেন এবং আমরাও শ্রাদ্ধকালে,পড়াপাখীর মত, এখনও বারম্বার বলিয়া থাকি যে মধু মধু মধু, মধুবাতাঋতায়তে মধুক্ষরন্ত সিন্ধবঃ ইত্যাদি; মধু-বাতা মন্ত্রোক্ত বায়ু, জল, ওষধি, রজনী, উষা, ক্ষিতি, আকাশ, পিতা, বনস্পতি, সূর্য্য, গাভী এবং তদুপলক্ষিত সারা দুনিয়াটা, মধু, অনুদ্বেগকর, রসরূপ।

অবশ্য কোন উপাধির নিজস্ব মধু নাই। তত্র অনুগত, আনন্দ-স্বরূপেরই দ্বারা তত্র প্রদত্ত, ন্যস্ত বিশিষ্টানন্দই মধু। মহারাজ আনন্দই উপাধিতে স্বরক্ষিত নিজানন্দকে ভোগ করেন। অস্থিতে স্বাদুরুধির

নাই; কুকুর সেই অস্থিখণ্ডটাকে সহায় করিয়া, কৌশলপূর্ব্বক তাহা চিবাইয়া নিজমুখে ক্ষত করিয়া নিজমুখক্ষত নিঃসৃত নিজ রুধির পান করিয়া তৃপ্তি লাভ করে। তদ্বৎ আনন্দ মহারাজ অনুগত থাকিয়া জগৎ-রূপ অস্থিখণ্ড কৌশলে নির্ম্মাণ করিয়া তৎসাহায্যে নিজ সমান অখিল আনন্দ স্বরূপকে টুকরা করিয়া, খিলীকৃত করিয়া, ছিদ্রবান্ করিয়া, সেই ছিদ্রপথে বিশিষ্টরূপাবস্থিত বিশিষ্টরূপে নিঃসৃত স্বানন্দকে ভোগ করেন। জগতে ত দুঃখ নাই; আছে কেবল রস এবং রস, আর রস। বুঝিয়া লও, চিনিয়া লও। আত্মা যদি তোমার প্রিয় হয় তবে তুমি আত্মাকে, আনন্দকে, তাহার সকল রকম ছদ্মবেশের মধ্যে তোমার নিজ প্রিয়রূপে নিশ্চয় চিনিয়া লইতে পারিবে। ভালবাসার দৃষ্টি বড় তীক্ষ্ণ; তাহার নিকট প্রিয় আত্মা কদাচ আত্ম-গোপন করিতে পারিবে না।

এক নারীর স্বামী, সখের দলে, সুন্দর রাজা, কখনও বা কুৎসিত বৃদ্ধ কখনও বা সখী সাজিত। কেহই তাহাকে চিনিতে পারিত না, কিন্তু কি রাজবেশে, কি বৃদ্ধবেশে, কি সখীবেশে, সকল নেপথ্য রচনার ভিতরেও তাহার স্ত্রী, ভালবাসার অপরাজেয় দৃষ্টিতে, তাহাকে চিনিতে পারিত। তদ্বৎ আমিও প্রতি উপাধিতে, প্রতি দৃশ্যে, ভালমন্দে, শ্লীল অশ্লীলে, হিতাহিতে, বিষামৃতে সর্ব্বত্রই সত্ত্বদাতা, অনুগতি হিসাবে বর্ত্তমান, আমার জীবন-সর্ব্বস্ব প্রিয় আত্মাকে রসরূপেই চিনিয়া লইতে পারিব। কেন পারিব না?

আমার জীবন-সর্ব্বস্ব আত্মা স্বপ্রচার করিয়া জগৎ হইয়াছেন; এই জগৎকে আমি ভাল বাসিব, আমাকে আমার মত, প্রভুকে ভৃত্যের মত, প্রিয় সখাকে সখার বা সখীর মত, পিতাকে পুত্রের মত, সন্তানকে মাতার মত, পতিকে পত্নীর মত, পঞ্চমখণ্ডের তৃতীয় পরিচ্ছেদে অমরনাথকে লবঙ্গলতার মত, এবং বলিতে কি, হয় ত ষোড়শ পরিচ্ছেদে উপেনকে

ইন্দিরার মত, হয় ত বা আরও বেশী। ভালবাসাটা সর্ব্বনেশে জিনিষ; ইহার সীমা নাই, তৃপ্তি নাই।

কেহ কেহ দুঃখ করেন যে আমরা জন্মকাল হইতেই নিতান্ত জগতের বশীভূত, Environment এর দাস, স্বাধীনতাহীন; কিন্তু যথা পঙ্ক হইলেও ঘৃণ্য নহে, চন্দন-পঙ্ক উপাদেয়, তদ্বৎ পারবশ্য মাত্রেই নিন্দ্য নহে, প্রিয়পারবশ্যটী সৌভাগ্য। জগৎটী আনন্দোপাদান ও প্রিয়জন, তাহার বশ্যতা ত শাপে বর। পিতা বা পুত্র যখন পুত্র বা পিতার আবদার রক্ষা করেন; নারী যখন পুরুষের বা পুরুষ যখন নারীর স্নেহ সেবা করেন, তখন সেব্য হওয়া অপেক্ষা সেবক হওয়ার আনন্দ যে কতশতগুণ অধিক তাহা বুঝিয়াই সেবা করেন। মরম ত প্রীতিতে।

ভগবান পদবীর ব্যক্তি না হইলে প্রিয়বশ্যতার যথোচিত সমাদর করিতে পারেন না। মহাত্মা শিবজী বক্ষোধৃতদেবীপদকোকনদ বলিয়াই ত মহাত্মা হইয়াছেন। নিভৃতনিকুঞ্জপূজাবসানে বিদগ্ধমাধব নিত্যই ঠাকুরাণীর প্রসাধন করিতেন; চারুচরণতল অলক্তরাগরঞ্জিত করিয়া তত্র নিজ সহস্র নাম লিখিয়া ধন্য বোধ করিতেন; এবং প্রণয়েৰ্য্যা-চঞ্চলা মানিনীর পদ সরোজপ্রান্তে নিজাপরাধ ও দৈন্য নিবেদন করিবার শুভাবসর পাইলে, ভাগ্যোদয় বুঝিয়া, বিধাতাকে আনন্দ গদ্‌গদ্‌ সাধুবাদ করিতেন।

দেশী ভট্টাচার্য্যগণ বিয়োগান্ত নাটক রচনা করেন নাই। নাটক মধ্যে প্রণয়সরোষ কলহ, বিরহ কপটতাদি বিঘ্নের অবতারণা করিয়া চরমাঙ্কে মিলন-গীতিই গাহিয়াছেন। সুতরাং প্রণয়-কলহ কপটতাদি রস পোষক হিসাবে রসরূপই। ঝাল দিয়া যখন ব্যঞ্জন মিষ্ট করিতে হয় তখন ঝাল ত ঝাল নহে, মধুরই।

পরদেশী ও আধুনিক দেশী শ্রেষ্ঠ কবিগণ, রসমর্ম্ম অনতিক্রম করিয়াই

বিয়োগান্ত রচনা করিয়াছেন। তাহাতে যে অশ্রু কম্প পুলকাদির উদ্বোধন হয়, তাহা কি জানি কি কারণে অত্যদ্ভুত ধাতুগত সুখপ্রদ। সেই রচনাগুলি বারংবার পাঠ করিয়াও পুনর্ব্বার পাঠ করিতে প্রবল উৎসাহ হয়। ললিত হৃদয়া দেসদিমেনা, গম্ভীরমতি সমর্থনায়িকা আয়েষা, ঈষদ্বিকশিতা অস্ফুট সুন্দরী কপালকুণ্ডলাদি স্বয়ং-প্রভাগণ নিজ নিজ অলৌকিক লাবণ্যচ্ছটায়, বিয়োগের ভীষণ তিমিরকে সমুজ্জ্বল করিয়া কি মনোহর রসরূপেই ব্যবস্থিত করিয়া রাখিয়াছেন। আমাদের রবিঠাকুরের উর্ব্বশী, বা বালিকা বধূই যে চরম সুন্দর তাহা নহে, 'জয় পরাজয়ে' কবিশেখরের রাজকুমারী অপরাজিতা, 'পতিতা'তে কুমার কিশোর তড়িৎস্পর্শউদ্বোধিতা পবিত্রা, অসীম বেদনাময়ী নষ্ট-নীড়-গেহিনী চারুও সত্যের মত পরম সুন্দর। জগতে সয়তান নাই; জগৎটা রসময়।

কিন্তু সমূহ বিপদ এই যে, কি সুখে কি দুঃখে কি ঔদাসীন্যে সর্ব্বত্রই আনন্দানুপ্রবেশ বিচারমুখে সমর্থিত হইলেও, মন বুঝে না। পরোক্ষ জ্ঞান হইলেও অপরোক্ষ হয় না। আমরা দুঃখকে সাক্ষাৎ দুঃখরূপেই অনুভব করি, সুখ রূপে অনুভব করিতে পারি না। পুঁথীগত ইলমকে আমলে আনিতে পারি না। পরোক্ষকে অপরোক্ষ করা যে কঠিন তাহার দৃষ্টান্ত পূর্ব্বে দিয়াছি, যথা স্বপ্নকে ফটোগ্রাফিত করা যায় না; তেলমাখা চোরকে ধরিয়া রাখা যায় না। আরও দৃষ্টান্ত আছে; আমাদের মৃত্যু বিষয়ে পরোক্ষ জ্ঞান আছে, যদি অপরোক্ষ জ্ঞান হয় তাহা হইলে ত আমরা নিশ্চয়ই, পরীক্ষিতের মত তৎক্ষণাৎ শুকদেবকে আহ্বান করিব। তাম্বুর উপর নিশান দেখিয়া তত্র রাজার বসতি সম্বন্ধে আমাদের পরোক্ষ জ্ঞান হয় মাত্র; অপরোক্ষ রাজদর্শনের জন্য প্রহরীরক্ষিত তাম্বুর ভিতরে প্রবেশ সহজ নহে।

রাহু একটা প্রকাণ্ড মস্তক মাত্র। রাহু বড় লোভী। লোভী

রাহু চন্দ্রকে গিলিয়া ফেলে কিন্তু উদরস্থ করিতে পারে না ; রাহুর ত উদর নাই। রাহু চাঁদকে গিলিয়াও উদরস্থ করিতে অক্ষম হইয়া অনাদিকাল হইতে বিধি-বিড়ম্বিত ও নিত্য-অতৃপ্ত। আমিও একটী রাহু; জগৎ যে রস-নির্ম্মিত সুন্দর চাঁদ তাহা হিসাবে পরোক্ষ করিয়া লোভবশতঃ গিলিলেও উদরস্থ করিতে পারি না ; জগতের রসরূপত্ব অপরোক্ষ অর্থাৎ realize করিতে পারি না, সহজোপলব্ধি করিতে পারি না।

কিন্তু যাহা হউক, ছাড়া হইবে না। অভ্যাস দ্বারা ব্যাপারটাকে "সহজ'রূপে বুঝিয়া লইতে হইবে। ছাগাদি জন্তু হইতে চারাবৃক্ষকে বেড়া দিয়া রক্ষা করিতে হয়, বৃক্ষ বড় হইলে ফল দেয়। তদ্বৎ পরোক্ষ পুঁথীর জ্ঞানকে আমরা অভ্যাস রূপ বেষ্টন দিয়া প্রথমতঃ জগতের প্রত্যেক ঘটনাতে মঙ্গল চিহ্ন অনুসন্ধান করিতে থাকিব, ক্রমে অভ্যাসবশে ব্যাপার "সহজ" হইয়া যাইবে ; তখন নিজের অনুসন্ধান বা পরের উপদেশ অপেক্ষা না রাখিয়াই সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম সহজেই বুঝিতে পারিব। তখন দেখিব যে, বচনটা সত্যই বটে' যে "যং লব্ধা চাপরং লাভং মন্যতে নাধিকং ততঃ।"

জগতের রসময়ত্ব সম্বন্ধে অপরোক্ষ জ্ঞানের একমাত্র পরিপন্থী, আমার পূর্ব্ব সংস্কার। আমার দৃঢ় "সহজ" বিশ্বাস এই যে, জগতের কিয়দংশ ব্যাবহারিক সত্য সুখদুঃখাত্মক ও বক্রী অংশ প্রাতিভাসিক ; সুতরাং সেই অংশটী রসাত্মক বটে, উক্ত দৃঢ় সহজ বিশ্বাস দূর হওয়া চাইও দূর হইবে। তৎপরিবর্ত্তে তত্তুল্য দৃঢ় সহজ বিশ্বাস হইবে যে, জগৎ "সমগ্রটাই" প্রতি-ভাসিক; এবং সুতরাং Tragic Comic সত্যদুঃখ রহিত, ও রসাত্মক। যথা যে বালকের, অভিনয়ে দৃঢ় সত্য বোধ সহজ হইত, সেই বালকেরই কিছু দিন পরে সেই অভিনয়েই দৃঢ় প্রাতিভাসিক বোধ "সহজ" হয়। সমগ্র জগতে অভিনব মাত্র বোধ সহজ হইলেই, যাহার হইবে সেই "এক" জীব সেই

দণ্ডেই, কালব্যাজ না হইয়া ঈশ্বর হইবে। বক্রী সকল স্থিরচর, দেশকাল, নানা জীব, নানা পর্ব্বত নদী অর্থাৎ সমস্ত জগৎটাকে, ঈশ্বর, স্বসমক্ষে স্থাপিত একটা অভিনয়ের মত, মনোরাজ্যের মত, স্বপ্নকালেই স্বপ্নকে স্বপ্ন জানিয়া সেই স্বপ্নকে সমক্ষে প্রাপ্তের মত, ঈশ্বরেরই সত্তানুগত ঈশ্বরদৃশ্য, ঈশ্বরভোগ্য বিচিত্র কিঞ্চিৎরূপে বুঝিবেন। ঈশ্বর দেখিতে থাকিবেন যে, নানা নট জীব, নানা অসত্য-ব্যবহার-সমষ্টি একটা আনন্দ জগৎ অভিনয় করিতেছে। ঈশ্বর এখনও জগদভিনয়ের সাক্ষিত্বরূপ ও রসাস্বাদকর্ত্তৃত্বরূপ উপাধি দ্বারা যুক্ত, সুতরাং বদ্ধ; এই ঈশ্বরকে লোকে ঈষদ্বদ্ধ কেহ বা খাতির করিয়া জীবন্মুক্ত বলে। এই অবস্থাটা বড় মন্দ নহে ; সজ্ঞানে অভিনয়কে অভিনয় বুঝিয়া, দেখিবার কালে দ্রষ্টার বড় কিছু হানি হয় না ; যথা সর্পে বিষ থাকিলেও সর্পের হানি হয় না। বৈদান্তিক কিন্তু এই অবস্থাটাকে সভয় বিবেচনা করেন ; তাঁহার ভয় যে পাছে অভিনয়ের দুঃখে, ভ্রমে সত্য বোধ হয়। ঈশ্বর যদি মুক্ত হইতে ইচ্ছা করেন তবে এখন বুঝিয়া লউন, যে যদি আমি জ্ঞাতসারে (সুষুপ্তিবৎ অবশে, অজ্ঞাতসারে নহে) সাক্ষ্যজগৎকে আপনাতে আকর্ষণ করিয়া লই, জগতে যে "আমি" সৎরূপে অনুপ্রবিষ্ট আছি, সেই অনুপ্রবিষ্ট সৎকে, ফিরাইয়া লইয়া সমান আমিতে সমান করিয়া লই, তবে শিখানষ্টে, শিখীনষ্ট পুরুষ অনষ্টবৎ, সাক্ষ্য-জগৎ নিঃস্বত্ব হইয়া লুপ্ত হইলে, সাক্ষিত্ব উপাধিরও অবশ্য লোপ হইবে বটে, কিন্তু সমান "আমি" সমান হইয়া থাকিবেই বা থাকিবই।

জগৎ যে, অংশে ব্যাবহারিক সত্য এবং অংশে প্রাতিভাসিক অসত্য-ব্যবহারময়, ইহাই আমাদের যথাপ্রাপ্ত "সহজ" বিশ্বাস। ইহার ভিত্তিটা যাচাই করা আবশ্যক। অত্যন্ত আবশ্যক। ব্যবহারিক সত্য বলিয়া কিছু নাই, এই বোধ নিঃসংশয়িত হওয়াই চাই।

কেহ কেহ বলেন যে তদ্বিষয়ে আমাদের কর্ত্তব্য কিছুই নাই। শ্বেতকেতু বামদেবাদি প্রাচীনগণ পূর্ব্বেই তাহার যাচাই মীমাংসা করিয়া রাখিয়াছেন। তাঁহারা সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, ব্যাবহারিক সত্য বলিয়া কিছু নাই; জগৎ রজ্জুসর্পবৎ। জগৎ-সর্পটা সত্য নহে, ইহা আত্মার ভ্রম-বিলাস মাত্র। আত্মা-রজ্জুই একমাত্র সত্য। জগৎটা সেই "এক" সত্য-আত্মার লীলা এবং সেই লীলাটা বিলাসরূপ, বিনোদরূপ, সত্য দুঃখরূপ নহে।

অত্র অনেকে বলিয়া থাকেন যে, আহা আমাদের কি সৌভাগ্য; শ্বেতকেতু প্রভৃতি যে ভারতভূমিকে অলংকৃত করিয়াছিলেন, আমরা সেই ধন্য দেশে জন্মলাভ করিয়াছি এবং আমরা সেই সকল মহাপুরুষের বংশধর; ধন্য আমাদের বংশমর্য্যাদা; ধন্যোঽহং ধন্যোঽহং। এ রূপ অকিঞ্চিৎকর বাজে আস্ফালনে কোনও ফল নাই; ইহাতে বুদ্ধিমান্দ্যই প্রকাশ পায়। শ্বেতকেতু প্রভৃতি মনীষিগণ জগৎতত্ত্ব যাচাই করিয়া কৃতার্থ বা অকৃতার্থ যাহা হউক হইয়াছিলেন। আমাদের তাহাতে ক্ষতিবৃদ্ধি নাই। আমাদের প্রত্যেকের নিজে নিজে তত্ত্বটা বুঝিয়া লইতে হইবে। পৈত্রিক সম্পত্তি বিভাগ করিয়া লওয়া কঠিন নহে; কিন্তু পৈত্রিক বুদ্ধি বিদ্যা উত্তরাধিকার-সূত্রে পাওয়া যায় না; তাহা নিজে নিজে অর্জ্জন করিতে হয়।

একটা ছাগীর দুইটা বাঁট; তিনটা বৎস। দুইটা সেয়ানা পণ্ডিত-বৎস দুইটা বাঁট অধিকার করিয়া সুখে দুগ্ধপান করিতে থাকার সময়ে তৃতীয় বৎস কেন যে উল্লাসভরে নৃত্য করিতে থাকে,—অজ্ঞতা ব্যতীত তাহার অন্য কোন হেতু খুজিয়া পাওয়া যায় না। তৃতীয় বৎসের কর্ত্তব্য এই যে, সে যেন নিজের অজ্ঞতা পরিহার পূর্ব্বক, নিজে অধিকার অর্জ্জন করিয়া তত্ত্বজ্ঞানরূপ দুগ্ধপান করিতে সমর্থ হয়। গ্রন্থ দীর্ঘ হইয়া পড়িতেছে। একটা পুনশ্চ সহ গুরুবিদায় করিয়া বক্তব্য শেষ করিতে হইবে।

(৫)

চিদানন্দ প্রবন্ধে ব্যাবহারিক ও প্রাতিভাসিক সত্তার প্রসঙ্গ সূত্রিত মাত্র হইয়াছে। তাহার বিশদালোচনা আবশ্যক।

নাবালক বেত্রাধীন বিদ্যার্থীর বোধ-সুগমার্থে পণ্ডিতগণ যাবতীয় বস্তুকে তিনটী রাশিতে বিভাগ করিয়াছেন; পারমার্থিক, ব্যাবহারিক ও প্রাতিভাসিক। পারমার্থিক সত্তাটী আত্মা-প্রত্যক্, ইহা স্বয়ংসিদ্ধ, স্বয়ং-পূর্ণ, ভূমা, অভয়, অদ্বয়, দৃশ্য মাত্রের অভাব বশতঃ অ-সাক্ষী। স্বয়ংপূর্ণ শব্দটীর অর্থ বুঝাইবার জন্য বৃহদারণ্যক শ্রুতি বলেন যে "পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাৎ পূর্ণ মুদচ্যতে। পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণ মেবাবশিষ্যতে"। পূর্ণকুম্ভ স্বয়ং-পূর্ণ নহে; তত্রস্থ জল ঢালিয়া লইলে তাহা আর পূর্ণ থাকে না, অর্দ্ধপূর্ণ বা নিঃশেষে রিক্ত হইয়া যায়। পরন্তু এক যূথিকার গন্ধ একজনকে যতটা সন্তোষ দেয় হাজার লোক উপস্থিত হইলে প্রত্যেককে ততটাই সন্তোষ দিতেপারে, অথচ নিজে হীন,রিক্ত হয় না, পূর্ণ ই থাকে। এক বিম্ব একদর্পণে যেরূপ প্রতি-বিম্ব উৎপাদন করে শত-সহস্র দর্পণে সেই রূপই শত-সহস্র প্রতিবিম্ব উৎপাদন করিয়াও নিজের পূর্ণত্ব বজায় রাখিয়া কতকটা স্বয়ং পূর্ণত্বের দৃষ্টান্ত হইতে পারে। এক দীপ হইতে এক দীপান্তর বা বহু দীপান্তর জ্বালাইয়া লইলেও আদিম এক দীপ পূর্ণরূপই, অক্ষুণ্ণই থাকিয়া স্বয়ং পূর্ণত্বের উদাহরণ। তদ্বৎ এক অদ্বিতীয় প্রত্যক্ অংশ স্বপ্নে বহুজীব তৈয়ার করিয়াও কিছু মাত্র হীন হয় না—স্বয়ং পূর্ণ প্রত্যগাত্মা স্বয়ংপূর্ণ ই থাকে। সুষুপ্ত পূর্ণ আত্মাতে পূর্ণ থাকেই কিন্তু ব্যাবহারিক বা প্রাতিভাসিক কিছু দৃশ্য বস্তুর উল্লেখ করিলেই, পারমার্থিক বস্তুটী একটু হীন, সবিকল্প সদ্বয়, অল্প, ঈশ্বর

হইয়া পড়িল, Paradise lost হইয়া গেল, আপদ সুরু হইল। পারমার্থিকে সাক্ষিত্ব উপাধি যোগ হইল। পারমার্থিকটী সাক্ষিত্ব উপাধি দ্বারা ঈষৎ জড়িত, স্পৃষ্ট, কলঙ্কিত, বদ্ধ হইয়া পড়িল। ব্যাবহারিক ও প্রাতিভাসিক সেই সাক্ষি-ঈশ্বরের সাক্ষ্য। আমরা প্রথমতঃ সাক্ষ্যবর্গের যে দুইটী বিভাগ কল্পিত হয়, ব্যাবহারিক ও প্রাতিভাসিক,—তাহারই আলোচনা করিব।

যাহা দ্বারা ব্যবহার নিষ্পন্ন হয়, তাহা ব্যাবহারিক, যথা—অন্ন জল বস্ত্র ঘটাদি।

যাহাদ্বারা ব্যবহার নিষ্পন্ন হয় না, অথচ যাহা দৃশ্যরূপে ইন্দ্রিয় বা কল্পনাগোচর, সাক্ষাৎ দণ্ডায়মান, তাহা প্রাতিভাসিক, যথা—প্রতিবিম্ব, ছায়া, স্ফটিক—লৌহিত্য, অভিনয়, রজ্জু সর্প, দ্বিচন্দ্র, মনোরাজ্য, অশ্বডিম্ব, স্বপ্নস্মৃতি ও 4th and higher Dimensions; দর্পণের পৃষ্ঠ দেশস্থ যথাবস্থিত ও প্রতিবিম্বিত অবকাশ একত্রে ধরিয়া Six Dimensions ইত্যাদি।

পরন্তু শিশু-বিদ্যার্থী ক্রমে সাবালক হইলে উক্ত বিভাগ অস্বীকার করে। দেখে ও বুঝে যে, যখন প্রাতিভাসিক দ্বারাও নানা ব্যবহার নিষ্পন্ন হয়, তখন প্রাতিভাসিক ও ব্যাবহারিক উভয়ই এক রূপ।

প্রাতিভাসিকে যে ব্যবহার নিষ্পন্ন হয় তাহার উদাহরণ দিব।

একদা বালিকা দেবী আকাশের চাঁদকে ধরিয়া দিতে বলিয়া গিরি-রাণীকে ব্যতিব্যস্ত করেন। সরল-মতি বৎসলা রাণীর বিপদে চতুরমতি, বৎসল হিমালয় দর্পন-মধ্যে—চন্দ্র প্রতিবিম্ব—বা ততোধিক দেবী-মুখ-প্রতি-বিম্ব দেখাইয়া দেবীর ব্যাবহারিক সান্ত্বনা সম্পাদন করেন।

আমরাও প্রাতিভাসিক প্রতিবিম্ব-সাহায্যে পক্বকেশ উৎপাটন করিয়া যুবা সাজিয়া দ্বিতীয় পক্ষে ব্যাবহারিক বিবাহ করিবার কৃত্রিম যোগ্যতা সম্পাদন করিয়া লই।

রক্তজবার ছায়া শুভ্র স্ফটিকে পাতিত করিয়া সেই প্রাতিভাসিক লোহিত স্ফটিক-সাহায্যে বালককে ব্যাবহারিক প্রীতি দেওয়া যায়। এমন কি বিজ্ঞ বৃদ্ধও ত্যক্ত লোহিত, অথচ সেই জন্যই দেখিতে লোহিত, মাণিক্যে মুগ্ধ হইয়া Kle,tomaniac হয়।

খড়ের বাঁঘ বা যাত্রার রাক্ষসী দেখাইয়া দুরন্ত বালককে ব্যাবহারিক ভয়ভীত করা যায়। রজ্জু সর্প দ্বারা প্রবীণগণকেও পলায়নপর করা যায়। দ্রুপদচ্ছায়া প্রাতিভাসিক হইলেও সত্য শীতল এবং পরিশ্রান্তের সত্যধর্ম্ম মোচন করে।

কোনও অজ্ঞ ব্যক্তির সাময়িক অনুপস্থিতি প্রয়োজন হইলে, অশ্বডিম্ব বা কচ্ছপীর দুগ্ধ খরিদ করিবার ছলে, তাহাকে দূরদেশে প্রেরণ করা যায়। আল্‌নস্কর, মনোরাজ্যের দাসীর আহ্বানে, ব্যাবহারিক ক্রুদ্ধ হইয়া ব্যাবহারিক পদাঘাতে ব্যাবহারিক তৈজস চূর্ণ করিয়াছিল।

প্রাতিভাসিক স্বপ্নমধ্যে বালকে ব্যাবহারিক মল-মূত্র ত্যাগ করিয়া থাকে।

আমরা মনে করি যে, আমরা স্বপ্নকে তুচ্ছ বুঝি। তাহা নহে। স্বপ্নস্মৃতিকে বটে তুচ্ছ বুঝি। স্বপ্নবস্তুটাকে, আমরা স্বপ্নকালে সত্য ব্যাবহারিকই বুঝি; তাহাকে কিছুতেই স্বপ্নভঙ্গের উত্তরকালে গোচরে আনিতে পারি না। তখন একটা স্মৃতিরূপ বস্তু পাওয়া যায়; তাহা স্বপ্নকালের স্বপ্ন বস্তুটা নহে। স্বপ্নময়ের স্বপ্ন বস্তুটা, জাগ্রতের বা কোনও কিছুর স্মৃতিরূপ নহে। তাহা সাক্ষাৎরূপ, জাগ্রতরূপ। কুম্ভকার চক্র সাহায্যে যথা জাগ্রতে, অবিকল তদ্বৎই স্বপ্নে কুম্ভকার চক্র সাহায্যেই ঘট নির্ম্মাণ করে। জাগ্রতে লৌহখণ্ড যেরূপ কঠিন ও বাঘ ভয়ানক, তদ্বৎ স্বপ্নেও লৌহ কঠিন ও বাঘ ভয়ানক। জাগ্রতে যথা মানুষ মরিলে তাহার জীবন্ত পুত্রই পিতৃশ্রাদ্ধ করে, স্বপ্নেও তথা মানুষ মরিলে তাহার জীবন্তপুত্রই পিতৃ-

শ্রাদ্ধ করে। জাগ্রতে যথা, ঠিক তথাই স্বপ্নে, সুখে হর্ষ ও দুঃখে বিষাদ! জাগরে যথা সূর্য্যের সহ দিবার, তদ্বৎ স্বপ্নেও স্বাপ্নিক সূর্য্য সহ স্বাপ্নিক দিবার অবিনাভাব। জাগ্রতে যথা গতরাত্রির স্বপ্নালোচনা করি; স্বপ্নেও সেইরূপ গতরাত্রির স্বপ্নালোচনা করি। স্বপ্নকালে অর্থাৎ স্বপ্নকে জাগ্রৎ বুঝিবার কালে,—স্বপ্নগত কেহ যদি আমাকে বলে যে তুমি স্বপ্ন দেখিতেছ তাহাতে বিশ্বাস হয় না। তদ্বৎ জাগ্রৎ কেহ যদি আমাকে বলে তুমি স্বপ্ন দেখিতেছ, তাহাতে বিশ্বাস হয় না।

অত্র একটা সঙ্কেত করিতে হইবে। জাগ্রতে যেমন মানুষ মরিলে তাহার যাবতীয় সম্বন্ধী ও উদাসীনের সহ বিরহ হয়, তদ্বৎই স্বপ্নে মানুষ মরিলে তাহার শত্রু মিত্র উদাসীন সহ বিরহ হয়, স্বপ্নে অন্য কেহ না মরিয়া আমি মরিলে—আমার স্বপ্ন ভঙ্গ হইলে—স্বপ্নগত সকল মানুষই আমাতে দ্রুত মিলাইয়া যায়, এরূপ নিশ্চয়াবধারণ আমার আছে; জাগরে অন্য কেহ না মরিয়া আমি মরিলে—আমার জাগ্রৎ ভাঙ্গিলে—জাগ্রৎগত সকল মানুষই যে আমাতে দ্রুত মিলাইয়া যায়, এরূপ নিশ্চয় বোধ আমার নাই। যদি স্বপ্ন ও জাগর,—অত্যন্ত তুল্য, অবিলক্ষণ হয়, তবে দাঁড়ায় কি? তাহা ভাবিবার যোগ্য বটে।

পূর্ব্বেও বলিয়াছি ও পুনরায় বলিতেছি যে, আত্মাটী মহামৎস্যবৎ? নিজে জানতঃ অজানতঃ অত্যন্ত অশ্লিষ্ট থাকিয়া জগৎনদীর একবার একূল জাগর, একবার অপরকূল স্বপ্ন—এই ক্রম নিয়মে তুল্যরূপে দেখে। কোনও পক্ষপাত করে না; কোনটাতে তত্তৎকালে তুচ্ছ বোধ করে না; দুইটাই তুল্য সত্য বুঝে, "সুখ ও দুঃখের" সহ ভোগ করে। আত্মাই জগৎনদী হইতে বিনির্গত হইয়া অকূল সমান-সমুদ্র সুষুপ্তিতে অবগাহন করে। যে দিন আত্মা জগৎনদীর স্বপ্নজাগর উভয়কূলকে পক্ষপাত না করিয়া, তুল্যরূপে উভয়কে স্বপ্নাভিনয় বোধ সহ দেখিবে

ও "সুখ" সহ "রস" সহ ভোগ করিবে, সেইদিন আত্মা জীবন্মুক্ত ঈশ্বর হইবে।

উক্ত দৃষ্টান্ত সমূহ সাহায্যে স্বপ্নজাগর যে তুল্যরূপ, তাহার উত্তম আভাস পাওয়া যায়। ব্যাবহারিক ও প্রাতিভাসিক উভয়ই ব্যবহার সাধক হওয়ায় তাহারা ভিন্নরূপত্ব ত্যাগ করিয়া একরূপই হইয়া পড়ে। এখন প্রশ্ন এই যে, কোন্ রূপ হইল? যদি উভয়ই সত্য ব্যবহার হয়, তবে আমি "জীব" রহিলাম, আমার ঈশ্বর হওয়া হইল না।

পরন্তু যদি উভই সমান সদাত্মার, স্বানুগত নানা বিশেষরূপে স্বপ্রচার মাত্র—ব্যবহার বটে, আভিনায়িক অসত্য ব্যবহার মাত্র—স্বাপ্নিক প্রাতি-ভাসিক মাত্র বলিয়া "আমির" অনুভূত হয়, তবে "আমি" ঈশ্বর হইব। পরে সমর্থ ঈশ্বর আমি, ইচ্ছা করিলে আমির স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া দিব; আবার ইচ্ছামত নিজ-সত্তা অনুগত রাখিয়া স্বপ্নজগৎ সৃষ্টি করিব। স্বপ্ন ভাঙ্গিবার সময় স্বপ্নগত সকল জীবকে গ্রাস করিয়া লইব; নূতন স্বপ্ন সৃষ্টি করিবার সময় নানা জীব পৃথক তৈয়ার করিয়া তাহাদিগকে tragic comic স্বপ্নজগৎ অভিনয় করিবার জন্য নটরূপে পৃথক পৃথক ভূমিকা দিয়া নিযুক্ত করিব। তন্ত্রমতে নামরূপ সমষ্টি বিশাল সমগ্র জগৎটা অ আ ই ঈ প্রভৃতি ষোড়শ এবং ক খ গ ঘাদি চৌত্রিশ বর্ণে পরিণাম প্রাপ্ত হইয়া ক্রমে পঞ্চাশ বর্ণের মূল ও প্রণবাকার প্রাপ্ত হয় এবং পুনর্ব্বার প্রণবে আসিয়া স্থিতি লাভ করে। প্রণব-গ্রস্ত জগতের পুনরুত্থান হয় না, যদি প্রণব নিজে, তাহারও মূল অহমাত্মাতে মিলাইয়া যায়। বেদান্ত এই কথাটা অন্য ভঙ্গীতে বলে যে, আমি যদি আর পুনরায় স্বপ্ন সৃষ্টির ইচ্ছা না করি তবে ইচ্ছারূপ অস্তিবিশেষেও যে অনুগত সত্তা আছে তাহাকে আকর্ষণ করিয়া, স্বপ্নসৃষ্টির ইচ্ছাকেও পুনরুত্থান রহিত ও নষ্টাৎ করিব। সেইবারে সকল জীব ও সকল

জীবের জন্মদাতা "আমি"র ইচ্ছাশক্তি উভয়েই সমান "আমি"তে প্রবেশ করিয়া মুক্ত হইবে। জীবগণ ভূমিকা অভিনয় করিবার জন্য আর নিযুক্ত বদ্ধ হইবে না, থাকিবে না। তখন আমি কেবল, আসল—নির্দোষ পারমার্থিক সত্তা, অসাক্ষী, সমান, অদ্বয়, অভয়, স্বস্থ, আত্মা হইব।

প্রথম রকমটা অঙ্গীকার করিলে অর্থাৎ ব্যাবহারিকটা ত সত্যই বটে এবং প্রাতিভাসিকে যখন ব্যবহার নিষ্পত্তি হয় তখন তাহা ও ব্যাবহারিকই ও সত্যই বটে, এরূপ বুঝিলে একের মুক্তিতে সকলের মুক্তি ঘটে না! এবং কোনও এক জনের মুক্তিই বা কিরূপ বস্তু তাহার অবিসংবাদিত নির্ণয়ও হয় না। এই মতেরও দৃষ্টান্ত আছে। [জগতে সকল মতেরই পোষক দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। কিন্তু দৃষ্টান্তদ্বারা কোনও মতের প্রতিপাদন হয় না। প্রস্তাবিত মতকে পরিষ্কার করিয়া বলা হয় মাত্র। মনে রাখিতে হইবে যে, মতের গুরুত্ব মতের সত্যতার উপরই স্থাপিত; দৃষ্টান্তের উপর নহে। দ্রৌপদী সতী বটে কিন্তু পাঁচটী স্বামী সংগ্রহ করা-সতীর নির্দ্দিষ্ট লক্ষণ নহে। সীতার জন্য বৃহৎ রাজ্য বৃহৎ বংশ ত্যাগ স্বীকারই রাবণের প্রীতির পরিচায়ক নহে। রাবণ কামদাস ছিল। কিন্তু রাম, সীতা-বর্জ্জন করিয়াও, সীতাপ্রিয় ছিলেন। বিভীষণ কুলদ্রোহী ও প্রহ্লাদ পিত্রাজ্ঞালঙ্ঘনকারী বলিয়া আমাদিগকে গোয়েন্দা হইতে হইবে না এবং পিতাকে অবজ্ঞা করিতে হইবে না।]

দুই একটি দৃষ্টান্ত উদাহৃত করিব। অনেকের ফাঁসীর হুকুম হইয়াছে, এমন সময় একজনের মুরব্বি থাকায় তাহার ক্ষমাপত্র আসিল; সেই মুক্ত হইল। অপর সকলে বদ্ধ রহিল।

স্বয়ম্বর সভায় সকলেই যজ্ঞসম্ভবা অনিন্দ্যসুন্দরী দ্রৌপদী-প্রার্থী। দ্রৌপদী অর্জ্জুনের গলে বরমাল্য দিল। দ্রৌপদীকে পাইয়া অর্জ্জুন আকাঙ্ক্ষামুক্ত হইল; অপর সভ্যগণ বদ্ধ সন্তপ্ত রহিল। অর্জ্জুন সুবোধ

শান্ত বালক ;. অপর চারিটী ভ্রাতাকে মুক্তিভোগ করিতে দিল। তাহারা বিনা পরিশ্রমে মুক্তিকে পাইল। পঞ্চপাণ্ডব ব্যতীত সকলেই বদ্ধ রহিল। এক স্থানে বহু ব্যক্তি শীতল সুগন্ধ মলয়ানিল সেবনে সুখে মত্ত মুগ্ধ বদ্ধ ছিল। তন্মধ্যে এক ব্যক্তি শীতলস্পর্শ বায়ু সহ্য করিতে না পারিয়া গৃহমধ্যে উঠিয়া গেল ;—সে দল হইতে মুক্ত হইল ; দলস্থ অপর সকলে মলয়-পবন সেবনে সুখে বদ্ধ রহিল ; মুক্ত হইল না।

এইরূপ নানা দৃষ্টান্ত-সাহায্যে শিশু-পণ্ডিতগণ মুক্তির আলোচনা করেন ; তাঁহাদিগকে মুক্তি শব্দের অর্থ জিজ্ঞাসা করিলে ঠিক বলিতে পারেন না, প্রত্যুত্তর দানে চেষ্টা করিলে রসনাতে জড়তা অনুভব করেন ও কখন বা বলেন আগামী কল্য মুক্তির সংজ্ঞা একটা তৈয়ার করিয়া দিব, অথবা বলেন যে আমরা বৃদ্ধ বক্তা তোমরা নবীন শ্রোতা, আমাদের কথা তোমরা এক্ষণে বুঝিতে পারিবে না ; দেখ আমাদের মস্তকে জটা আছে ; তোমাদের নাই।

পরমত পরীক্ষা প্রসঙ্গে দেখাইয়াছি যে কপিল, রামানুজ বুদ্ধাদি প্রবীণ গণ মুক্তি শব্দার্থে কেহ সুখাবাপ্তির অনুল্লেখে দুঃখ নিবৃত্তি মাত্র, কেহ বা দুর্ব্বোধ কিছু, কেহ বা আত্মহত্যাকে বুঝিয়াছিলেন। সুদীন ভক্ত ও মহাবীর বৈদান্তিক এই দুই ব্যক্তি মাত্র বলিতে চাহেন যে, সুখত সুখই এবং দুঃখও দুঃখ রূপ নহে, তাহাও রসরূপ অর্থাৎ সুখরূপ ; এবং বলেন যে, এই ব্যাপারটীর অপরোক্ষানুভূতিই ভক্তের মুক্তি ও বৈদান্তিকের মুক্তি-জননী।

বেদান্তবীর ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য কপিল বুদ্ধাদি প্রধান মল্লগণকে আস্‌মান্ দেখাইয়া ক্ষুদ্র পালোয়ান দিগকে গণ্য করেন নাই।

বেদান্তমতে ব্যাবহারিক ও প্রাতিভাসিক উভয়েই তুল্যরূপ এবং তাহা প্রাতিভাসিক রূপ, tragic বা comic উভয়তঃ রসরূপ, অসত্য—ব্যবহার

রূপ, অভিনয় রূপ, ; স্বপ্নরূপ, অব্যবস্থিত রূপ ; তাহা সুস্থিররূপ, সত্য ব্যবহার রূপ কিছু নহে। কথাটার আরও একটু অধিক পরিমানে চর্চ্চা করিতে হইবে।

উভয়েরই ব্যবহার সম্পাদকতা আছে বলিয়া, ব্যাবহারিক ও প্রাতিভাসিক একরূপ হইল। হয় উভয়েই ব্যবহারিক, না হয় উভয়ই প্রতিভাসিক। কোনটা সত্য? HIT IS ONE, MISS IS MANY। সত্যটা লক্ষ বেধের মত নির্দ্দিষ্ট একরূপ। মিথ্যাটা লক্ষ্যভ্রষ্ট হওয়ার মত লক্ষ্য স্থলের দক্ষিণ বাম, নিকট দূর হিসাবে বহুরূপ। বেদান্ত মতে ইহাই সত্য যে, কি স্বপ্ন কি জাগর উভয়ই প্রাতিভাসিক, অসত্য ব্যবহার—অভিনয়বৎ ; সত্য ব্যবহার রূপ ব্যাবহারিক নহে। জগৎটা সত্য ব্যাবহারিক যদি হইত তবে জগৎগত দুঃখ "সত্যই" দুঃখরূপ হইত এবং মুক্তি শব্দ অর্থশূন্য হইত। সত্যকে ত্যাগ করা যায় না, সত্য হইতে মুক্তি হয় না ; সত্যের সত্যত্বই এই যে তাহা অনতিক্রমনীয়, অলঙ্ঘনীয়। দুঃখটা জগৎটা ও জগৎগত দুঃখটা সত্য হইলে তাহা অশক্য নিষেধ সদাপ্রাপ্ত, না—ছোড় বান্দা, দণ্ডায়মানথাকিত এবংতাহার হস্ত হইতে সুতরাং পরিত্রাণ ঘটিত না। ভাগ্যাশতঃ সমগ্র জগৎটা প্রাতিভাসিক, অকিঞ্চিৎকর, মিথ্যা স্বপ্নবৎ বলিয়াই মুক্তির সম্ভাবনা আছে। মিথ্যাটা অতিক্রমনীয় দুর্ল্লঙ্ঘ্য হইলেও অলঙ্ঘ্য নহে। দুঃখটা মিথ্যা, আভিনয়িক এবং আসলে রসরূপ বলিয়াই ত আশা আছে যে তাহা একদিন না একদিন অপরোক্ষীকৃত হইতে পারিবে।

শিরশ্ছেদ সত্য হইলে তাহার চিকিৎসা নাই। অভিনয়ের হইলে বটে ছিন্নশিরের উত্থানও তামাকু সেবন সম্ভাবনা আছে। কপিল বলেন জাগরটা সত্য, স্বপ্নটা মিথ্যা; জাগরের বস্তুতে মমত্ব ত্যাগ করিয়া অসঙ্গ হও,তবেই দুঃখ নিবৃত্তি হইবে। বেদান্ত বলে জাগরটা সত্য হইলে দুঃখ নিবৃত্তি হয় না। মমত্ব ত্যাগ করিয়া গোটাকতক বস্তু হইতে অব্যাহতি পাইলেও পূর্ণ নিষ্কৃতি নাই; মাধ্যাকর্ষণ হাড় ভাঙ্গিবে, অগ্নি পোড়াইবে। জাগরটাতেও স্বপ্ন বোধ হওয়া চাই। তবে TRAGEDY COMEDY দুইই রসরূপ হইবে, দুঃখ নিবৃত্তি ও হইবে। [অত্র ভক্ত বলেন যে চুলোয় যাউক কাপিলমতে জগতের অংশে সত্যত্ব, অংশে মিথ্যাত্ব; বা বেদান্ত মতে জগতের সমগ্র অংশে মিথ্যাত্ব। আইস আমরা ব্রজে যাই; জগতে অমনোযোগ আপনিই হইবে; হয় গোবিন্দের কাছেই যাইব, সুখে থাকিব; না হয় গোবিন্দ একটু দূরেই থাকিবে,—কাঁদিব। ব্রজের বাহিরে ত গোবিন্দের একপদও গতি নাই; আমরা ক্ষণিক বিরহের পরে আমাদের গোবিন্দকে আবার ত পাইবই।

যে বালক অভিনয়কে সত্য ব্যাবহারিক মনে করিত, সেই বালকই বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া অভিনয়কে, পূর্ব্বে যে পরিমাণে সত্য মনে করিত; ঠিক সেই পরিমাণেই প্রাতিভাসিক মনে করিবে। আমরাও বালক; জগৎটাকে সত্য মনে করিতেছি; বিচার-বৃদ্ধ হইলে জগৎটাকে প্রাতিভাসিক বুঝিব আশা রাখি। যে কেহ একজন তাহা বুঝিবে, অপরোক্ষ করিবে, সে জীবন্মুক্ত ঈশ্বর হইবে। জগৎটা তাহার দৃশ্য কাব্য হইবে। সে সেই দৃশ্য, উদাসীনের মত দেখিবে অথবা বীরাদ্ভুতাদি রসসমৃদ্ধ বিচিত্র

অভিনয়টী দেখিবার কালে সুখেই রসাস্বাদ করিতে থাকিবে; দুঃখ কিছু যে নাই তাহা বুঝিতে পারিবে; অভিনয়ের সীতার বনবাসাদি হইতে হৃদয়ে যে বেদনানুভূতি হইবে, তাহার সুখরূপত্ব বিষয়ে কোনও সংশয়ই হইবে না। যখন তাহার অভিনয় সংবরণ করিতে ইচ্ছা হইবে তখন তাহার সেই সংবরণে সকল জীবই সংবৃত, সংগৃহীত হইয়া নটন ত্যাগ করিয়া, নটন মুক্ত হইয়া সুপ্ত হইয়া ঈশ্বরত্ব বিহীন যে সমান আত্মা সেই আত্মাতে সমান হইয়া যাইবে।

ধর, এক পুতুল-নাচওয়ালার এককুড়ি পুতুল। সে একদিন একান্তে একা নিজে খেলা করিবার জন্য, খেলা দেখিবার জন্য, জনশূন্য দেশে গেল। পঞ্চদশ পুতুলকে দর্শক করিল; পাঁচটীকে অভিনয় করিতে নিযুক্ত করিল। যাহারা দর্শক পুতুল তাহারা মধ্যে মধ্যে বাহবা দিতে লাগিল, ও রঙ্গালয়ের বাহিরে গরম চা পানাদি করিতে উঠিয়া যাইতে লাগিল। কিন্তু কি নটগণের নটন, কি দর্শকগণের দর্শন ও চা পানাদি সকলটাই "এক" স্বাধীন পুতুল নাচওয়ালার অধীন। সকল পুতুলের সূত্র তাহারই হস্তধৃত এবং তাহাদের পরস্পর কথাবার্ত্তাও সেই "এক" পুতুলনাচওয়ালার মুখ নিঃসৃত বাণী। তদ্বৎ স্বাধীন ঈশ্বর সেই এক পুতুলনাচওয়ালা; বক্রী Judy, Punch ও দর্শক সমষ্টি ও তাহাদের জগৎ-ব্যবহার তদধীন। এই দৃষ্টান্তে একটু দোষ এই যে, পুতুলনাচওয়ালা পুতুলের অঙ্গচালনা ও কথাবার্ত্তার উপাদান বটে; কিন্তু পুতুলের দেহের উপাদান নহে। স্বপ্ন দৃষ্টান্ত এস্থলে অত্যন্ত নির্দ্দোষ। স্বপ্ন-দ্রষ্টা স্বপ্নগত স্বপর দেহেরও উপাদান এবং স্বপ্নগত দেহীগণের অঙ্গ চালনা, অনালাপ, সদালাপ, প্রলাপ, বিলাপেরও উপাদান। নাচ প্রত্যাহারে পুতুলগুলি পেটরার ভিতরে থাকে; স্বপ্নটী প্রত্যাহৃত হইয়া একেবারে দ্রষ্টার ভিতরে মিশিয়া যায়। পুতুল নাচওয়ালা পুরাতন পুতুল লইয়া এবং দ্রষ্টা নূতন স্বপ্ন সৃষ্টি করিয়া পুনঃ পুনঃ খেলা করে।

কাব্যগত যাবতীয় নট ও নটন, সকলটাই কবি স্বয়ং। দশরথ ও বাল্মীকি; রামও, সীতাও, হনুমানও প্রত্যেকে সকলেই বাল্মীকি। জগৎ-কাব্যটাও তদ্রূপ স্বয়ং "আমি" মাত্র।

কিন্তু জগতের অংশ বিশেষে অর্থাৎ যাহাকে "জাগর" বলা যায়, তাহাতে সত্য বোধ আমাদের বড়ই দৃঢ়াভ্যস্ত। ইহার উচ্ছেদ ও বিপরীত বোধটীর, অর্থাৎ সমগ্র জগতে প্রাতিভাসিকবোধটীর উদ্বোধন, অপরিমিত-যত্ন-সাধ্য-চিত্ত-শুদ্ধির অপেক্ষা রাখে। পূর্ব্বসংজাত অভ্যাসের শাসন অতিক্রম করার মত, দুঃসাধ্য কর্ম্ম কমই আছে। একে ত সংসারে সত্যবোধ ত্যাগ করিতে ইচ্ছাই হয় না; যদিই বা ইচ্ছা হয়, সেই সত্যবোধটী ত্যাগ করিতে হঠাৎ পারাই যায় না।

দশের সঙ্গে মিত্রভাবে বা শত্রুভাবে বসবাস করার অভ্যাস এতটা মজ্জাগত হইয়াছে যে, আমরা যেখানে লোকের মুখ দেখিতে পাওয়া যায় না, একাকী সেই নির্জ্জন দেশে বহুদিবস বা অল্পকাল বাস করিবার প্রস্তাবে অনুমোদন করি না,—ভয় পাই ও বিমুখ হই। ঠাণ্ডা গারদের তুলনায় অন্য যে কোন অবস্থা আমাদের বিবেচনায় উপাদেয় বোধ হয়; জগৎটাতে প্রাতিভাসিক বোধ জন্মিলে পাছে নিকট ভবিষ্যতে ভয়ঙ্কর-অভয়, বিজন মুক্তিই বা ঘটে, সেই ভয়ে আমরা জগতে প্রাতিভাসিক বুদ্ধির উদয়কে ইষ্ট বিবেচনা করি না; জগতে পূর্ব্বাভ্যস্ত সত্যবোধরূপ শাসন অতিক্রমণে আমাদের রুচি হয় না; বরং জগতে সত্যবোধ যাহাতে দৃঢ়তর হয় তাহারই আয়োজন অনুষ্ঠান করি। বাঁচিয়া থাকিয়া অনিত্য স্রক-চন্দন-বনিতা সংগ্রহের নানা উন্মত্ত পাপ চেষ্টাতে এবং মরিবার পরেও যেন কীর্ত্তি কিছু থাকে, ঘটা করিয়া শ্রাদ্ধ হয়, তাজ মহলের মত কবর হয়, অন্ততঃ পক্ষে সহরের কোন দীঘির কোন কাগাসন পাথর হইয়া বসিতে পাওয়া যায়, ইত্যাদি কতকগুলা তুচ্ছ বস্তু

প্রাপ্তির বৃথা চেষ্টাতে, ভস্মাহুতির মত দুর্লভ মানব জন্ম নিষ্ফল করি। কিন্তু ইষ্ট হইতেছে জগৎকে প্রাতিভাসিক বুঝা। তবে ত দুঃখ যে আভিনয়িক মাত্র তাহা ধার্য্য হইয়া যাইবে এবং সুতরাং দুঃখেরও সুখ রূপত্ব রসরূপত্ব বুঝা যাইবে।

আমাদের দৃঢ় পূর্ব্বাভ্যাসকে, বহু যত্নে, দৃঢ়তর নূতন অভ্যাস দ্বারা পরাজয় করিতে হইবে।

এক রাজা এক ফকীরকে ভক্তিসহ মুক্তামালা প্রদান করিলে, ফকীর পদস্পর্শে মুক্তামালাকে দূরে নিক্ষেপ করিল। রাজা ক্রুদ্ধ বা ক্ষুব্ধ হইয়া ফকীরকে মুক্তার মালা দুর্গন্ধ প্রমাণ করিতে বলিল। ফকীর বলিল, রাজা উঠ; আইস আমার সঙ্গে। ফকীর রাজাকে লইয়া নানা স্থানে ভ্রমণ করাইয়া, হঠাৎ কসাই-বস্তিতে স্থির হইয়া দাঁড়াইল। রাজা মৃত জন্তুর বাস-গন্ধ সহ্য করিতে অসমর্থ হইয়া বলিল যে, ফকীর সাহেব, চল চল অন্যত্র দূরে চল, অত্র বড়ই দুর্গন্ধ। ফকীর বলিল, দেখ, কসাই-পরিবার, তাহাদের পুত্র পত্নীগণ অত্রই বসিয়া কেমন সুখে গৃহকার্য্য, গীতালাপ, পাশ ক্রীড়াদি করিতেছে, তাহারা ত দুর্গন্ধানুভব করিতেছে না। রাজা বলিল তাহাদের বসা দুর্গন্ধ অভ্যাস হইয়া গিয়াছে সুতরাং তাহা তাহাদের এক্ষণে দুঃখ-প্রদ নহে। ফকীর বলিল, রাজা তোমারও মণি মুক্তার দুর্গন্ধ অভ্যাস হইয়া গিয়াছে। তাই তুমি মুক্তার দুঃখদ দুর্গন্ধ অনুভব করিতে পার না; আমি মুক্তাতে দুর্গন্ধ অনুভব করি।

পাঠক পাঠিকা! বেদান্তের অনুরোধ এই যে, ব্যাবহারিক জগৎ-মুক্তাতে যাহাতে আবার দুর্গন্ধানুভূতি হয় তাহারই চেষ্টা কর। পায়ের ঢেঁকী চপেটাঘাতে উঠিবে না। মেহনৎ চাই; জগৎটাকে তুচ্ছ প্রাতিভাসিক বুঝিতে যতটা কঠিন শ্রম সাধনা, অভ্যাস, সাধুসঙ্গ, সংযম, বিচার প্রয়োজন, তাহা অকপটে, সমাদরে, তদেকনিষ্ঠ হইয়া লোলুপ

আগ্রহ সহকারে, সবহুমান, অপ্রমত্ত, সদাজাগ্রৎ থাকিয়া স্বীকার কর, যেহেতু 'আত্মা বলহীনের লভ্য নহে'। জগতে অভিনয় বোধ জন্মিলে কি **Comedy** কি **Tragedy** উভয়ই সুগন্ধ, মনোরম, রসরূপ হইবে। জগতে স্বপ্নাভিনয় বোধ যাহারই হইবে, সে জীবন্মুক্ত ঈশ্বর হইবে এবং ঈশ্বরের বিদেহ হইবার সময়ে অপর সকল জীবই সেই বিদেহগত ও মুক্ত হইবে।

বিদেহ আত্মার দৈর্ঘ্য প্রস্থ বেধ নাই, সুতরাং ইহাকে ক্ষুদ্র বা বৃহৎ বিশেষণে বিশিষ্ট করা যায় না। কিন্তু আশ্চর্য্য এই যে, বৃহৎ, কেন অনন্ত, আকাশকে ও আকাশের দৈর্ঘ্য প্রস্থ বেধকে আত্মাই নিজ সত্তা কর্জ্জ দিয়া দণ্ডায়মান রাখিয়াছে এবং আত্মা এই আকাশকে এবং আকাশ গর্ভস্থ কালদেশে অবস্থিত, নদীপর্ব্বত জীবজন্তু ও কালে অবস্থিত সুখশোকাদিকে,—তত্তৎ বস্তুতে কর্জ্জদেওয়া সত্তা ফিরাইয়া লইয়া—নস্যাৎ করিতে পারে। উপস্থিত নস্যাৎ না করিয়া সুষুপ্তিতে গিলিয়া ফেলে ও তত্র বীজরূপে রাখে, যথা বরফকে জলরূপে, ঘটকে মাটীরূপে, সর্পকে রজ্জুরূপে তথা জল মাটী রজ্জুকে সুষুপ্তিরূপে। ইচ্ছা করিলে আত্মা, বীজে অর্থাৎ সুষুপ্তিতে অনুপ্রবিষ্ট নিজসত্তাকে প্রত্যাহার করিয়া সুষুপ্তিকে ও নস্যাৎ করিয়া, সুষুপ্তি হইতে জগতের পুনরুত্থান সম্ভাবনা রহিত করিতে পারে। তাহা হইলে আত্মাতে জীবজন্তু সহ প্রাতিভাসিক জগতের চরম তিরোভাব, মুক্তি, অবগাহন, শান্তি, পরিসমাপ্তি হইবেই।

কোনও "এক" টী মাত্র জীব যথাপ্রাপ্ত ব্যাবহারিক জগৎটাকে প্রাতিভাসিক বুঝিয়া জীবত্ব-মুক্ত, ঈষদ্বদ্ধ ঈশ্বর হইবে এবং সেই ঈশ্বর প্রাতিভাসিক জগৎ অভিনয়কে স্বগত, প্রবিলাপিত, করিয়া ঈশ্বরত্ব-মুক্ত বিদেহ ব্রহ্ম বা আত্মা, কেবল অভয় হইবে বা হইব। ইহা ব্যুৎক্রম বিবরণ; তিষ্ঠতু তাবৎ ব্যুৎক্রম-বিবরণম্। ক্রম বিবরণ বলা যাউক।

বোধ হয়, তাহা হইলে কথাটী স্ফুটতর ও সহজে বোধ-গম্য হইতে পারিবে। কি রূপে এই যথাপ্রাপ্ত "ব্যাবহারিক" জগৎটাকে পাওয়া গেল তাহার যে কোনও একটা, বিস্তৃত বা সংক্ষিপ্ত, বর্ণনা কল্পিত হইলে বর্ণনাটির নাম ক্রম-বিবরণ হইবে। তাহা এই যে, ধর, একদা অভয় আত্মাতে আকস্মিক ইচ্ছা হইল যে "জানিতে হইবে যে কে আমি"? এই ইচ্ছাযুক্ত আমির নাম ঈশ্বর। ইচ্ছাশক্তির নানা প্রসিদ্ধ ও অপ্রসিদ্ধ পারিভাষিক নাম আছে; তন্ত্রে তৈত্তিরীয়ে কামাখ্যা, ছান্দোগ্যে ঐতরেয়ে ঈক্ষণ, শ্বেতাশ্বতরে মায়া প্রকৃতি, গীতাতে মহৎযোনি, এবং অন্যত্র আলোচনা, প্রধান, কারণ, শক্তি, মনঃ কল্পনা, অবিদ্যা, তমঃ ইত্যাদি। ইহা আদৌ অন্ধকাররূপ, বস্তুর যাথার্থ্য সম্বন্ধে অগ্রহণাত্মক, আবরণাত্মক,—পরে ক্ষুব্ধ বিক্ষিপ্ত হইয়া ইহা নিজের অগ্রহণাত্মকত্ব বজায় রাখিয়া অধিকন্তু অন্যথা-গ্রহণাত্মক হয়। অন্ধকার রজ্জুকে দেখিতেই দেয় না; মন্দান্ধকার রজ্জুকে দেখায় বটে কিন্তু রজ্জুরূপে নহে, যথার্থরূপে নহে; রজ্জু হইতে অন্যথারূপে, সর্পরূপে বা মালারূপে বা দণ্ডরূপে বা অন্য সদৃশরূপে দেখায়। অন্ধকার ত অন্ধকার বটেই; মন্দান্ধকারও, যাহার অপর নাম মন্দালোক, তাহাও ফলতঃ অন্ধকার। যাহাই বস্তুর যাথার্থ্যাবধারণে বিঘ্ন সম্পাদক, তাহা অন্ধকারই। এই অন্ধকাররূপ ইচ্ছাশক্তির জন্মলাভটী আশ্চর্য্য; তদনন্তর বিচিত্র জগতের নানা বৈচিত্র্যের কোনটাই আশ্চর্য্য নহে। রাম একদিন শ্যামকে বলিল যে, একটা আশ্চর্য্য দেখিয়া আসিলাম; যদুর মাথাটা কাটা যাইবার পরেও যদুর দেহটা দশ পা হাঁটিয়া গেল। শ্যাম বলিল, যে দশ পা যাওয়াটা আশ্চর্য্য নহে, প্রথম পদক্ষেপটাই আশ্চর্য্য। বন্ধ্যার পৌত্রের বিবাহ আশ্চর্য্য নহে, বন্ধ্যার পুত্রই আশ্চর্য্য।

ঈশ্বরাশয় তর্কপটু ইচ্ছাশক্তি, অনতিবিলম্বে আপনাকে ঈশ্বর সমক্ষে

প্রকাণ্ড জগদাকারে বিস্তার করিল। প্রভুঁ আজ্ঞা সমাধান-সমর্থা ও তৎপরা ইচ্ছাশক্তি প্রিয় প্রভুর প্রীতির জন্য নানা নট নটী আকারে আপনাকে বিন্যস্তা করিয়া মিলন বিয়োগান্ত অভিনয় করিতে থাকিল। শক্তিমান্ ঈশ্বর এবং তাঁহার ইচ্ছাশক্তি বিলাস, উভয়ে অভিন্নরূপে চিন্তিত হইতে পারে। যেমন বঙ্কিমচন্দ্র ও তাঁহার ইচ্ছাশক্তি উভয়ে অভিন্ন রূপেই বিলসিত হইয়া মন্দির, ঘোড়া, ঝঞ্ঝা, বিমলা, আয়েষা, উষ্ণীষ গড়মান্দারণ, যুদ্ধ, জগৎসিংহাদি যাহাই বল, সবটা হইয়াছেন। ঈশ্বরের রসাস্বাদ উদ্দেশে ইচ্ছাশক্তি নানা নট নটী রূপে আপনাকে বিবর্ত্তিত করিয়া ঈশ্বর সমক্ষে নানা কৌতুককর, বিচিত্র লীলা প্রকট করে। কখনও প্রত্নতত্ত্ববিৎ সাজিয়া, অল্পায়ুঃ হইয়াও, দণ্ডপল বৎসর বা শতাব্দীকে তুচ্ছ করিয়া, সময়ের বৃহৎ মাপকাটী সাহস পূর্ব্বক প্রস্তুত করে এবং বর্ত্তমান হইতে অশোকস্তম্ভ বা অশোকস্তম্ভ হইতে পিরামিড্ ওর্ক্ বা ভূপৃষ্ঠের স্তর-নির্ম্মাণ দীর্ঘ-কালকে পরিমাণদণ্ড লইয়া দীর্ঘায়ুঃ ব্রহ্মাণ্ডের বয়ঃক্রম স্থির করিবার উদ্যম করিয়া ঈশ্বরকে আপ্যায়িত করে; দুর্ব্বল বালক যথা পিতার সমক্ষে, পিতার অশেষ প্রীতিকর শিশু-সুলভ নানা ক্ষুদ্র উদ্যমে বৃহৎ উৎসাহ দেখায়। কখনও বা সূচীছিদ্রে সংখ্যাতীত প্রাণীর বিদ্যমানতা প্রতিপন্ন করিয়া বিস্ময়রসের অবতারণা করে। কোথাও বা অলস আলাদিন্ সাজিয়া নিরতিশয় অনলসে আশ্চর্য্যদীপানুসন্ধানে জীবন কাটাইয়া দেয়। কোথাও বা সর্ব্বধ্বংসকারী মহাবল অগ্নিকে বুদ্ধি-চাতুর্য্যে ক্ষুদ্র শীতল দীপশলাকা-কৌটায় নিরাপদে বাঁধিয়া রাখে। কখনও বা অনসূয়া প্রিয়ম্বদার স্নেহপালিতা অনাঘ্রাত-অমলা শকুন্তলাকে তুচ্ছ বল্কলেই শোভায়-মান করিয়া সুগভীর রসচতুর মহা-রাজাকে অস্থির চঞ্চল করে। এবং বিরহিনী বালিকার সরল-হৃদয় তুলাদণ্ডে ক্ষুদ্র স্নেহপাষাণী দ্বারা চমৎকার কৌশলে নিষ্ঠুর-কঠিন-দুর্ব্বাসা-সমাকুল গুরুভার বিপুল

পৃথ্বীকে অনাদর ও লঘু করিয়া ঈশ্বরের বিনোদ-মহোৎসব সৃষ্টি ও বর্দ্ধন করে। অভিনয়ে ঈশ্বরের সুখই হয়, দুঃখ হয় না; দুঃখ অভিনয়ের বলিয়া রসপোষক ও সুতরাং রসরূপই।

এখন ঈশ্বর বুঝিলেন যে "কে বটে আমি"? তিনি বুঝিলেন যে ইচ্ছাশক্তি-বিস্তার রূপ প্রাতিভাসিক, অভিনয় জগৎটা সাক্ষ্য এবং "আমি" তাহারই সাক্ষী। আমি জগৎ প্রতিসংহার করিলে, সাক্ষ্য-লোপে আমির সাক্ষিত্বও অবশ্য লুপ্ত হইবে; আমার ঈশ্বর নামটা লুপ্ত হইবে; কিন্তু তথাপি আমি যেমন ছিলাম তেমনই থাকিব; শিখা নষ্টে শিখী নষ্ট, কিন্তু পুরুষ অনষ্টই থাকে।

এই কথাই বুঝিতে থাকিবার কালেই, ঈশ্বরের জগৎ অভিনয় দেখিয়া রসাস্বাদ হইবার সময়েই, একটা বড় বিপদ ঘটিয়া গেল। মায়াবিনী ইচ্ছাশক্তি নানা অভিনয়ের মধ্যে একটা অন্যতম, নিম্নলিখিত অভিনয়টী ঈশ্বরকে দেখাইল। প্রণয়-তরলা মায়াবিনীর বোধ হয় কোন মন্দ অভিসন্ধি ছিল না; প্রিয়তম ঈশ্বরের সুখ সাধনাভিপ্রায়েই সে নিম্নে লিপিবদ্ধ রচনাটী প্রস্তুত করিয়াছিল।

রাম মদ খাইয়া অপবিত্র স্থানে বেহুঁস হইয়া পড়িয়া আছে। একটা কুক্কুর রামের বদন চুম্বন করিতেছে এবং রাম তাহাতে মৃদু মধুর হাস্য করিতেছে। গোবিন্দ প্রত্যহ গোলাপি নেশা করিত; তাহার বুদ্ধির লোপ হইত না, একটু উল্লাস মাত্র হইত। কিন্তু কুক্কুর-চুম্বনে রামের মধুর হাস্যবিকাশ দেখিয়া গোবিন্দের লোভ জন্মিল; রাম যে মহানন্দ উপভোগ করিতেছে তাহাই অপরোক্ষ করিবার বলবতী ইচ্ছা গোবিন্দের হইল। গোবিন্দ বুদ্ধিমান; সহায় স্বরূপ প্রভুভক্ত বিশ্বাসী ভৃত্যকে রক্ষকরূপে সঙ্গে করিয়া শৌণ্ডিক সমীপে গমন পূর্ব্বক চোখা মদিরা যাচ্ঞা করিল; বলিল যে, যে নির্জ্জল, তীব্র, সারবান্ মদিরা রামকে দিয়াছ, তাহাই দাও।

শৌণ্ডিক তাহাই দিল ; গোবিন্দেরও ঘোর নেশা হইল ; আত্ম স্বরূপ-বিস্মৃতি হইল ; সে বড় দুরন্ত অবাধ্য হইয়া নানা উৎপাত করিতে লাগিল। কিন্তু ভক্ত ভৃত্য, প্রভু গোবিন্দের সকল দৌরাত্ম্য সহ্য করিয়া গোবিন্দ-সঙ্গে নানা মেধ্যামেধ্য স্থলে যাইয়া যে পর্য্যন্ত না গোবিন্দ প্রকৃতিস্থ হইল ততকাল গোবিন্দ-সহচর থাকিয়া শেষে গোবিন্দকে স্বধামে পহুঁছাইয়া দিল।

ঈশ্বর উক্ত অভিনয় দেখিয়া উন্মত্ত হইয়া উঠিল। বুঝিল যে জগদ-ভিনয়ের নকল রাম নকল সীতা হারাইয়া নকল করুণ বিলাপে যে জাতীয় সুখ দিতেছে, যদি সত্য রাম সত্য সীতাকে হারাইয়া সত্য করুণ বিলাপ করে, তবে বুঝি তাহা দেখিয়া শুনিয়া তদপেক্ষা উত্তম জাতীয় এবং স্বাদুতর রসাস্বাদ হইতে পারিবে। ঈশ্বর ইচ্ছাশক্তিকে বলিল যে, বটে সত্য ব্যাবহারিক জগৎ কিছু নাই, কিছু থাকিতে পারেই না ; তুমি কিন্তু আমার ভ্রম জন্মাইয়া দাও, যেন আমি এই প্রাতিভাসিক অভিনয় জগৎটাকেই সত্য ব্যাবহারিক বিবেচনা করিতে পারি। উক্ত গোবিন্দের মত ঈশ্বর বলিল "হে ইচ্ছাশক্তি, আমার আজ্ঞায় তুমি আমাকে চোখা মদিরা দাও।" ইচ্ছাশক্তি বলিল আপনার যথা আজ্ঞা তাহাই হইবে। ঈশ্বর ব্রহ্মরূপ, উন্মত্ততা রূপ, মদিরাপাত্র হস্তে লইয়া পান করিবার পূর্ব্বেই—নেশা পাছে দুর্ব্বার হয়, পাছে ভ্রম দৃঢ় হয়, তাই ইচ্ছাশক্তি দ্বারা রক্ষক স্বরূপ বিশ্বস্ত আচার্য্য নির্ম্মাণ করাইয়া, তাঁহার হস্তে আত্ম-সমর্পণ করিলেন ; নিজ সম্পত্তি পেটিকার গূঢ়দেশে গূঢ় উপায়ে কুঞ্চিকা প্রয়োগ কৌশলে আচার্য্যকে শিক্ষা দিয়া কুঞ্চিকা আচার্য্য হস্তে প্রদান করিলেন। মদ্যপানের পর স্বেচ্ছায় ভ্রম স্বীকারের পর, আর ঈশ্বর নাই ; তখন তিনি ভ্রান্ত, উন্মত্ত, "এক" ব্যাবহারিক জীব। "সমগ্র" জগৎটা যে স্বপ্নাভিনয় মাত্র তাহা তাঁহার আর মনে নাই ; কিয়দংশ সত্য ব্যাবহারিক ও কিয়দংশ

স্বপ্ন দ্বিচন্দ্রাদি, তুচ্ছ প্রাতিভাসিক এই ভাবে, “এক” জীব, জগৎকে দর্শন করিতে লাগিলেন এবং এখনও করিতেছেন। সেই “এক” জীব, স্বপ্নাভিনয় গত অন্য যাবতীয় জীবগণ সহ তুলনায়, আপনাকে ঠিক তাহাদেরই মত একজন, তাহাদেরই মধ্যে অন্যতম একজন, বুঝিতে লাগিলেন। বালক যথা দর্পণগত প্রতিবিম্বে বিম্ববোধ করে। নিজ বিলাস মাত্র জীবগণের সহ, স্বাপ্নিক নটগণ সহ, স্বয়ং বিলাসীটী, স্বেচ্ছায় ভ্রম অঙ্গীকার করিয়া, এক শ্রেণীভুক্ত হইয়া রহিলেন। পাঠক পাঠিকা হুঁসিয়ার হইয়া বুঝিয়া লউন যে, ঈশ্বর উপস্থিত থাকিয়াও নাই; তৎপরিবর্ত্তে পাওয়া যায় “এক” ভ্রান্ত জীব এবং নানা নট জীব। ভ্রম যদি ঘুচে তবে “এক” ভ্রান্ত জীবই ঈশ্বর হইবেন ও নানা নট জীব যে অভিনয়ের প্রাতিভাসিক, কল্পিত, স্বাপ্নিক জীবমাত্র, তখন ঈশ্বর তাহা বুঝিবেন। উপস্থিত মহা মুস্কিল এই যে, জগৎগত নানা জীবগণের মধ্যে কোনটী সেই ভ্রান্ত-ঈশ্বর “এক” জীব, তাহার অব্যর্থ নির্দ্দেশ কিছুতেই হইতে পারে না। গ্রন্থকারও সেই “এক” জীব হইতে পারে, কোনও পাঠকও হইতে পারে, কোনও পাঠিকাও হইতে পারেন। গ্রন্থকার যদি আপনাকে সেই “এক” জীব মনে করে তবে তাহার কোনও অপরাধ হইবে না। অন্য কেহ আপনাকে সেই “এক” জীব মনে করিলে তাহারও কোন অপরাধ হইবে না।

ঈশ্বর নিযুক্ত আচার্য্যের হস্তে রহস্যের চাবি, আচার্য্যই এখন জগৎঝটিকাতে একমাত্র ভরসা-নঙ্গর। উপস্থিত আচার্য্যই সর্ব্বপেক্ষা গুরু বস্তু। ঈশ্বর তদপেক্ষা তত্ত্বতঃ গুরুতর বটে; কিন্তু তিনি থাকিয়াও ত নাই। এখন তিনি “এক” ভ্রান্ত জীব হইয়া স্বনিযুক্ত অভিভাবক গুরুর অধীনস্থ হইয়া রহিয়াছেন। আমরা সুতরাং পূজা করিবার জন্য ঈশ্বরকে খুঁজিয়া পাইব না; যাহা কিছু পূজা আমাদের কর্ত্তব্য তাহা

হিতকারী গুরুরই পূজা। গুরুর পূজাই, ঈশ্বরের পূজা অপেক্ষা, অগত্যাই বর্ত্তমানে পরম শ্রেয়ঃ।

ঈশ্বরনিযুক্ত গুরু, "এক" ভ্রান্ত ঈশ্বরকে, যথাঅধিকার, উপদেশ দিবার জন্য নানা স্থলে চার্ব্বাক কপিল বুদ্ধাদি নানা ছদ্মবেশে বসিয়া—শিষ্যকে ক্রমোপদেশ পথে বেদান্তে আনিয়া ফেলেন। শিষ্য নিম্নাধিকারে অভয়সুখপ্রার্থী। গুরুর উপদেশে, ক্রমে শুদ্ধচিত্ত হইয়া, ভবিষ্যতে দুঃখে পতন-ভয়যুক্ত সুখের অবস্থা যে সুতরাং অভয় নহে,অভয় সুখ বলিয়া কিছুই নাই তাহা বুঝিতে পারে এবং অভয় স্বাস্থ্যই যে অভয় তাহা হৃদয়ঙ্গম করিয়া অভয় সাস্থ্য প্রাপ্তির উপায় জিজ্ঞাসা করে।

বিশ্বস্ত ও নিযুক্ত গুরুটী, ঘড়ীতে প্রভুবদ্ধ alarmবৎ, নিদ্রিত প্রভুকে যথাসময়ে প্রবুদ্ধ করিতে বাধ্য আছেন।

গুরুটী মহারাজের নিজ নিযুক্ত অভিভাবক guardian ; মহারাজ স্বেচ্ছায় নাবালক সাজিয়াছেন ; তিনি পুনরায় সাবালক হইলে গুরু তাঁহার অক্ষুণ্ণ পূর্ণ সম্পত্তি অবশ্যই তাঁহাকে বুঝাইয়া দিয়া প্রত্যর্পণ করিবেন।

ঘুমন্ত প্রভুকে প্রাতে জাগাইবার জন্য গুরু নহবৎখানার রৌশন-ভেরী। গুরু, সদাবিনিদ্র, সজাগ, থাকিয়া যথাসময়ে ভোরে ললিতরাগে তত্ত্বমসি ভেরী বাজাইবেন।

গুরু দেহ-বংশীতে সদাস্ফুরিত অজপা-রূপ সংকেত-সঙ্গীত।

আমরা অনেকে প্রত্যেকে আপনাকে সেই "এক" জীব মনে করিয়া সুদূর অতীত কালপ্রান্ত হইতে এতাবৎ যথাসাধ্য বেদান্তালোচনা করিয়া আসিতেছি। ফল কিছুই হয় নাই। শ্রীকৃষ্ণ নিজ স্বপ্ন সংহারকল্পে সমগ্র যদুবংশ স্বগত করিয়াছিলেন বটে ; শ্রীরাম সমস্ত অযোধ্যাবাসীকে বৈকুণ্ঠে লইয়াছিলেন বটে ; কিন্তু তাঁহারা সমগ্র জগৎ গ্রাস করিতে পারেন নাই। আমরা গ্রস্ত বা অস্তমিত হই নাই ; আমরা এখনও জগতে

বিচরণ করিবার জন্য আছি ; রামকৃষ্ণ কোথায় ভাসিয়া ডুবিয়া গিয়াছেন। মনে রাখিতে হইবে যে গোকুলানন্দ কৃষ্ণ ও দ্বারকানাথ পৃথক্ ব্যক্তি।

সুগ্রীব বলিয়াছিলেন যে, সীতা-সংবাদ না লইয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিলে তিনি, যমের মত, সকল দূতকে সংহার করিবেন। প্রাণভয়ে ভীত, দলস্থ, সকলেই মহাতান্ত্রিক হনুমানকে সীতা সন্ধানের জন্য অনুরোধ করিয়াছিলেন। হনুমান্, "রাম" নাম বলে, পঞ্চভূতকে পরাভূত ও পলায়নপর করিয়াছিলেন ; পঞ্চচক্র ভেদ করিয়াছিলেন। কিন্তু ষষ্ঠচক্রাতিক্রম করিতে পারেন নাই। লম্ফ-নিপুণ হনুমান ক্ষিতি ত্যাগ করিয়া, অপ্‌সমুদ্র তুচ্ছ করিয়া, স্বতেজে তেজস্বী সূর্য্যকে বিড়ম্বিত করিয়া, স্বয়ং পবননন্দন, আকাশে নিজ পথ নির্ম্মাণ করিয়া—পঞ্চতত্ত্বের পরপারে গিয়াছিলেন ; পথিমধ্যে সাধন-বিঘ্ন-কারিণী সুরসার প্রলোভনে প্রতারিত হয়েন নাই। মোটামুটী যথাকথঞ্চিৎ সীতা-পরিচয়-লাভে লাভবান্ হইয়া তিনি দলস্থ নল নীল জাম্বুবানাদি মিত্রগণকে যমরূপী সুগ্রীব হস্ত হইতে রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। হনুমান্ ধন্যগণের মধ্যে একজন বটে। কিন্তু তিনি মুক্ত হয়েন নাই ; সমগ্র জগৎকেও সুতরাং মুক্তি দিতে পারেন নাই।

ঈশ্বর যে "এক" ভ্রান্ত জীব হইয়াছেন সেই "এক" জীব অন্য জীবগণের মত দেখিতে ঠিক একরূপ হইলেও তত্ত্বতঃ অত্যন্ত বিলক্ষণ ; সেই "এক" জীবটী ভ্রান্ত ঈশ্বর; অপর সকল বহুজীবই, অভ্রান্ত ঈশ্বরের নিকট অনুগতি হিসাবে প্রাপ্তসত্তায় সত্তাবান্, তদধীন, নকল জীবমাত্র। যথা একের পৃষ্ঠে বহু "শূন্য" যোজনা করিলে একের অধীন ১০,১০০,১০০০ দশ শত সহস্রাদি পাওয়া যায়, তদ্বৎ সেই "এক" জীবই এক এবং অন্য বহুজীব-গুলি তৎসংলগ্ন "শূন্য" মাত্র, অথচ একাধীন বহুত্ব পাইয়া দণ্ডায়মান রহিয়াছে।

আমাদের মধ্যে যে, কে সেই “এক” জীব তাহার কোনও ঠিক ঠিকানা নাই; তাহা “এক” জীবই জানে না, যে হেতু সে স্বেচ্ছায় স্বীকৃত ভ্রমে ভ্রান্ত হইয়া রহিয়াছে, অপর নকল জীবেরা ত জানেই না। সেই “এক” জীব ও নকল জীবগণ সকলেই সাধন করিতেছে; সকলেরই গুরু, বেদ মিলিতেছে। কিন্তু সহস্র নকল জীবের সহস্র সাধনায় কিছুমাত্র ফল নাই। সেই এতাবৎ অপরিচিত ভ্রান্ত ঈশ্বর, “এক” জীব, অভ্রান্ত অবস্থায় থাকার সময়ে নিযুক্ত আচার্য্যদ্বারা যখন ভ্রম-মুক্ত হইবে, তখন সবই খোলসা হইয়া যাইবে। তখন বুৎক্রমে “এক” জীবটী—জীবত্ব ত্যাগে—অভ্রান্ত ঈশ্বর হইবে। বালকের বৃদ্ধ হওয়ার মত হইবে; অভিনয় জগতের অংশবিশেষে ব্যাবহারিক সত্য বোধ যাহা ছিল তাহা ঘুচিবে; ঈশ্বর সমগ্র জগৎটাকেই অভিনয়, স্বপ্ন, প্রাতিভাসিক মাত্র বুঝিবেন। পরে যখন ঈশ্বর—অভিনয় প্রত্যাহার করিবেন—ঈশ্বরত্ব ত্যাগ করিবেন—স্বপ্নবর্জ্জন করিবেন, তখন অপর স্বাপ্নিক নকল জীবগণ অভয় সমান আত্মাতে অবগাহিত হইবে, তখন সকল জীবই একযোগে অনাদি অনন্ত সদাবর্ত্তমান বুড়ীকে ছুঁইয়া চোরত্ববন্ধন হইতে মুক্ত হইবে। আর তাহারা অভিনয়ের ভূমিকা নটন করিতে বাধ্য বদ্ধ বর্ত্তমান থাকিবে না।

পাঠক পাঠিকাগণ, কে যে সেই “এক” আমি, তাহা আমরা কেহ জানি না। মুক্তি, সেই “এক” আমির হইলে তবে, তৎপরেই বল, আর তৎসঙ্গে যুগপৎই বল, নকল আমিগুলির পরিত্রাণ। কোনও নকল আমির সাক্ষাৎ মুক্তি হইতে পারে না; আসলের হইবে ও তৎসঙ্গে অর্থাৎ আসলের মুক্তির অধীন সকল নকল জীবের মুক্তি হইবে। “নান্যঃ পন্থাবিদ্যতে অয়নায়।”

এ পর্য্যন্ত কেহই মুক্ত হয় নাই; হইলে অভিনয়ের নটেরা, অন্ত

জীবেরা, কেহই গ্রন্থ লিখিতে, পড়িতে বা অন্য কোন নটন করিতে বর্ত্তমান থাকিত না।

পাঠক পাঠিকা, কেহ তুমি অলস হইয়া অপরের উদ্যোগের আশায় থাকিও না। হয় ত তুমিই সেই আসল "এক" জীব, ভ্রান্ত ঈশ্বর। তোমারই উপরে হয় সমগ্র জগতের মুক্তি নির্ভর করিতেছে, অতএব আইস সকলে প্রত্যেকে পৃথক্ পৃথক্ ভ্রমোন্মাদশূন্য অভ্রান্ত ঈশ্বর হইবার জন্য খুব সচেষ্ট অবহিত হই।

জনশ্রুতি আছে যে, যাঁহা মুস্কিল তাঁহাই আসান; কিন্তু ঈশ্বর স্বেচ্ছায় ভ্রম স্বীকার করিয়া "এক" জীব হইয়া বড়ই মুস্কিলে পড়িয়াছেন; আচার্য্য বেদ ত বহুকাল হইতে তত্ত্বমসি ভেরী বাজাইতেছে; সেই "এক" জীবের শ্রুতিপথে সেই ভেরীনাদ ঢুকিয়াছে; কিন্তু আসান এখনও হয় নাই; ঘুম ত তাহার ভাঙ্গে নাই, "অহং ব্রহ্ম" বোধ হয় নাই। কবে যে সেই "এক" জীবের ভ্রম ঘুচিবে ও সকল জীবেরই মুক্তি, কল্যাণ, সুতরাং ঘটিবে, এরূপ একটা প্রবল চিন্তা, তীব্র উৎকণ্ঠাও ত কোনও জীবে দেখা যায় না। গ্রন্থকার আমির অথবা অন্য কোনও একটা আমির ভ্রম ঘুচিলেই সকলে বাঁচে, সকলের সকল জ্বালাই সমূলোৎপাটিত হয়।

ঈশ্বর মহাশয় ত কটাক্ষমাত্রে ভ্রম স্বীকার করিয়াছেন, ভূত নামাইয়াছেন। কটাক্ষমাত্রে ভূত তাড়াইতে পারেন কৈ? যে পথে হংস-ডিম্ব বিনিষ্ক্রান্ত হইয়াছে সেই পথে ডিম্বটীকে পুনঃ প্রবিষ্ট করা বেশ কঠিন হইয়া দাঁড়াইয়াছে। আচার্য্য বেচারা ত হাজিরই আছে—সদাফুকারী। তাহার কথা কে বা শুনে? শিষ্যের নেশার সময়ে আচার্য্যের হিতোপদেশ—অন্ধকারে দর্পণ-দানের মত হইতেছে। বৃহৎ ঈশ্বর, কোষকারের মত গুটী করিয়া, আপনাকে আবদ্ধ করিয়া, আপ-

নাকে ক্ষুদ্র মনে করিতেছে। "এক" জীব স্বরচিত প্রাচীরের ভিতর বসিয়া ভ্রমে ক্ষুদ্র হইয়াছে। আচার্য্য ঘন ঘন নানা ছোট বড় কাপিল বৌদ্ধাদি তোপ দাগিতেছেন। কিন্তু প্রাচীর ভাঙ্গিতেছে না। "এক" জীব প্রাচীর বেষ্টনের ভিতর ক্ষুদ্র গৃহে বসিয়া, আপনাকে ক্ষুদ্র হইতে ক্ষুদ্রতর মনে করিয়া, বালক বলিকার সহ শিশুবৎ, পিতা পিতামহ মাতা স্ত্রী পুত্র কন্যাদির সহ পুতুল-খেলা করিতেছে, সংসার করিতেছে।

ধরিত্রী উদ্ধার করিয়া বরাহ ভগবান্ প্রেয়সী শূকরী, প্রিয় শিশু, উপাদেয় অমেধ্য ভোজ্য পানাদি ছাড়িয়া বৈকুণ্ঠে যাইতে সম্মত হয়েন নাই। ইন্দ্রাদি কেহ তাঁহাকে বৈকুণ্ঠগমনে অনুরোধ করিতে আসিলে তিনি তাহাকে দংষ্ট্রাঘাত করিতেন। একদিন উপযুক্ত অবসরে জগৎ-গুরু শিবজী ত্রিশূলাঘাতে বরাহ শরীর বিদীর্ণ করিয়া বিষ্ণুকে মুক্ত করিয়াছিলেন। তদ্বৎ নিযুক্ত আচার্য্য যথাবসরে সবেগে বৃহত্তম তত্ত্ব-মসি তোপটা দাগিয়া "এক" জীবের দেহমন্দির হইতে তাহাকে মুক্ত করিবেন; তখন "এক" জীবের দেহাভিমান থাকিবে না; জীব দেহ হইতে নিজ পার্থক্য "অপরোক্ষ" করিবেন। "এক" জীব তখন নিজ ঈশ্বরত্ব উপলব্ধি করিয়া চমৎকৃত হইবেন। এবং দিগ্মোহের মত বিস্ময়ের সহিত গুরুকে প্রতিপ্রশ্ন করিবেন যে, হে আচার্য্য! তত্ত্ব-মসি শুনিয়া অহং-ব্রহ্ম বুঝাটাই ঠিক বটে? অশুদ্ধ ক্ষুদ্র আমিটাই ভূমা অহং বটে। পুনরপি সপ্রেম বলিবেন, আইস আচার্য্য, তুমি আমার সম্পত্তি বুঝাইয়া দিয়া প্রত্যর্পণ করিলে; আমার নেশা ভ্রম দূর করিয়া মহদুপকার করিলে; তোমাকে আমি পুরস্কার দিব; তোমাকে আলিঙ্গন দিব। আলিঙ্গনই পুরস্কার। নিবিড় হইতে অতি নিবিড় আলিঙ্গন, ইহা উপকারী প্রিয়জনকে আত্মসাৎ করণ, আত্ম-সমান করণ। শিষ্যত্ব—উপাধিমুক্ত সমান সৎপুরুষের এই আশ্চর্য্য

আলিঙ্গনে আচার্য্য সেই সৎপুরুষে, আত্মাতে, আমিতে, সমাকৃষ্ট অবগাহিত, সমান, মুক্ত হইবেন।

পাঠক পাঠিকা! আচার্য্য লোকটাকে কি চিনিতে পারিয়াছ? আচার্য্য পরিচয়ের জন্য কিছু গ্রন্থরচনা করিব। আচার্য্যটী স্বপ্নৈকদেশ ব্যক্তিবিশেষ মাত্র নহে। সমগ্র স্বপ্নটাই আচার্য্য।

ঈশ্বরের ভ্রম স্বীকারের পূর্ব্বে জগৎটা স্বপ্ন ও সুষুপ্তির ক্রম—পৌনঃপুন্য ছিল। তুচ্ছ প্রাতিভাসিক বলিয়া জ্ঞাত জগদভিনয় ও অভিনয় সম্বরণ এই দুইটার পারম্পর্য্য ছিল। ভ্রম স্বীকারের কালে যদি জগৎটা জাগর ও সুষুপ্তির, জগৎটা সত্য বলিয়া অনুভূত ব্যাবহারিক ও তৎ সম্বরণের পারম্পর্য্যরূপে অবস্থিত হইত, তাহা হইলে সহস্র নিযুক্ত আচার্য্যও সেই ভ্রম ঘুচাইতে পারিত না। ঈশ্বর, ভ্রান্ত অল্পজ্ঞ হইবার পূর্ব্বে সর্ব্বজ্ঞ ছিলেন; তাহাই তিনি জগৎটাকে স্বপ্ন-জাগর, সুষুপ্তির, এই তিনের—ধারা করিয়াছেন। তন্মধ্যে স্বপ্নটাই ভ্রমাপনোদনের একমাত্র উপায়; স্বপ্নই ত ঈশ্বরের নিজহিতকল্পে, স্বসৃষ্ট অদ্বিতীয় কৌশল, অব্যর্থ ইঙ্গিত। স্বপ্নই আচার্য্য। স্বপ্নই জীবকে বলিয়া দেয় যে জাগরের ব্যবহারে সত্য "বোধ" হইলে কি হয়? জাগরটা—স্বপ্নতুল্য নহে—স্বপ্নই, অসত্য—ব্যবহারময় স্বপ্নাভিনয় মাত্র। এই স্বপ্ন না থাকিলে জাগরের স্বরূপ সম্বন্ধে সংকেত করিবার কিছুই পাওয়া যাইত না, "এক" জীবের ভ্রমও ঘুচিত না। সুষুপ্তিটী সম্বরণাত্মক, ইহা স্বপ্ন জাগরের বীজরূপ। ঈষৎগ্রাহ্য বীজ লইয়া বৃহৎ বিচারণা এবং সুবিচারিত, সুনিশ্চিত সিদ্ধান্ত স্থির করা যায় না; প্রকটাত্মক স্বপ্নজাগরের স্বরূপমীমাংসার যোগ্যতা সুষুপ্তির নাই। স্বপ্ন বটে আপনাকে জাগরসহ তুলনা করিয়া, জাগরকে নিজের মত সমান তুচ্ছ প্রতিপাদন করিয়া ভ্রান্ত ঈশ্বরের মহদুপকার করে। স্বপ্ন না থাকিলে কে বা

ডঙ্কা বাজাইয়া বলিতে পারিত যে, হে মানুষ, বুঝিয়া দেখ জাগরটা আমরাই মত অলীক, ফোক্কা ; আমিই অলীক ; আর জাগর যে সত্য তাহা নহে। স্বপ্নভঙ্গে জাগরে পঁহুছিয়া জাগরকে সত্য মনে করা এবং জাগর ভঙ্গে স্বপ্নে পঁহুছিয়া স্বপ্নকে সত্য মনে করা দুইটাই ভ্রম ; স্বপ্নজাগর দুইটা শুদ্ধ সত্য বিদেহ আত্মার পোষাক ; আত্মা একটা বা পরিধান, অন্যটা বা ত্যাগ করে, কখনও বা উলঙ্গ সুযুপ্ত হয়। যে বারে সুযুপ্ত হইবার উত্তরকালে স্বপ্ন জাগরের পুনরুদয় রাহিত্য হইবে, সেবারে সুষুপ্তিটীর নাম সুষুপ্তি হইবে না, তাহা অনাম, অভয় হইবে। স্বপ্নভঙ্গে যথা স্বপ্নগত সকলেই আমিতে অবগাহন করে, তথা জাগরের মৃত্যুতে জাগরগত সকলেই "আমিতে" অবগাহন করে। স্বপ্নে স্বপ্নদ্রষ্টা আমিকে যদি স্বপ্নগত কেহ বলে যে, "তুমি স্বপ্ন দেখিতেছ" তাহা আমি বিশ্বাস করি না ; জাগরে জাগর-দ্রষ্টা আমিকে যদি জাগরগত কেহ বলে যে "তুমি স্বপ্ন দেখিতেছ" তাহা আমি বিশ্বাস করি না। কিন্তু তত্ত্বতঃ জাগরটাও স্বপ্ন, জাগরের আমির মৃত্যুই জাগররূপ স্বপ্নের শেষ। স্বপ্নে বা জাগরে আমি ব্যতীত অন্য কেহ মরিলে বহু অন্য ব্যক্তি বাঁচিয়া থাকে থাকুক। কিন্তু স্বপ্ন বা জাগরে আমি মরিলে, স্বপ্নগত বা জাগরগত সকলেই আমিতে বিলীন হইয়া যায় ; অন্য কেহই কোনও ব্যবহার করিবার জন্য বাঁচিয়া থাকে না। যথা স্বপ্নভঙ্গে, তদ্বৎই আমির জাগরভঙ্গে, অর্থাৎ লৌকিক মৃত্যুর পরে আমি নূতন একটা স্বপ্ন স্বীকার করি ; তত্র নানা লোকের সহ স্থাপিত নানাবিধ সম্বন্ধ মান্য করিয়া, ব্যবহার করি ও সেই স্বপ্নকে, স্বপ্ন না বুঝিয়া একটা সত্য ব্যবহারময় জাগর মনে করি। পুনরায় সেই স্বপ্নরূপ জাগরভঙ্গে অর্থাৎ তত্র লৌকিক মৃত্যুর পরে, অপর একটা স্বপ্ন, আমার ভ্রমকালে "অজ্ঞাতসারে"

সৃষ্টি করিয়া তাহাকে নূতন একটা সত্য জাগর বলিয়া ব্যবহার করি। কোনও এক স্বপ্নের ভিতরে যে দ্বিতীয় স্বপ্ন দেখা যায় সেই দ্বিতীয় স্বপ্নভঙ্গে তাহাকে তুচ্ছ স্বীকার করি, কিন্তু সেই দ্বিতীয় স্বপ্নভঙ্গে যত্র উপস্থিত হই, সেই উক্ত এক স্বপ্নকে জাগরই মনে করি; যখন সেই স্বপ্নও ভঙ্গ হয় তখন তাহাকে স্মরণ করিয়া স্বপ্ন বুঝি ও যত্র উত্থান হয় তাহাকে জাগর মনে করি, কিন্তু তাহা সত্য জাগর একটা কিছু নহে; তাহাও বহু স্বপ্নধারার মধ্যে একটী অন্যতম স্বপ্ন। মৃত্যুর রহস্য এই যে, স্বপ্নকালে স্বপ্নে জাগর ভ্রম হয়, সেই জাগরে আমির মৃত্যুটা, মৃত্যু নহে; স্বপ্নভঙ্গ মাত্র। স্বপ্নের কথা স্বপ্নভঙ্গে কখন সুস্পষ্ট স্মৃত হয়; কখনও অস্পষ্ট, কখনও বা মোটেই স্মৃত হয় না। মৃত্যু যে একটা স্বপ্নভঙ্গ মাত্র তাহা, মৃত্যুর পরে সংসাররূপ স্বপ্নের স্মৃতি না থাকিলে, জানা হইবে না; স্মৃতি থাকিলে জাতিস্মর, তাহা জানিবে। এই জানাটাই মৃত্যু হইতে পরিত্রাণ, মুক্তি। ইতোমধ্যে এক অদ্বিতীয় আত্মাটী "অমরই" থাকিয়া স্বপ্ন হইতে নূতন ও পুরাতন" স্বপ্নে বারম্বার বিচরণ করিতে থাকে ও ভ্রমে প্রত্যেক স্বপ্নকে স্বপ্নকালে সত্য জাগর মনে করে। যে জন্মাবচ্ছিন্নে স্বপ্ন দেখে নাই বা দেখিয়াও স্বপ্নভঙ্গে স্বপ্নস্মৃতি অনুভব করে নাই, সে বটে নিশ্চয় হতভাগ্য। জাগরের মৃত্যুটীতে তাহার সুতরাং সত্য বোধ হয় এবং মৃত্যু যে স্বপ্নভঙ্গবৎ নিরীহ ব্যাপার তাহা বিবেচনা করিবার সম্ভাবনা মাত্র, তাহার সম্বন্ধে থাকে না; এবং মৃত্যুর হস্ত হইতে "মৃত্যু নাই" এই নিশ্চয়জ্ঞানরূপ পরিত্রাণকে অর্থাৎ মোক্ষ বস্তুকে সে চিন্তার বা কল্পনার গোচরই করিতে পারে না। যে ব্যক্তি কোনও এক স্বপ্নভঙ্গে জাগরে আসিয়া স্বপ্নটাকে স্মরণ করিয়াছে এবং সুতরাং নিজের সত্তার অপরি-লোপ, অমৃত্যু, অমরত্ব বুঝিয়াছে, "যে আমির জাগর সেই আমিরই স্বপ্ন" ইহা জানিয়াছে, সেই কল্পনা করিতে সমর্থ যে জাগরটাও স্বপ্ন এবং

জাগরভঙ্গে অর্থাৎ লৌকিক মৃত্যুতে আমি ঠিক বজায়, অমর থাকিয়া, যথা স্বপ্নভঙ্গে তথাই জাগরভঙ্গে অন্য কুত্রাপি "সেই" আমিই জাগিয়া উঠিব। অর্থাৎ মৃত্যু কিছু একটা সত্য মারক বস্তু নহে; তাহা আমিকে বজায় রাখিয়া আমার অবস্থা পরিবর্ত্তন মাত্র। মৃত্যু যে সত্য নহে এই বোধটীই মৃত্যু-জয়, মোক্ষদ্বার। এই মৃত্যু রহস্যটী লৌকিক মৃত্যুর পূর্ব্বে যে কেহ অপরোক্ষ করিবে, যে কেহ স্বপ্নকালেই স্বপ্নকে স্বপ্ন বলিয়া বুঝিবে, যে কেহ স্বপ্ন ও জাগরে তুল্যরূপে স্বপ্ন বলিয়া নিশ্চয় বুদ্ধি করিতে পারিবে, সে তৎক্ষণাৎ ঈষৎদোষতুষ্ট জীবন্মুক্ত ঈশ্বর হইবে। এবং তৎক্ষণেই হউক বা কিঞ্চিৎ বিলম্বে হউক, স্বপ্ন প্রত্যাহার করিলে সেই "এক" ঈশ্বর সুষুপ্তি হইবে; ঈশ্বর পুনরায় স্বপ্নসৃষ্টি করিয়া দেখিবে; পুনর্ব্বার সুষুপ্তি হইবে এবং উত্তরকালে "জ্ঞাতসারে" যথা একই কবি সময় ভেদে নানা নাটক রচনা করে তদ্বৎ আবার স্বপ্ন প্রস্তুত করিয়া স্বপ্নকে স্বপ্ন বুঝিয়া দেখিবে, কিন্তু আর তাহাকে সত্য-ব্যবহার-ময় জাগররূপ কিছু মনে করিবে না। যদি সেই "এক" ব্যক্তি স্বপ্ন প্রত্যাহারে স্বপ্ন বীজেরও, স্বপ্ন স্মৃতিরও, উদয় রাহিত্য ঘটায়, সুষুপ্তি হইতে অনুগত সত্তা কাড়িয়া লয়, তবে উন্মত্তারোগ্যবৎ সে অভয়, স্বস্থ হইবে ও স্বপ্নাভিনয়ের নটগণ সেই বারের স্বপ্ন প্রত্যাহারে সমান অভয়ে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে স্থানলাভ করিয়া বিলীন, বাধিত, মুক্ত হইয়া যাইবে, আর তাহাদের সংসারাভিনয়ে বদ্ধ হইয়া নটন করিতে হইবে না। পাঠক পাঠিকাগণ! এই বিচারটী কিছু দীর্ঘ হইল বলিয়া অস্থির হইও না; বরং ইহা বারম্বার পাঠ করিবে। পুনঃ পুনঃ পঠনটী আমার এবং তোমাদের সকলেরই অনুকূল। যে কেহ একটা অভয় স্বস্থ হইলেই সকলেরই মুক্তি, ইহা যেন মনে থাকে।

উক্ত বিচার-প্রসঙ্গে ঈশ্বরকে ঈষৎ দোষতুষ্ট বলিয়াছি। কেন বলিয়াছি তাহার কৈফিয়ৎ দিব।

স্বস্থ অভয় আত্মাতে কোনও বিকল্পনার সম্ভাবনা-লেশ নাই। স্বাস্থ্যাতিরিক্ত কোনও অবস্থা কল্পনা করিতে অভয়, মহারাজ হইয়াও, অক্ষম। যাহার ব্যাধি হইয়া আরোগ্য লাভ হইয়াছে, সেই বটে সুস্থ এবং সুস্থতার অতিরিক্ত ব্যাধিতের বা স্বস্থের অবস্থা চিন্তা বা কল্পনা করিতে পারে। যাহার কোনও ব্যাধি হয় নাই, যে স্বস্থ, সে কোনও "অবস্থা" মনে ভাবিতেই পারে না। নিজের অবস্থাও নহে; যেহেতু নিজের অবস্থা কল্পনা করিতে হইলে তুলনার জন্য অতিরিক্ত পীড়িতের বা সুস্থের অবস্থা চাই; তাহা ত সে জানে না, জানে নাই।

তবেই স্বস্থ অভয় আত্মার "কে আমি" জানিবার একটা ইচ্ছা, একটা বিকল্পনা, একটা প্রশ্ন অকস্মাৎ উদিত হইয়া অভয়-কেবলকে যে একটা হীন ঈশ্বর করিয়া ফেলিতে পারে, ইহার প্রামাণাভাব। সুতরাং ঈশ্বর প্রসঙ্গটী দোষদুষ্ট। তাহাই কপিলাদি ঈশ্বর প্রতিপাদনে পরাঙ্মুখ। কথাটাতে প্রণিধান করিও।

যাহাই হউক আমরা অগত্যা, অভয়ে উক্ত ইচ্ছার উদ্রেকে অভয়ের ঈশ্বর হওয়া ও ঈশ্বর কর্ত্তৃক জগৎ সৃষ্টি ও ঈশ্বরের ভ্রম স্বীকার পূর্ব্বক "এক" ভ্রান্ত জীব হইয়া জগদংশে মিথ্যা স্বপ্ন নিশ্চয়ও অংশে সত্য জাগর নিশ্চয়; পরে ব্যুৎক্রমে আচার্য্যোপদেশে "এক" ভ্রান্ত জীবের ঈশ্বর হওয়া অর্থাৎ স্বপ্নজাগর উভয়েই স্বপ্ন বোধ হওয়া ও পরে ঈশ্বর দ্বারা স্বপ্নস্মৃতিসহ স্বপ্নলোপে ঈশ্বরের মুক্ত অভয় হওয়া ও সুতরাং স্বপ্নগত নানা জীবের সেই অভয়ে প্রবেশ লাভ পূর্ব্বক মুক্ত হওয়া উন্মত্তারোগ্য দৃষ্টান্তে আপাততঃ মানিয়া লইব।

যদি কেহ শুদ্ধচিত্ত ব্যক্তি এতাবৎ প্রপঞ্চিত প্রবন্ধে সম্পূর্ণ অনাস্থা করিয়া বুঝিতে পারেন যে, অভয় অভয়ই আছে, তাহাতে কদাপি কোনও ইচ্ছার উদয় হইতে পারে না বলিয়া হয়ই নাই—অভয়ের সভয় ঈশ্বর হওয়াও

মিথ্যা এবং আরও পরে ঈশ্বরের ভ্রম স্বীকারও মিথ্যা এবং কাহারও বন্ধন হয় নাই, কাহারও মুক্তির আবশ্যক নাই, তাহা হইলে ত সকল বিবাদই মিটিয়া যায়। ভালই হয়। ভগবান শঙ্করাচার্য্য তাহাই সমগ্র সুদীর্ঘ বেদান্ত গ্রন্থ একমাত্র উন্মত্তারোগ্য দৃষ্টান্ত ভিত্তির উপর স্থাপিত করিয়া চরমে উক্ত ভিত্তি নির্দ্দোষ এবং সুদৃঢ় নহে বলিয়া উক্ত দৃষ্টান্তে অনাদর পূর্ব্বক অন্য এক আশ্চর্য্য দৃষ্টান্তের অবতারণা করিয়াছেন, যাহা অভয়ের গুরুভার সহ্য করিতে পারে, যে গুরুভার বহন করিবার শক্তি উন্মত্তা-রোগ্য দৃষ্টান্তের নাই। বহুমূল্য উন্মত্তারোগ্য দৃষ্টান্ত অপেক্ষা পর্ব্বতস্তিষ্ঠ-তীতি দৃষ্টান্তকে তিনি নিরতিশয় মূল্যবান্ বিবেচনা করেন। অভয়ে ইচ্ছাশক্তির আরোপে অভয়কে ঈষৎ কলুষিত ঈশ্বররূপ দান্ করিয়া সেই ঈশ্বরে ভ্রমোন্মাদ আরোপে তাহাকে আরও অধিকতর পরিমাণে কলঙ্কিত জীব করিয়া পরে ব্যুৎক্রমে উন্মত্তারোগ্যবৎ শুদ্ধি সম্পাদন পূর্ব্বক নূতন করিয়া অভয় স্থাপনা করার দোষ এই যে, উন্মাদ আরোগ্য লাভ করিয়া উন্মত্তাবস্থা বিস্মৃত হইলে ভবিষ্যতে উন্মাদ হইবার ভয় তাহার মনে বটে অঙ্কুরিত হয় না, কিন্তু তটস্থ ব্যক্তি বুঝে যে, তাহার অবস্থা অত্যন্ত নিরাপদ নহে; তাহার পুনরায় উন্মাদ হওয়ার পক্ষে কোন বাধা নাই। তবেই পাওয়া গেল যে, বিচার পূর্ব্বক "অভয়" বুঝিয়া লইতে হইলে উন্মত্তারোগ্য দৃষ্টান্তে অভয়ের মর্য্যাদা ক্ষুন্ন হয়; যে হেতু অভয় যদি কোনও একবার ভ্রান্ত জীব হইয়া পরে ভ্রমারোগ্য পুনরায় অভয় হয়, তবে তাহার পুনরায় এবং বারম্বার ভ্রান্তজীব হইবার বাধা কি আছে? তবেই অভয়টী অভয় না হইয়া ঘোরতর সভয় হইয়া পড়ে।

ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য বলিতে চাহেন যে উন্মত্তারোগ্য দৃষ্টান্তটী লঘু অধিকারীকে অভয় বুঝাইবার একটা ভঙ্গীমাত্র। বস্তুতঃ অভয় অভয়ই

আছে; তাহাতে সৃষ্টির বা কোনও কিছুর ইচ্ছা জন্মলাভ করিতে পারে না বলিয়াই করে নাই।

পর্ব্বতস্তিষ্ঠতি বলিলে তিষ্ঠতির প্রতিযোগী চলিত ক্রিয়াটি মনোমধ্যে নাম মাত্র উদিত হয়; পর্ব্বত এখনও তিষ্ঠতি, পূর্ব্বেও তিষ্ঠতি; পূর্ব্বে কখনও পর্ব্বত চলিয়াছে বা পরে কখনও চলিবে এরূপ বুঝিতে হয় না। পর্ব্বত বরাবরই তিষ্ঠতি; কদাপি চলিত নহে। তদ্বৎ অভয় বরাবরই অভয়—ইহা পূর্ব্বেও কখন সভয় ছিল না, পরেও কখন সভয় হইবে না।

তন্ত্রশাস্ত্র কৈবল্য-প্রতিপাদক সুতরাং বেদান্ত। তান্ত্রিক মহাপুরুষ রামপ্রসাদও বলিয়াছেন যে, কেবল, কেবলই;—সৃষ্টির গল্পটা, সিন্দুর বিধবার ভালেবৎ—অসম্ভব ভবিষ্যৎ; সম্ভব ভবিষ্যৎও নহে। রামপ্রসাদ অহং-প্রতিযোগী কালীকে খাইয়া ফেলিতে চাহিয়াছিলেন; পারেন নাই; পারিলে গ্রন্থকার এবং পাঠক পাঠিকাও রামপ্রসাদ ভুক্ত হইয়া মুক্ত হইয়া যাইত; বর্ত্তমানে তাহাদের চিহ্নমাত্র পাওয়া যাইত না।

পর্ব্বতস্তিষ্ঠতীতি দৃষ্টান্তে শব্দ বিশ্রাম লাভ করে! তখন চুপ করিতে হয়। কিন্তু গ্রন্থ লিখিতে বসিয়া চুপ চাপ চলে না। আমরা ন্যূন উন্মত্তারোগ্য দৃষ্টান্তাশ্রয়ে আরও কিছু বলিব। আমরা সমক্ষে দণ্ডায়মান যথাপ্রাপ্ত সৃষ্ট জগৎ পাইতেছি। ইহা স্বচ্ছ নেশালেশরহিত অভয় দ্বারা সৃষ্ট নহে; ইহা গোলাপী নেশাযুক্ত, ইচ্ছাশক্তি সমন্বিত ঈশ্বরের সৃষ্টি। ইহা তত্ত্বতঃ—প্রাতিভাসিক, স্বপ্নাভিনয় মাত্র। কিন্তু পরে হতভাগা ঈশ্বর ঘোর নেশা স্বীকার করিয়া "এক" ভ্রান্ত জীব হইয়া সৃষ্টির অংশে সত্য ব্যাবহারিক বোধ করিলেন, ও নানা জীবগণকে নিজতুল্য বিবেচনা করিয়া তাহাদের সহ নানা সম্বন্ধ স্থাপন ও ব্যবহার করিতেছেন। আসল কথা এই যে, বহুজীবগণের মধ্যে সেই "এক" জীব, অন্য যাবতীয় জীব

হইতে বিলক্ষণ; সেই "এক" জীবেরই ভ্রমোন্মাদ ঘুচিবে, সেই "এক" জীবই ঈশ্বর হইবে; তখন অন্য জীবগুলি, স্বপ্নগত নকল জীবমাত্র হইয়া ঈশ্বরের পরিজ্ঞাত হইবে। সেই ঈশ্বরের স্বপ্নদৃশ্যটা বাধিতানুবৃত্তি ন্যায়ে কিয়ৎকাল বর্ত্তমান থাকিয়া পরে প্রত্যাহৃত হইলে ঈশ্বর অভয় হইবে। নকল জীবগুলি ঈশ্বরের স্বপ্নভঙ্গে স্বপ্নসহ অভয় মূর্ত্তিতে প্রবেশলাভ পূর্ব্বক সমান অভয়ে সমান হইয়া যাইবে; মুক্ত হইবে। কিন্তু সকল জীবেরই মুক্তি সেই "এক" জীবের অভয় হওয়ার উপর নির্ভর করিতেছে। সেই "এক" জীব যে আমাদের মধ্যে কে? তাহা উপস্থিত "এক" জীবের ভ্রম কালে সেই "এক" জীবও জানে না, নকল জীবেরা ত জানেই না। আমাদের প্রত্যেকের আমিই সেই "এক" জীব এই ধারণাকে দৃঢ় করিবার জন্য চেষ্টা করার অধিকার সম্পূর্ণ আছে। সাবধান! অলস হইয়া ফাঁকি দিবার অভিপ্রায় তোমাদের কাহারও না থাকে। "একের মুক্তি হইলেই ত আমি বাঁচিব; যে কেহ মুক্ত হয় হউক; আমার আর পৃথক্ চেষ্টার প্রয়োজন নাই," এরূপ মনে করিলে আত্মবঞ্চনার ভয় আছে, যেহেতু উক্ত অলস তুমিটাই হয় ত সেই "এক" জীব—যাহারা উদ্ধার না হইলে তোমারও মুক্তি হইবে না, অপর সকলেরও হইবে না।

হে পাঠক পাঠিকা, নরত্ব নারীত্ব দেহ-মন্দিরের গঠন-ভেদ মাত্র। মন্দিরস্থ ঠাকুর,—আত্মা, নরও নহে, নারীও নহে। নর-দেহমন্দিরে বা নারী-দেহমন্দিরে অভিমান প্রবল হইলে আত্মা, ভ্রমে আপনাকে নর বা নারী মনে করে। কখনও বা দেহাভিমান নিরপেক্ষ হৃদয়াভিমানে, সীতার বা আয়েষার বা নষ্টনীড়গেহিনী চারুর দুঃখে দুঃখিত হইয়া সমবেদনায় অবশ হইয়াই, পাঠক ও পাঠিকার আত্মা তৎকালে সাময়িক নারী-অভিমান স্বীকার করে, কখনও বা শ্রীরামাদির সুচরিত পাঠে উল্লাসিত হইয়া তৎকালে, অবশভাবেই সাময়িক রামত্ব, নরত্ব অভিমান স্বীকার

করে। তদ্বৎ অভয়কে ভাল লাগিলে পাঠক ও পাঠিকার আত্মা, দেহা-ভিমান বা হৃদয়াভিমান নিমিত্ত নরনারীত্বাভিমান বিসর্জ্জন করিয়া তৎ-কালে অলিঙ্গ জ্ঞান স্বরূপ সাময়িক "অভয়" হয়, সাময়িক না হইয়া যাহাতে চিরস্থায়ী "অভয়" হওয়া যায় তাহার সমধিক যত্ন করাই "আমির" পক্ষে শ্রেয়ঃ। অভয়ের দেহ মন্দির নাই, হৃদয় অর্থাৎ Emotionও নাই। অভয় জ্ঞানসার, জ্ঞানঘন, "সমান" Intellect। আমার হৃদয়, আমার দেহ এরূপ বাক্য প্রয়োগে ষষ্ঠী বিভক্তিবলে ইহা সুসমর্থিত হয় যে, আত্মা হৃদয় ও হৃদয়াভিমান হইতে পৃথক্, কিন্তু ত বিদেহ, ভাবরূপ; দেহহৃদয় হইতে অত্যন্ত বিলক্ষণ, গরীয়ান, কিঞ্চিৎ। তাহাই নিত্যশুদ্ধ অভয়। এই প্রবন্ধ লিখিবার ভঙ্গীদোষে বা গ্রন্থকারের অনবধানতা বশতঃ যুক্তি সামগ্রীর উপযুক্ত সন্নিবেশ না হওয়ায় ত অভয়টী নির্দ্দোষরূপে সমুপস্থিত হয় নাই। পাঠক পাঠিকা! যদি পার ত গ্রন্থের শুদ্ধি সম্পাদন করিয়া লইও। খুব ব্যস্ত হইও না; "আমির" অভয় হওয়ার হয় ত বিলম্ব আছে এবং বিলম্ব হইবার যথেষ্ট হেতুও আছে। নিধুবাবু সঙ্গীত শিখি-বার জন্য ওস্তাদের নিকট গিয়া শুনিলেন যে, সঙ্গীত শিখিতে পাঁচ বৎসর লাগিবে। নিধু বাবু বলিলেন যে, তিনি অন্যত্র দুই বৎসর সঙ্গীত শিখিয়া-ছেন সুতরাং তিনি আর তিন বৎসরেই সঙ্গীতবিদ্যায় পারদর্শী হইতে পারিবেন। ওস্তাদ বলিলেন, নিধুবাবু, তবে তোমার দশ বৎসর লাগিবে। অন্যত্র যাহা শিখিয়াছ তাহা ভুলিতে পাঁচ বৎসর ও পরে আমার নিকট নূতন শিক্ষা করিতে পাঁচ বৎসর লাগিবে।

আমরাও পূর্ব্বে জগতের ভিন্ন ভিন্ন অংশে রাগদ্বেষ বশতঃ যতটা আদর ও ঘৃণা করিতে অভ্যাস করিয়াছি, সেই সংস্কার ভুলিতে বহুকাল লাগিবে। পরে ওস্তাদ উক্ত তত্ত্বমসি-সঙ্গীতে তামিল হইতে, অর্থাৎ মন্ত্রার্থ মনন শোধনে, যথেষ্ট সময়ক্ষেপ ও শ্রম স্বীকার করিলে তবে ক্রমে জগতের

সর্ব্বত্র দুঃখ-রাহিত্য, প্রাতিভাসিকত্ব, স্বপ্নাভিনয়ের রসরূপত্ব,—আচার্য্যসঙ্গ ও নিজ সংযমে বুঝিয়া,—আরও অধিককালপরে অভিনয়ের বিশিষ্টানন্দ ভোগে চিত্তের বিক্ষেপকেও বন্ধনরূপ বুঝিলে অর্থাৎ ঈশ্বরত্বে বৈরাগী হইলে, সমানানন্দরূপ অভয় সাক্ষাৎকার হইবে। আসল কথাটা আর না বলিলে নহে। অভয় সাক্ষাৎকারটী ইদংরূপে হয় না; অভয় সাক্ষাৎকার অর্থে অভয় প্রাপ্তি। এই প্রাপ্তি টাকা পাওয়ার মত বা গঙ্গা-প্রাপ্তির মত বা ময়দান পার হইয়া গ্রামপ্রাপ্তির মত নহে। ইহা আরোগ্য প্রাপ্তির মত, নিজে আরোগ্য হওয়া; নিজে অভয় হওয়া। যে সে আরোগ্য নহে; তাহা উন্মত্তারোগ্য হওয়া; পূর্ব্বে যে উন্মাদ ব্যাধি ছিল তাহার সম্পূর্ণ বিস্মরণ সহ আরোগ্য, অভয় হওয়া। এই যে উন্মত্তারোগ্য দৃষ্টান্তবলে অভয় হওয়া—ইহাই খাঁটী অভয় নহে। উন্মত্ত স্বস্থ হইয়া নিজে না জানুক আমরা ত জানি যে, সে পুনরায় উন্মাদ হইলেও হইতে পারে। তবেই নিখুঁত সর্ব্বাঙ্গসুন্দর অভয় হইল না।

পর্ব্বতস্তিষ্ঠতীতি দৃষ্টান্তে বুঝায় যে অভয় কদাপিই সভয় ঈশ্বর ও ক্রমে ভ্রান্ত উন্মত্ত জীবরূপ হয়ই নাই। স্বস্থ অভয়ে আপনাকে জানিবার বা জগৎ সৃষ্টি করিবার কোনও আকস্মিক ইচ্ছার, উৎপাতের, উপদ্রবের আবির্ভাব, অসম্ভব-ভবিষ্যৎ।

খাঁটী অভয়ানুরোধে সুতরাং উন্মত্তারোগ্য অপেক্ষা পর্ব্বতস্তিষ্ঠতীতি দৃষ্টান্তকে অধিক সঙ্গত ও বলবত্তর বলিতে হয়।

হে নর নারী! কে পার, তথাস্তু বল। "এক" আমি মুক্ত হও ও সকলকে মুক্তি দাও।

এই গ্রন্থ-প্রতিপাদ্য বিষয়টীর নাম সংস্কৃত পুস্তকে কৈবল্যবাদ, বিবর্ত্ত-বাদ, শুদ্ধাদ্বৈতবাদ, দৃষ্টি—সৃষ্টিবাদ, এক-জীববাদ, মহাস্বপ্নবাদ। ভারত ছাড়া অন্য কোনও দেশে ইহার চর্চ্চা অদ্যাবধি হইয়াছে বলিয়া আমার

জানা নাই। যাঁহারা সংস্কৃত পড়িতে নারাজ তাঁহাদের আমার এই অসংস্কৃত সংবাদ অগত্যাই গ্রহণ করিতে হইবে। জিজ্ঞাসার তৃপ্তি না হয় পাঠক পাঠিকাকে নূতন পৃথক উদ্যমে সংস্কৃত গ্রন্থাদি হইতে রহস্য বুঝিয়া লইতে হইবে। অভয়ের ওকালতী যথাসাধ্য করিলাম। বেতন চিত্ত-শুদ্ধি। প্রবন্ধ লিখিয়া আমি নিজের চিত্তশুদ্ধির চেষ্টা করিয়াছি; পাঠক পাঠিকারও ইহাতে চিত্তশুদ্ধি কিয়ৎ পরিমাণে হইতে পারিবে। কোনও "এক" জনের হইলেই যে হয়!

একদা এক ব্যক্তি ডাক্তারখানায় উপস্থিত হইয়া কম্পাউণ্ডারকে জিজ্ঞাসা করেন যে তুমি এমন ভাবে Castor Oil দিতে পার যে, যে তাহা খাইবে সে যেন জানিতে না পারে যে Castor Oil খাইতেছে। কম্পাউ-ণ্ডার বলিল, পারি; কিন্তু ঔষধ বিলম্বে প্রস্তুত হইবে সুতরাং আপনাকে অপেক্ষা করিতে হইবে; ইতিমধ্যে আপনি কি একটা soda water খাইবেন? প্রস্তাব সাধু বলিয়া তিনি স্বীকার করিয়া soda water খাইলেন। কিয়ৎকাল পরে কম্পাউণ্ডার তাঁহাকে তত্র বসিয়া থাকিতে দেখিয়া বলিল যে, আপনি বাড়ী যান নাই কেন? তিনি বলিলেন যে, খুড়ার জন্য Castor Oil লইয়া তবে ত আমি যাইব। কম্পাউণ্ডার বলিল, সর্ব্বনাশ; সেই soda waterই ত Castor Oil; আপনি যত শীঘ্র পারেন বাড়ী চলিয়া যান। ঔষধের কার্য্য এখনই হইবে। পাঠক পাঠিকাগণ, যাঁহারা এই প্রবন্ধ পড়িয়াছেন, নিজ প্রয়োজন-বুদ্ধি না থাকিলেও Castor Oil তাঁহাদের উদরস্থ হইয়াছে জানিবেন। ইহাতে চিত্তমালিন্য দূরীভূত হইবেই। তাহা পরম লাভ। অশুদ্ধ চিত্তের অভয় হয় না। যদি হয় তবে নিষ্কাম-কর্ম্মী বা বেদান্তবাক্যে সদা রমণশীল কোন বৈরাগী শুদ্ধ চিত্তেরই হইবে। ইহাই সিদ্ধান্ত। শুদ্ধ চিত্তই বুঝিতে পারি-বেন, অন্য কেহ পারিবেন না যে, জীবন-সাফল্য সম্বন্ধে আহার নিদ্রা,

ভয় ও বংশ বৃদ্ধির অপেক্ষা কুশলাতিশয় কিছু আছে। এই রচিত প্রবন্ধ তাহারই বার্ত্তাবহ মাত্র। "বেদান্তকৃৎ বেদবিদেব চাহং"—আপন খেল আপ কর দেখে, খেল সংকোচে আপনি একে, ইত্যাদি মস্ত বড় কথাগুলিও অর্দ্ধ সত্য অর্দ্ধ মিথ্যা ; অবশেষে কেবল সত্য এই দাঁড়াইল যে, কি অতীত রাম বুদ্ধ শঙ্করাচার্য্যাদি, কি বর্ত্তমান তুমিগুলি, কি ভবিষ্যৎ যে কেহ সকলই এক আমিরই স্বপ্নগত ; তাহাদের মোক্ষ হওয়াও নাই, অভয় হওয়াও হয় না ; এক আমিরই মোক্ষ হইবে, এক আমিই অভয় হইব। সেই স্বপ্নটাই স্বপ্নের কারণ না থাকায় হয় নাই ; অভয় আমি অভয়ই আছি কদাপি সভয় হই নাই।

মধুরেণ সমাপয়েৎ ন্যায়ে কিছু পুনশ্চ আবশ্যক। পুনশ্চ জিনিষটা বড় সোজা নহে। প্রাচীনকাল হইতে প্রোষিতভর্ত্তৃকা-সুন্দরীগণ জীবিত-বল্লভকে বৃহৎ প্রীতি-পত্রিকা লিখিয়া অল্পাক্ষর কিন্তু অসন্দিগ্ধ দুই ছত্র পুনশ্চ একখানি চিরুণী, এক প্রস্থ শঙ্কচুড়, একমোড়ক মাথাঘসা, অর্দ্ধসের গজা, একজোড়া সাটী ইত্যাদি বহু সামগ্রী মন্ত্রমুগ্ধ হৃদয়েশ্বরের নিকট আদায় করিয়া আসিতেছেন।

সৃষ্টির আদিমকাল হইতে মানব-হৃদয়ের ক্রমবিকাশের একটা ইতিহাস আছে। সেই ইতিহাসানুরোধে বলিতে হয় যে ধর্ম্মার্থকামমোক্ষেষ চতুর্থ মোক্ষটী, অভয়টী, বহুশতকোটী বৎসরের চিন্তার ও পরীক্ষার ও মার্জ্জনের ফলে পুরুষার্থ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। কিন্তু সম্প্রতি অন্য একদল মনীষী দেখা যায়, যাঁহারা উক্ত মোক্ষটীতে "অবশে" তুচ্ছ বুদ্ধি করিয়া তাহা প্রত্যাখ্যান করেন, যেহেতু তাঁহারা পঞ্চম পুরুষার্থ "অনুভব" করেন। পঞ্চম পুরুষার্থ "কৃপা" করিয়া মানব হৃদয়ে স্বয়ং আবির্ভূত হয়েন। সেই পঞ্চম পুরুষার্থের নাম প্রীতি। প্রণয়বতী আর্য্যপুত্রকে অজ্জ উত্ত বলিলে যেমন তাঁহার হর্ষোল্লাস হয়, তদ্বৎ প্রীতি ঠাকুরাণীকে "পিরীতি" বলিয়া

সম্বোধন করিলে আনন্দে দেবীর মধুর সুন্দর চন্দ্রবদন আকর্ণ রক্তিমাভ হইয়া সুন্দরতর শোভা-সমৃদ্ধ হয়। এই প্রীতির ঋষি চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি নদীয়ার অপরূপ উজ্জ্বল গোরাচাঁদ, গোরাপ্রিয় রামানন্দ, নিত্যানন্দ, অদ্বৈত প্রভু, মুসলমান হরিদাস, রূপ, সনাতন গোবিন্দ দাসাদি মহাজনগণ। তাঁহাদের প্রিয় হিত পদাবলী পাঠ করিয়া পাঠক পাঠিকাগণ আপনাদিগকে পবিত্র কৃতার্থ করিয়া লইবেন। উক্ত মহাপুরুষগণ বৈদান্তিক সহ কতকটা একমতে, রসরূপ প্রিয়দেবতা হইতেই জগৎ উদ্ভূত হইয়াছে বলিয়া জগতের সমগ্র দেশের রসরূপত্ব স্বীকার করেন। জগতে যাহা কিছু দুঃখ বলিয়া প্রতীত হয়, তাহা স্বরূপে দুঃখ নহে, তাহা বস্তুতঃ রসপোষক ও সুতরাং রসরূপই। অর্থাৎ প্রীতিঠাকুরাণীর পরিজন ও "সিদ্ধ" উপাসকগণ "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" মন্ত্রকে সত্য বলিয়া মান্য করেন। লীলা রহিত অভয়ের চর্চ্চা তাঁহারা বড় বেশী পরিমাণে করেন না; লীলাসক্ত সুন্দরের "মধুর" লীলারসেরই চিন্তন, পূজন করেন। অথবা কৃপাপ্রাপ্ত যথা অধিকারি ভেদে অধিকার বশে, বাৎসল্যাদি রসেই রুচিমান হয়েন। অথবা কৃপাহেতু তটস্থতা মাত্র পাইয়া সাধক সকল রসেরই রসিক হয়েন। তটস্থতাতে রাধা-গোবিন্দে ঈশ্বর-বুদ্ধি থাকে। তাঁহাদের মতে পুরুষ সংখ্যায় এক; দ্বিতীয় পুরুষ নাই। তিনি অতিশয় সুন্দর ছিলেন; তাঁহার সমস্ত সৌন্দর্য্য বাহিরে রাধারূপে রাখিয়া নিজে বড়ই কালো হইয়াছেন; কিন্তু রাধিকা তাঁহাকে ভাল বাসিয়া তাঁহার নিকটে থাকিয়া এবং নিত্য আলিঙ্গনের ভিতর রাখিয়া নিজ সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্যে আচ্ছাদিত করিয়া তাঁহাকে সদা সুন্দর করিয়াই রাখিয়াছেন। সকলেই ত জানেন যে ঘনশ্যামের পীতবসনই শ্রীরাধার প্রথম বিলাস। সরলা, বৎসলা যশোমতী এবং গোপগোপীগণও নিজ ভালবাসা আচ্ছাদন অর্পণ করিয়া কালো কৃষ্ণকে পরম সুন্দর দেখেন ও

বলেন যে, হউক না ছেলে কালো, ছেলে ঘর করেছে আলো। যাঁহারা কৃষ্ণকে কালীরূপে দেখেন তাঁহারাও বলেন যে কালো কালী বড়ই সমুজ্জ্বল—কালী যে তিমিরে তিমিরহরা।

পুরুষটীর লক্ষণ এই যে তিনি সেব্য ভোক্তা। অন্য যাবতীয় স্থিরচর সকলেই তাঁহার হ্লাদিনী শক্তি রাধিকার রূপভেদ এবং সেবক, ভোগ্য, নারী। সেবকত্বই নারীত্ব। তুমি, আমি, মাতা, পুত্র, কলকণ্ঠ কোকিল, শীতল পবন, আকাশের চাঁদ, ফুল্ল ফুলদল, মন্থরা যমুনা সকলেই সেই এক পুরুষের, ঈশ্বরের, নারী, সেবক, সুখদাতা। হ্লাদিনী পুরুষকে নানা রূপে ভালবাসে; শিষ্য হইয়া গুরুকে, জনক জননী হইয়া সন্তানকে, সন্তান হইয়া পিতামাতাকে, ভৃত্য হইয়া প্রভুকে, স্ত্রী হইয়া ভর্ত্তাকে, ভর্ত্তা হইয়া পত্নীকে, পরকীয়া হইয়া বরনাগরকে। এই অলৌকিক ভালবাসার দৃষ্টান্ত নাই; লৌকিক ভালবাসা হইতে ইহার অল্প আভাস মাত্র দেওয়া যাইতে পারে। সেই আভাস টুকু অবলম্বন করিয়াই ভালবাসাকে ভাল বাসিতে হইবে, পূজা করিতে হইবে। হ্লাদিনীর সেবায় পুরুষের অপূর্ব্ব সুখ হয়। পূজার "পদ্ধতি" এই যে, যাঁহারা প্রাচীন ও আধুনিক কালে ভাল বাসিয়াছেন, তাঁহাদের সুরচিত কথা ভুয়ঃ পরিমাণে শ্রবণ কীর্ত্তনাদি চর্চ্চা করিতে হইবে, তবে পরে হয় ত একদিন পূজক নিজেই ভাল বাসিতে পারিবে। দেখিতে সুন্দর ফুলের মর্য্যাদা যেমন, তত্র সুগন্ধ থাকিলে অতিশয়িত হয়; তদ্বৎ বৈদান্তিক অমর জীবাত্মা যদি ভাল বাসিতে পারে, তবে যেন প্রীতি ভক্তি একটা ভূষণ স্বরূপ হইয়া অমর ধ্রুবকে অধিক শোভন করিয়া তুলে।

ভক্তগণের মধ্যে এক সম্প্রদায় পুরুষকে ঈশ্বর জানিয়া সগৌরবে ভাল বাসিতেন, যথা নন্দিকেশ্বর, হনুমান্, গুহক, বিভীষণ, প্রহ্লাদ, নারদ, উদ্ধব, বসুদেব, দেবকী, পাটরাণী রুক্মিনী। অন্য এক সম্প্রদায়, পুরুষ

যে ঈশ্বর, তাহা না জানিয়া তাঁহাকে, নিজেদের মত সজাতীয়বোধে, অসঙ্কোচে ভাল বাসিতেন, যথা নন্দ, যশোমতী, সুবল, মধুমঙ্গল, চন্দ্রাবলী, কুন্দ, ললিতা, ঠাকুরাণী রাধা। ইঁহারা গোবিন্দের বিপদ আশঙ্কা করিতেন এবং অপ্রত্যক্ষ মহাবল কোনও ঈশ্বরের নিকট গোবিন্দের নিরাময় প্রার্থনা করিতেন; পুরোহিত বরণ করিয়া গ্রহ শান্তি করিতেন; মন্ত্রপুত রক্ষাকবচ গোবিন্দের দেহে বাঁধিয়া দিতেন এবং গোবিন্দের রোগ হইয়াছে বুঝিলে বৈদ্য আহ্বান করিতেন।

উক্ত দুই শ্রেণীর ভক্তই বড় ভক্ত। প্রিয় দেবতার বা প্রাণ গোবিন্দের নিকট কোনও বর প্রার্থনা করিতেন না, রাজ্য ও না, স্বর্গ ও না; বড় জোর কেহ সামীপ্য এবং কোনও সেবাধিকার যাচঞা করিয়া লইতেন; কোনও অভিমানিনী, বঁধুর সঙ্গে পূর্ব্ব পরামর্শ না করিয়াই বঁধুর সেবায় কায়মনোবাক্যের যাবতীয় চেষ্টার শুভ বিনিয়োগ করিতেন।

যশোদার বাৎসল্য, সুবলের সখিত্বাদি অলৌকিক-রস লৌকিক বাৎসল্য সখিত্ব হইতে কথঞ্চিৎ "যেন" বুঝা যায়। পরন্তু মধুর রস বুঝা যায়ই না বলিলে চলে। কৃপা ব্যতীত ইহার জাগরণ জীবহৃদয়ে হয় না; যখন হয় তখন জীব, কোন দৃষ্টান্ত উপদেশের অপেক্ষা না করিয়া তাহার আস্বাদন সহজেই পায়। অবশ্য যশোদার কৃষ্ণ অদর্শনে ও রাধার কৃষ্ণ অদর্শনে যে উৎকণ্ঠা তাহা ওজনে তুল্যই; এবং যশোদাকৃষ্ণ বা রাধাকৃষ্ণ মিলনে উভয়ত্রই তাহাদের পূর্ণ তৃপ্তি; কিন্তু তথাপি তটস্থের পক্ষে ভাবে ও রকমে রসের প্রভেদ ও উৎকর্ষ আছে। মধুরই মহোৎকৃষ্ট রস, মধুরই সর্ব্ব-প্রধান সেবা। সকল পুষ্পের, নানা জাতীয় সকল সৌরভ যথা সংগৃহীত হইয়া মধুতে রক্ষিত হয়, সেইরূপ মধুর রসে দাস্য সখ্য বাৎসল্যাদি সকল রসেরই সমাবেশ আছে। গৌরীশঙ্করের, সীতারামের, মহিষী রুক্মিণী ও দ্বারকানাথের সংযত বৈধ প্রণয়ে (?) এবং রাধাশ্যামের মনোহর চপল-

চরিতে অন্য সকল রসই বর্ত্তমান। ঠাকুরাণী স্বহস্তে গোবিন্দের জন্য মিষ্টান্নাদি পাকে ও ফুলশয্যাদি রচনাদ্বারা গোবিন্দের দাসী; নিজ কণ্ঠের পুষ্পহার কৃষ্ণকণ্ঠে দিয়াও নানা রসালাপে তৃপ্তি দান করিয়া গোবিন্দের সখী; শ্রান্ত গোবিন্দের ঘর্ম্ম-লাঞ্ছিত সুন্দর বদন নিজাঞ্চলে মুছাইয়া ও ও ব্যজনাদি করিয়া জননীর মত স্নেহবতী; কিসে কৃষ্ণ সুখী হয় তাহা "নিজ অনুমানে" জানিয়া চর্ব্বিত তাম্বুল কৃষ্ণ মুখে দিয়া ও প্রণয়ানুরোধে দুস্ত্যজ্য কুলশীলে অনাদর পূর্ব্বক দেহ পর্য্যন্ত দান করিয়া "সমর্থা" প্রেয়সী প্রধানা।

বৈধ প্রণয় বলিয়া কোন বস্তু নাই। সীতারামের কিম্বা অন্য কোনও প্রসিদ্ধ যুগলের অন্যোন্য প্রণয়ের হেতুটী বিবাহ নহে। প্রণয়টী অহৈতুক। প্রসঙ্গাগত বিবাহের কথা কিছু বলিব; স্বয়ংবরার বা পিতৃদত্তার বা অন্য বিধার সহ যে মিলন বা বিবাহ উৎসব তাহার বটে সামাজিক মর্য্যাদার ইয়ত্তা নাই। বিবাহিতাই দেবী; সমাজের কল্যানবিধাত্রী; যেহেতু উচ্ছৃঙ্খলতার নিদারুণ হস্ত হইতে ইনি যাবতীয় সমাজকে বহুদিন হইতে রক্ষা করিয়া আসিতেছেন। কিন্তু ইহাও জানিবেন যে, বিবাহের মর্ম্ম সামাজিক কুশল হইতে আরও গূঢ়। পতি-সেবার পতিব্রতা হইতে, অর্থাৎ সামাজিক পত্নীত্ব হইতে, পতির অধিক মঙ্গল, পারলৌকিক মঙ্গল, নারীরই হস্তে আছে ও সেই জন্য ইহাঁর নাম সহধর্ম্মিণী। এই রহস্য প্রবন্ধ উপসংহার সময়ে বিবৃত হইবে। প্রকৃতমণুসরাম। বৈধ প্রণয় শব্দটী সোণার পাথরবাটী শব্দের মত। ইহা হয়ত হয়। হইলে নিষেধ মানে না। ইহা সহজ বস্তু, না বিধীর অধীন, না নিষেধের অধীন। রাধা-গোবিন্দ প্রীতি বৈধও নহে, অবৈধও নহে; ইহা অলৌকিক ও জীবের চরম ইষ্ট। বিবাহিতের প্রণয় অপেক্ষা রাধাশ্যামের প্রীতিতে কিছু দুর্বিজ্ঞেয় অতিশয় আছে। এতদপেক্ষা দুর্ল্লভতর বস্তু মানবের কল্পনার অতীত।

এই সংসারে কখন কখন সহধর্ম্মিণীকে কিঙ্করী না বুঝিয়া সোহাগের ও পূজার সামগ্রী বুঝা হয়; সেই লৌকিক মধুর রস কতকটা অলৌকিক মধুর রসের অনুরূপ হইলেও উভয়ের মধ্যে মহদন্তর, যথা প্রতিবিম্ব বিম্বের সমতুল হইয়াও তুচ্ছ। অলৌকিক সখিত্ব বা বাৎসল্য রস দ্বারা সৌন্দর্য্যের উপাসনার মর্ম্ম লৌকিক ব্যবহার হইতেই কতকটা অনুমান করা যায়। সুবল কৃষ্ণের বন্ধু, যশোদা গোপালে বৎসলা শুনিয়া বিস্ময় হয় না। কিন্তু লৌকিক মধুর রস দ্বারা সৌন্দর্য্য পূজায় যথেষ্ট আদর সোহাগ স্নেহাদি উত্তম উপকরণ থাকিলেও তাহাতে একটা অভি-সম্পাত আছে; তাহা "কাম," "স্বার্থ," "নিজসুখ," কি পুরুষে কি নারীতে। অলৌকিক মধুর রসে "কাম" নাই। রাধা কৃষ্ণ হইতে নিজে সুখ চাহে না; কৃষ্ণকেই সুখী করিতে চাহে; তথা কৃষ্ণ নিজ সুখের জন্য রাধার সহিত মিলিত হইবার "কামনা" রাখেনা, মিলিত হইলে শ্রীমতী সুখী হইবে জানিয়াই শ্রীমতীকে সুখী করিবার জন্যই কৃষ্ণ রাধা সহ মিলিত হয়। কায়িক, বাচিক, মানসিক সর্ব্বপ্রকার সেবাতে কৃষ্ণকে সুখী হইতেই হয় ও হইলে গোপী অবশ্য সুখী হয়। এই ব্যবহারটি লৌকিক নহে; ইহা ব্যবহার বটে, কিন্তু ইহা বিপরীত ব্যবহার; বিম্ব-প্রতিবিম্ব একরূপ হইলেও যথা বিলক্ষণ; দুহিতা-চুম্বন ও কান্তা-চুম্বন যথাভাবে একরূপ ব্যাপার হইয়াও ভাবে অত্যন্ত পৃথক; তথাই কালে সঙ্গতি ও প্রীতি-মিলন অরসিকের স্থূল দৃষ্টিতে তুল্যরূপ বোধ হইলেও ভাবে, মরমে নিরতিশয় বিপরীত ও ইহা বিস্ময়কর। Plato মহাশয় ইহা হৃদয়ঙ্গম করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন এরূপ প্রবাদ আছে।

গোপীর সকল চেষ্টার তাৎপর্য্য কৃষ্ণ সুখে। গোপী কৃষ্ণের সেবাই ইচ্ছা করে; কৃষ্ণকে কামে, নিজ সুখের জন্য, ভোগ করিতে চাহে না;

কিন্তু যদি বুঝে যে গোবিন্দ আলিঙ্গনে অভিলাষী তবে গোপী যথা দেহাংশ হস্ত দ্বারা গোবিন্দের পদ "সেবা" করে, সেই ভাবেই, সেবা রূপেই, সমগ্র-দেহ, আলিঙ্গন চুম্বনের জন্য, অকাতরে দান করে এবং তাহাতে কৃষ্ণ সুখী হয় বলিয়াই গোপী নিজে অপরিমিত সুখানুভব করে। এই ব্যাপারটি আমাদের অপরোক্ষ নহে; ইহা যোগে যাগে আমাদের কল্পনাগোচর মাত্র হইলেও হইতে পারে। গোপী নিজে সেবক অর্থাৎ নারী অভিমান রাখে, এবং নন্দ সুবলাদি সকলকেই নিজের মত সেবক অর্থাৎ নারী বুঝে; মনে করে যে সুন্দর গুণবান গোবিন্দকে দেখিয়া আমার যেমন সর্ব্বতোভাবে সেবা করিবার লোভ হয়, তেমনই অপর সকলেরও হয়। নিজে ও অপর সকলে নারী হওয়ায় গোবিন্দ ব্যতীত দ্বিতীয় পুরুষ গোপী দেখে না; সুতরাং কোনও দ্বিতীয় পুরুষে অনুরাগ সম্ভাবনা মাত্র গোপীর নাই। সুতরাং গোপী একনিষ্ঠ সহজ-সতী। ব্রজবাসী পুরুষদেহী সুবলাদিও ধাতুগত নারী; পরমপ্রিয় কৃষ্ণ-সেবার চিন্তায় পূর্ণমনস্ক, কোনও ইতর চিন্তার অবসর শূন্য। সোঽকাময়তে...... প্রজায়েয়—শ্রুতির "কামের" কথা বলিতেছি না; কাম নামে নিজ ইন্দ্রিয়মূলক নরনারীর চেষ্টা-বিশেষের উল্লেখ করিতেছি।

অপিচ জগৎ সৃষ্টি হইবার পরে কামের জন্মলাভ হইয়াছে। কিন্তু জগৎসৃষ্টির পূর্ব্বেও পরমাপ্রকৃতি রাধিকার প্রেমালিঙ্গনে সুখবদ্ধ হইয়াই পরমপুরুষ গোবিন্দ বর্ত্তমান ছিলেন; তখন কাম ছিল না; এখনও, লৌকিক কাম সৃষ্টির পরেও, রাধাশ্যামে সেই অলৌকিক প্রীতিই আছে; কাম নাই। রাধিকার নিজ-সুখে অভিসন্ধি নাই; প্রিয়-সুখের জন্যই অবিরাম যত্ন আয়োজন আছে; যে তিনটি সামগ্রী লইয়া মাধুর্য্য,—তারুণ্য, কারুণ্য, লাবণ্য, তাহা গোপীর যথেষ্ট পরিমাণেই আছে। গোবিন্দ মাধুর্য্য হইতে সুখী হয়েন; তাহাই গোপী নিজ মাধুর্য্যকে

মধুরতর করিতে সদাই সচেষ্ট; কখনও বা সকল বেশভূষা পরিবর্জ্জন করিয়া, কখনও বা অতি বিচিত্র সজ্জার পরিপাটী বিন্যাস করিয়া গোবিন্দ-মোহন সিন্দূর রচনা করিয়া, গোবিন্দপ্রিয় চরণাম্বুজে নূপুরঝঙ্কৃতি যোজনা করিয়া, গোবিন্দকণ্ঠে সলাজ সহাস সতৃষ্ণ লগ্না হইয়া গোবিন্দকে সুখী করেন। গোপীর কথাই সঙ্গীত, চলনই নৃত্য ও হাস্যই জ্যোৎস্না; এবং সেই সকল অপূর্ব্ব সম্পত্তিতে নিজস্ব মানিয়া গোবিন্দের বড়ই গরব, বড়ই সুখ। গোবিন্দকে নিজ-সেবায় সুখী বুঝিলেই—এবং গোপী যে তাহা না বুঝে, এমন নহে—গোপীর বড়ই গরব, বড়ই সুখ।

মধুর প্রীতি, পুরুষে পুরুষে বা নারীতে নারীতে হয় না; ইহা নারী-পুরুষেই হয়। লৌকিক আমরা পুরুষদেহে অভিমানী হইয়া আপনা-দিগকে ভ্রমে পুরুষ মনে করি; লৌকিক নারীগণও পুরুষদেহ দেখিয়া তত্রস্থ জীবগণকে ভ্রমে নানা পুরুষ মনে করে; ফলে স্বার্থ অর্থাৎ নিজ নিজ কামতৃপ্তির লালসা হইতে কদর্য্য পরকীয়াদি ভাবের আরোপ মধুর রসে হইয়া যায়। পূর্ব্বেই বলিয়াছি ইহা দারুণ পরিতাপ, ইহা দুর্জ্জয় অভিসম্পাত। কিন্তু কথাটা এই যে উজ্জ্বল রস অতি পবিত্র; তত্র এক অদ্বিতীয় 'পুরুষ' ব্যতীত সকলেই সেবক নারী সুতরাং পরস্পর কামশূন্য এবং সকলেই নিজ নিজ ভাব অনুসারে "এক" পুরুষ গোবিন্দে অনুরক্ত। লৌকিক পরকীয়ারসে একটা উন্মাদকরী তীব্র উৎকণ্ঠা আছে; তাহাই মাত্র অলৌকিক প্রীতির তীব্রতা, গাঢ়তা, অসাধারণতা, অন্যোন্য-দুর্ল্লভতা, আনন্দব্যাকুলতাকে কথঞ্চিৎ বুঝাইবার জন্য উল্লিখিত হয়। লৌকিক রসে তীব্রতা থাকিলেও ভোগসামর্থ্য থাকে। অলৌকিক রসের তীব্র-তরতা, অতিতীব্রতা এই যে, তাহাতে শরীর স্তম্ভিত, মন পবিত্রভাবে পুলকিত, মদন মূর্চ্ছিত ও ভোগ সামর্থ্য অন্তর্হিত থাকে। বস্তুতঃ রাধা-শ্যামের প্রীতি স্বকীয়া প্রীতি; রাধার দৃষ্টিতে দ্বিতীয় পুরুষ না থাকায়

পরকীয়া প্রীতিপ্রসঙ্গটা আসলে একেবারেই ভিত্তিশূন্য। ইহা রসোল্লাসের জন্য, কল্পিতমাত্র। রাধার পক্ষে নন্দও নারী, সুবলও নারী, রাধার স্বামী অভিমন্যুও নারী।

রাধাশ্যামের রাজ্যে মদন বা মদনপীড়া নাই। বিরহজ্বালা, মদনপীড়া বশতঃ নহে। সকল নারী ভালবাসে একই প্রাণগোবিন্দকে, প্রিয় গোবিন্দকে, জয় গোবিন্দকে। গোবিন্দই পুরুষ, দ্বিতীয় পুরুষ নাই; সকল গোপীই সুতরাং সহজ পতিব্রতা, বিনা বিচার, বিনা শাসন, বিনা বিধি। ভালবাসার পাত্রকে না দেখিতে পাইলে, না চুম্বনালিঙ্গন করিলে, না চুম্বিতালিঙ্গিতা হইলে গোপী বিরহকাতরা হয়। ব্রজভূমিতে মদন নাই। দ্বারকায় ভবিষ্যতে প্রদ্যুম্নের বটে জন্ম হইবে। বর্ত্তমানে রাধা-গোবিন্দের আলিঙ্গনে মদন মধ্যস্থ নহে। মিলনে, বিরহে, সুখে জ্বালায়, আছে কেবল স্বার্থশূন্য শুদ্ধ প্রীতিমাত্র। শিবজীও মদনকে ভস্ম করিয়া পরে কেবলা শুদ্ধাপ্রীতির দুর্ল্লভ অনুভব করিবার লোভেই দেবীকে স্বীকার করিয়াছিলেন। রসিক বিবেচক ভক্তগণ ভস্মীভূত মদন এবং মূর্চ্ছিত মদনের মধ্যে একটা গুরুতর প্রভেদ অনুভব করেন। বিদ্বদনুভব নাকি প্রমাণচূড়ামণি।

লৌকিক নরনারীদেহের গঠন-চিহ্নভেদ অবলম্বন করিয়া 'কাম আপনাকে ব্যক্ত করে। অলৌকিক রাধাশ্যামদেহে গঠনভেদ বর্ত্তমান থাকিলেও তৎসম্বন্ধে তাঁহাদের উভয়েরই অত্যন্ত বিস্মৃতি ও সুতরাং, কন্দর্প অনুপস্থিত অথবা উপস্থিত হইয়াও মূর্চ্ছিত; অথচ পরস্পরের সার্ব্বাঙ্গীন আলিঙ্গন ও সর্ব্বাঙ্গ চুম্বনে অতি চঞ্চল আগ্রহ ও মহতী প্রীতি। চণকবৎ। জীবদেহে, পুষ্পশরীরে, নর ও নারীভেদ, পরাগ ও গর্ভকেশর ভেদ আছে। কখনও কখনও একই ফুলে পুরুষ কেশর ও আধার-কেশর দেখা যায়। অভিষিক্ত নর বা নারী নিজ দেহ একাধারেই কুণ্ডলিনী

শক্তি ও শিবপুরুষ এবং শক্তিপুরুষের মেলন-উত্থ পরমানন্দ অনুভব করিতে চাহেন; যথা একটী চণক লও; দেখিবে ত্বগাবরণ অন্তঃপুরে দুইটী দল বা দানা আছে; তাহারা ভবিষ্যতে অঙ্কুর উৎপাদন করিবে; সুতরাং তাহারা নরনারী। কিন্তু গঠনে এত সমান যে কোন্‌টী পুরুষ, কোন্‌টী নারী, ধরা যায় না; তাহারা পরস্পর দৃঢ়ালিঙ্গিত। চণকবৎ রাধাশ্যাম যুগলের কে যে নারী, কে যে পুরুষ এই অনুসন্ধান উভয়েরই নাই; তাহা তাহারা ভুলিয়াছে এবং ভোলা অবস্থাতেই শুদ্ধ প্রীতি বশতঃ নিবিড়ালিঙ্গন-সুতৃপ্ত, কত যে তাহাদের অন্যোন্য প্রীতি তাহার পরিমাপক কিছু নাই, তুলনা নাই; তাহা নিষেধ মুখে বুঝিতে হয়। তত্র বিলোল তরঙ্গ কটাক্ষ আছে; যুগল শরীরে স্বেদকম্প আছে, উভয়ের মুখে চক্ষুতে ভুবন-ভুলান হাসি আছে, মহাভাবব্যঞ্জক রুদ্ধকণ্ঠ আছে এবং কোমলাভিরাম বাহু-বেষ্টন আছে, কিন্তু "নাই" মদন। লৌকিক রস হইতে কাম নিষেধে অলৌকিক প্রীতি কথঞ্চিৎ বুঝা যায়; যেমন "ক"র ভিতরে "ব" আছে; "ক"র আঁকড়ি-নিষেধে "ব" পাওয়া যায়। তত্র কেবলা শুদ্ধ প্রীতিরই ভরপূর প্রকাশ ও আধিপত্য। প্রীতির মিলন পুরাতন হয় না। প্রতি মিলনই প্রথম সমাগমের মত সমান উল্লাসময়। এই প্রীতি নিষেধমুখে বুঝাইতে হয় বলিয়াই প্রথমে কামের উল্লেখ করিতেই হয়। বালকাদি যাহারা কাম বুঝে না, তাহারা মধুর প্রীতিও বুঝিতে অক্ষম। ইহা মণিপদ্ম, গৌরীপট্টাসনে শিব, Rose and Cross প্রভৃতির পূজা নহে। ইহা প্রজাসৃষ্টির অর্থাৎ জননী-শক্তির অথবা প্রজননাভিপ্রায়-বর্জ্জিত রতিকামেরও উপাসনা নহে; ইহা কামগন্ধশূন্যা প্রীতিঠাকুরাণীর দ্বারা প্রিয়গোবিন্দের সেবার কথা! শ্রীমতীর বড়ই বিস্ময় হইত; নিজের কলঙ্ক কথা শুনিয়া কিছুই বুঝিতে পারিতেন না; বলিতেন যে রাখাল বালকেরা কৃষ্ণসঙ্গ করে, কৃষ্ণালিঙ্গিত হয়;

তাহাদের কোনও কলঙ্ক রটে না, কেহ তাহাদের সম্বন্ধে কোনও বিঘ্নাচরণ করে না ; কিন্তু আমি সেই শ্যামলসুন্দরেরই সহ মিলিত হইলে কেনই বা আমার অপযশ ও এত বিঘ্ন বিস্তার হয়। ইহা সরলা প্রীতির সরল মরম কথা। ইহা স্পষ্টই পবিত্র উজ্জ্বল রস। ইহাতে কাম কোথায় ?

আমাদের মধ্যে যিনি যতটা নিষ্কাম, সংযমী, সচ্চরিত্র ও নিষ্পাপ হইবেন, তিনি প্রীতি ঠাকুরাণীকে ততই অধিক বুঝিতে পারিবেন। কিন্তু যতই বুঝিতে পারিবেন তাঁহার ততই "বোধ" হইবে যে তিনি অজ্ঞ, পতিত ও দেবীর কৃপার অযোগ্য। তাঁহার সর্ব্বদা একটা উৎকণ্ঠা জাগরূক থাকিবে যে, কবে বা কৃপা হইবে ; কবে যুগল-প্রীতির মরম বুঝিব ? এই ব্যক্তিই গুরু, নরোত্তম। ইনি নর হউন, নারী হউন, তুমি নর হও নারী হও, ইঁহার সঙ্গ কর, ইঁহার শরণ লও।

বেদান্তের ব্রহ্ম মহাশয়ও যেমন অটল নির্বিকার, হ্লাদিনী রাধিকার ভালবাসাও তেমনই ধৈর্য্যচ্যুতিকরী, বিবেক-হারিণী, আহোল্লাসকরী। শ্রীমতী জাতিকুল বিসর্জ্জন করিয়া ব্রহ্ম গোবিন্দকে ভালবাসে এবং বিনিময়ে কিছু চাহে না। গোবিন্‌জী বড় ফাঁপরে পড়িয়া গিয়া ঋণী হইয়াছেন। ঠাকুরাণীর নিঃস্বার্থ পীরিতি বিনিময়ে যাহা কিছু তিনি দিতে প্রস্তুত, তাহা ঠাকুরাণী অঙ্গীকার করে না। সর্ব্বশক্তিমান এবং পরম চতুর হইয়াও গোবিন্দ এমন কিছু বস্তু আবিষ্কার করিতে অক্ষম যাহাতে দেবীর লোভ হইতে পারে। স্ববশ, স্বতন্ত্র নির্বিকার গোবিন্দ উপস্থিত অবশে প্রেমপরতন্ত্র ও রাধাবশ। নিরুপায় গোবিন্দ রাধাঋণ পরিশোধ করিবার জন্য, রাধা তাঁহাকে যতটা ভাল বাসে তিনি রাধাকে ততটা ভাল বাসিবার চেষ্টা করেন। পারেন না। ঋণশোধ রূপ উদ্দেশ্য ও চেষ্টা এই দুটি বস্তু গোবিন্দের ভালবাসাকে রাধার অহেতুক সহজ ভালবাসা হইতে ন্যূন করিয়া

ফেলে। রাধার গোবিন্দ প্রীতিতে কোনও উদ্দেশ্য বা চেষ্টা নাই—তাহা নিরতিশয় সহজ, স্বাভাবিক। সুতরাং গোবিন্দ ঋণী; ঠাকুরাণীই মহাজন। গোবিন্দ ভুবনমোহন বটে; কিন্তু শ্রীমতী ভুবনমোহন-মোহিনী। গোবিন্দ ও ব্রহ্ম, রাধিকাও ব্রহ্ম, তবে বড় ব্রহ্ম; প্রীতিই, আনন্দই, হ্লাদিনী রাধাই ত গোবিন্দের ব্রহ্মত্ব।

আমার গুরু তাঁহার চরণকমল আমার মস্তকে সৌভাগ্য-তিলকের মত সস্নেহে ধারণ করিয়া উপদেশ করিয়াছেন যে, জীব মাত্রই সেবক হিসাবে নারী; গোবিন্দ মহাবীর, মহাভদ্র, রসজ্ঞ এক অদ্বিতীয় পুরুষ। তিনি নবনীত-কোমলা, নবযৌবনসম্পন্না, স্নেহমুগ্ধা অথচ স্বভাববিদগ্ধা, লোল-কটাক্ষ-সন্ধানবতী নওলকিশোরীকে সসম্ভ্রম, সগৌরব নিত্যপূজা ও নিত্যসেবা করিতে চাহেন এবং নিত্যই বলেন যে "রাধিকে! তুমিই আমার মূলমন্ত্র, তুমিই হরিনাম"; কিন্তু তথাপি আশ্রয় জাতীয় প্রীতি, বিষয় জাতীয় প্রীতি অপেক্ষা গরীয়সী অর্থাৎ রাধার কৃষ্ণপ্রীতিটির তুলনায় কৃষ্ণের রাধাতে প্রীতি কিঞ্চিৎ লঘু। রাধার কৃষ্ণের উপর যে প্রীতি তাহার পরাকাষ্ঠা জাতি কুল বিসর্জ্জনে নহে; ততোধিক। "যদিই" গোবিন্দ অন্যা ললনাতে লালসাবান হয়েন, তাহা জানিতে পারিলে "সমর্থা" নায়িকা সাক্ষাৎ শুদ্ধ-ঘন-স্নেহ-মুর্ত্তি শ্রীরাধিকা, হর্ষ ঈর্ষ্যার অপূর্ব্বরসমেলন আবিষ্কার করিয়া, যে কোন প্রকারে হউক অনুনয় দৈন্য বা সেবা দ্বারা সেই ললনাকে বশীভূত করিয়া গোবিন্দের অঙ্কসিংহাসনে স্থাপিত করিয়া গোবিন্দকে সুখী করিতে পারেন। তাহাতে গোবিন্দ লজ্জিত হইবেন সন্দেহ নাই; কিন্তু রাধার অভিপ্রায় যে তাঁহাকে সুখী করা, তাঁহার সেবা করা, তাঁহাকে লজ্জা দেওয়া নহে, তাহাও গোবিন্দ উপলব্ধি করিবেন। গোবিন্দ এতটা প্রীতির পরিশোধ সম্ভাবনা ঘটাইতেও অসমর্থ, যেহেতু অন্য দ্বিতীয় পুরুষই নাই যাহাতে রাধিকার অনুরাগ হইতে পারে এবং

গোবিন্দ অঋণী হইবার জন্য সেই পুরুষ সহ রাধার মিলনে আনুকুল্য করিতে পারেন। তজ্জন্য গোবিন্দ বড়ই জব্দ হইয়া আছেন; বড় সুখে মধুরভাবে জব্দ; ক্রুদ্ধ হইবার যো নাই। কটাক্ষবাণে বিদ্ধ, প্রীতি-শৃঙ্খলে নিগড়িত, পুষ্পমালায় বদ্ধ, ভুজবেষ্টনে বন্দী হইলে কে বা ক্রুদ্ধ হয়? অন্যের অজেয় গোবিন্দ, কিন্তু প্রীতি-প্রতিমার নিকট পরাজিত হইয়াই তাঁহার অসীম আনন্দ। পরাজিত গোবিন্দকে না হয় ছোট নাই বলা গেল, ঠাকুরাণীকে ত বড়ই বলিতে হইবে। তাহাই বল; বলিলে গোবিন্দ রুষ্ট না হইয়া সন্তুষ্ট হইবেন; তোমরা গোবিন্দের হাস্যবদন দেখিতে পাইবে, দেখিতে পাইয়া পুলকিত চরিতার্থ হইবে। একটা আসল কথা বলিব, শুন মন দিয়া শুন। রাধা গোবিন্দ নিত্যতৃপ্ত; লীলা করিয়া তাঁহাদের কোনও নিজতৃপ্তি সম্পাদন করিবার কিছুমাত্র আবশ্যক নাই। প্রশ্ন উঠে যে, তবে লীলার হেতু কি? হেতুটী তাঁহাদের অসীম করুণা। এই যে রাধার জয়ে পরাজিত গোবিন্দের আনন্দলীলা ইহার উদ্দেশ্য এই যে, হতভাগ্য জীবের সৌভাগ্য হউক; জীব এই মধুর হইতে সুমধুর অলৌকিক প্রীতি-দেবীর জয়লীলারস চর্চ্চা ও আস্বাদন করুক। হে জীব, তুমি তরুণ যুগলের এই করুণ ব্যবহার স্মরণ করিয়া নিত্য কৃতজ্ঞ হও ও রাধা গোবিন্দের নিত্য জয়গান কর।

জীব, অলৌকিক অর্থাৎ স্বার্থশূন্য প্রীতির কিঞ্চিৎ পরিচয় পাইলেই পরস্পর দ্বেষ ত্যাগ ও প্রীতি অনুভব করিবে; তাহার স্বভাবক্রমেই শুদ্ধ, ও বিষয়বিশেষে বজ্র হইতে কঠিন ও শিরীষ হইতেও কোমল হইতে থাকিবে। নরদেহীগণ কর্ম্মবীর হইবে, নারীদেহী শক্তিরূপিনীগণ, সেই কর্ম্মভারক্লিষ্টগণকে পিতা স্বামী ভ্রাতাকে অসহায় শিশুর প্রতি স্নেহময়ী মাতার মত ভালবাসা দিয়া, সদনুষ্ঠানে উৎসাহিত করিয়া তাহাদের অন্তরে বলসঞ্চার করিবে। পতিপত্নী উভয়ে একত্রে রাধাগোবিন্দমন্ত্রে দীক্ষিত

হইয়া—উভয়েই শয়নমন্দিরে একের প্রমাদ সময়ে অপরে অপ্রমত্ত থাকিয়া পরস্পর নিষেধ পূর্ব্বক, কামবর্জ্জনাভ্যাস পথে—উভয়েই সখী ভাবে দুর্ল্লভ যুগল ভজনাধিকার লোভে, পরস্পর জ্ঞাতসারে, নিজ নিজ নারীত্ব উপলব্ধির চেষ্টায় অন্যোন্য উত্তরসাধক হইবে। পত্নীর এই উত্তর-সাধকত্বই সহধর্ম্মিনীত্ব। নরনারী মিলনের,বিবাহের সামাজিকত্ব হইতে এই সহধর্ম্মিনীত্বই পরম গৌরব। প্রত্যেক নবদম্পতী প্রথমে না পারেন মধ্য যৌবনেই কথাটা বুঝিতে চেষ্টা করিবেন। কল্যাণ কামী বৃদ্ধ বৃদ্ধাগণ ত নিশ্চয় করিবেন। তাঁহাদের আয়ু অল্প; উদ্যোগে অবহেলা করিলে চলিবে না। মৃতের সাধনও নাই, সিদ্ধিও নাই।

"সংসার গোবিন্দের; আমি গোবিন্দ-নিয়োজিত, গ্রাসাচ্ছাদন মাত্রই আমার পূরা বেতন; শিষ্টগণ, অসহায় শিশুগণ, ও দুর্ব্বলচিত্ত যুবক যুবতী-গণ ও অপটু বৃদ্ধগণ গোবিন্দের পরিজন; আমি তাহাদের রক্ষণ পালনের জন্য নিযুক্ত।" এই কথাটা বুঝিয়া জীবন নির্ব্বাহ কর, প্রহ্লাদের মত। ইহা ঈশ্বর-গোবিন্দের পূজা। অথবা যদি অকাম শুদ্ধ প্রীতির উদ্দেশ পাইয়া থাক তবে ললিতার মত, ঠাকুরাণীর পূজা কর, ঠাকুরাণীকে পাইলেই তত্র তাঁহার প্রিয়, তদধীন, গোবিন্দকেও পাইবেই পাইবে। ইহা যুগল উপাসনা, চরম ইষ্ট। কামের ক্ষয় ও যুগল প্রীতির উদয় অপেক্ষা অর্থাৎ রাধা-গোবিন্দের কৃপায় রাধা-গোবিন্দ সামীপ্য-প্রাপ্তি অপেক্ষা ইষ্টতম সম্পত্তি রাধা-গোবিন্দের ভাণ্ডারেও নাই। আত্মসমর্পণ হইতে অধিক দান সর্ব্বশক্তিমানেরও সাধ্যাতীত।

যিনি মৎসদৃশ ঊষর ভূমিতে উপদেশ-বীজ রোপন করিয়াছেন এবং কৃপা বরিষণে তাহা অবলীলাক্রমে অঙ্কুরিত করিতে পারেন এবং করিবেন, সেই পরমারাধ্য শ্রীগুরুর চরণাম্বুজে কোটী কোটী নমস্কার করি, কোটী কোটী নমস্কার করি।

ঠাকুরাণীর কথা

প্রতিপাদ্য নির্দ্দেশ।

(১)

"যে গুরুচরণারুণোদয়ে হৃদয় কমলের স্ফূর্ত্তি হয়, বিকসিত কমলে সেই গুরুর নিত্য বসতি হউক। শ্রী গুরুর স্নেহাভিষিঞ্চিত রাইকনক-লতাবেষ্টিত কৃষ্ণতমাল যত্র বিরাজমান, যত্র নিবিড়ান্ধকারের মত গোবিন্দ নীলমণির দুর্লক্ষ্য দুর্ল্লভ মূর্ত্তিকে লোকলোচনের সুলভ করিবার জন্যই করুণাময়ী রাই চন্দ্রবদনী উজোর দীপরূপে শ্যামল সুন্দরের নিত্য সহচরী, সেই ধন্য ব্রজভূমির জয় হউক!

গত ১৩২০ সালে মানসী পত্রিকায় "আমি" নামধেয় সচ্চিদানন্দ অভয় ব্রহ্মের ওকালতী করিয়াছি। ব্রহ্ম মহাশয় নির্গুণ বলিয়া কিছুই পারিশ্রমিক দেন নাই; পারিতোষিক ত দূরের কথা। এবার ঠাকুরাণীর মনস্তুষ্টির চেষ্টা করিব।

ঠাকুরাণীকে আপনারা সকলেই জানেন। নানা সুমধুর নামে ইনি আপনাকে প্রচার করিয়া রাখিয়াছেন; যথা রস, আনন্দ, প্রীতি, পীরিতি স্নেহ, আদর, সোহাগ, ভালবাসা। শ্রীরাধিকাই ইহাঁর নেদিষ্ট নাম। এই নামে আহূত, নিমন্ত্রিত হইলে ইনি নিরতিশয় তুষ্টা হয়েন।

সামান্য বিশেষ—রসবস্তু সামান্যতঃ জানা থাকিলেও ইহার সমগ্র বিশেষ সন্ধান কাহারও জানা নাই। ইহা অগাধ অপার সমুদ্র;

কেহই ইহার তলস্পর্শ করে নাই ; কোনও সন্তরণপটু ইহার পারদর্শী হয় নাই। ইহা অসীম আকাশ ; উড়িয়া কেহই ইহার সীমা নির্দ্দেশে সমর্থ হয় নাই। এই রসের মূর্ত্তি ভুবনমোহন : যে দেখে সেই মুগ্ধ, 'উনমত্ত' হয়। স্বয়ং রসমহাশয় দর্পণে নিজ মূর্ত্তি দেখিয়া স্বয়ং মুগ্ধ লুব্ধ হইয়া নিজে ব্রজে রসভোক্তা রাই হয়েন, এবং নদীয়ার গৌরাঙ্গসুন্দর হয়েন। ইঁহার মহিমার কথা কি আর বলিব।

শান্ত, নির্বিশেষ, নিস্তরঙ্গ সমুদ্রবৎ সমাধি রস, সুষুপ্তিরস, ব্রহ্ম রস ; তাহাই বিশিষ্ট হইলে, তরঙ্গায়িত হইলে, প্রথম তরঙ্গ আদিরস, মধুররস। সেই আদি রস আপনাকে অনুলোম ক্রমে, নানারূপে, যথাক্রমে বাৎসল্য সখ্য দাস্য রস রূপে বিবর্ত্তিত, পরিণত করে। উক্ত রস পরিণাম গুলির সামান্য নাম "প্রীতি" ; ইহাদের মধ্যে দাস্যটী "প্রীতি" ভূমিকা এবং "ভক্তি" ভূমিকার সন্ধিস্থলে, সীমান্ত প্রদেশে বর্ত্তমান ; তত্র মহিমা-ঐশ্বর্য্য-বর্জ্জিত দ্বিভুজ বংশীবদন কৃষ্ণে ত্রাসরহিত "নিঃসঙ্কোচ প্রীতির" এবং মহিমান্বিত ঈশ্বরে, দ্বিভুজ দ্বারকানাথ, চতুর্ভুজ বাসুদেব, পঞ্চবদন, শিবজী, দশভুজা দুর্গা, গজতুণ্ড গণেশ প্রভৃতি দণ্ডানুগ্রহ সমর্থ প্রভুতে সগৌরব "সঙ্কোচ দাস্যের" সাঙ্কর্য্য দেখা যায়। তত্র দাস্যের সঙ্কোচের মাত্রা কিছু কম এবং নিঃসঙ্কোচ ভালবাসার প্রথম উদয় হয়। যথা শুভ্র গঙ্গা ও নীল যমুনার সঙ্গম স্থলে, ঠিক রেখা পাত করিয়া তাহাদের পার্থক্যের সুনির্দ্দেশ হয় না, তথা ভক্তি রসের উচ্চ সীমায় ও প্রীতি রসের নিম্ন সীমায় ব্যামিশ্রণ থাকেই ; পুরাতন পাকা দাস ভরসা করিয়া ঈশ্বরকে পিতা, মাতা, এমন কি সন্তান, স্বামী পর্য্যন্ত বলিতে পারে ; প্রীতির রাজ্যে কেহই কৃষ্ণকে পিতা মাতা বলে না—বংশমর্য্যাদা ও আভিজাত্যে তুল্যমূল্য সখা বা লাল্য সুতরাং ক্ষুদ্র বৎস বা প্রেমালিঙ্গনের যোগ্য বরনাগর মনে করে। আদিরস আপনাকে শান্ত ভাব হইতে প্রকট করিয়া যথাক্রমে বাৎসল্য সখ্য দাস্য

পরিণাম অঙ্গীকার করিয়া পরে "ভক্তি" রূপে পরিণত হয়; অনন্তর বিলোম ক্রমে ঈশ্বরে দাস্য পিতৃত্ব মাতৃত্বাদি ভাব ত্যাগ করিয়া "ভক্তিভাবে"ই গোবিন্দে প্রীতিমান্ প্রীতিমতী হইয়া গোবিন্দকে সখা পুত্র ক্রমে বরনাগর বুঝিয়া আদিরসে পুনরায় উপস্থিত হয়; যথা সমুদ্রের জলই মেঘবৃষ্টি বরফ নদ নদী হইয়া অবশেষে সমুদ্রেই প্রত্যাবর্ত্তন করে। তদনন্তর তরঙ্গায়িত ভাব সম্যক্ বর্জ্জন পূর্ব্বক বার্হদারণ্যক "প্রিয়য়া স্ত্রিয়া সংপরিষ্বক্তো ন বাহ্যং কিঞ্চন বেদ, নান্তরং' অবস্থা স্বীকার করে; তখন পুরুষ জানে না যে সে পুরুষ, নারী জানে না যে সে নারী। এই যে অদ্বয় নিস্তরঙ্গ ব্রহ্মানন্দ তাহাই ত তৈত্তিরীয় "রসো বৈ সঃ"। ইহাই কুঞ্জমধ্যে রাধালিঙ্গিত সুষুপ্ত গোবিন্দ; ইহাই গৌরীপট্টে লিঙ্গ মূর্ত্তি প্রাচীন শিবমদ্বৈতং। এই সুযুক্তি ও সুষুপ্তি হইতে মুক্তি, পুনরায় সুষুপ্তি, ইহার পৌনঃপুন্যই সত্য; সত্য বলিয়া ইহার অপলাপ করা সম্ভব নহে; ইহা কোনও বাধা মানে না, আপনাকে আপনি প্রকট করে ও প্রতিসংহার করে। ইহার বৃহৎ বিচারণা, ইহার মর্ম্ম, শ্রীমদ্রূপ গোস্বামীর দুই নাটক বিদগ্ধমাধব, ললিত-মাধব ও উজ্জ্বল নীলমণি রস গ্রন্থে এবং চৈতন্য চরিতামৃতে ও মহাজনী পদাবলীতে দ্রষ্টব্য। বর্ত্তমান প্রবন্ধটী ক্ষুদ্র মুখবন্ধ মাত্র।

আদি রসের পরিণাম-পদ্ধতি সংক্ষেপে বর্ণন করিব।

একটী বালিকা লও; বর্ত্তমানে সেটী রসবর্জ্জিত—sexless। ক্রমে সেই কন্যাতে গর্ভধারণ পথে পবিত্র আদিরসেই কন্যাকে জননীত্ব প্রদান করিয়া আদিরসই আপনাকে পবিত্র বাৎসল্য রস রূপে ব্যবস্থিত করে। বৎসলা জননী পুত্রের বিনোদবর্দ্ধনার্থ শিশুর মত হইয়া, নিজে শিশুত্বের অভিনয় করিয়া; সন্তান সহ পুতুলখেলা, ধূলাখেলা করিয়া থাকে। তবেই দেখা গেল যে, বাৎসল্য রসই সখ্যরসরূপে আপনাকে বিবর্ত্তিত করিল। বাৎসল্যই শিশুর শয্যা আহার্য্যাদির পারিপাট্যবিধানে দাস্যরসরূপ পরিণতি

প্রাপ্ত হয়। মৌলিক আদি রসই যে, যথাক্রমে বাৎসল্য সখ্য দাস্য রস রূপাবস্থিত হইল তাহা উক্ত দৃষ্টান্ত হইতে বুঝা গেল।

জগতে রসের "মাত্রা" মাত্র, বিন্দু কণিকামাত্র আছে; তাহাই আমাদের উপজীব্য এবং তাহারই আস্বাদন হইতে আমাদিগকে সমুদ্র রসের পরিচয় পাইতে হইবে, যোগে যাগে বুঝিতে হইবে। বৃহদারণ্যক ৪।৩।৩২ শ্রুতিটী এই যে "এতস্যৈব আনন্দস্য অন্যানি ভূতানি মাত্রামুপজীবন্তি।" এই অন্ধকারময় জগতে থাকিয়াও যাঁহারা রাধারাণীর কৃপাপাত্র এবং ভোরের পাখীর মত গাঢ় অন্ধকারে থাকিয়াও নিকট ভবিষ্যতে ভোরের বিষয়ে অসন্দিহান ও ভোরের সঙ্গীত গাহেন, ব্রজের কথা কহেন, সেই সকল গোস্বামীগণের কথা হইতেই রস সামগ্রী বুঝিবার আশা রাখিতে হইবে। যথা যাহারা স্বচক্ষে যুদ্ধ ও যুদ্ধের সরঞ্জাম বন্দুকাদি দেখে নাই; তাহারা যে সৈনিক যুদ্ধ দেখিয়াছে ও করিয়াছে ও তত্র একখানি পা খোয়াইয়াছে, সে যখন Shoulders his crutch and shews how fields were won সেই অভিনয় হইতেই crutch দেখিয়া বন্দুক ও অঙ্গবিন্যাস ও চালনা হইতে যুদ্ধ বুঝিয়া লয়।

মোটের উপর তিনটী লোক আছে। ব্রহ্মলোক, প্রীতিলোক ও ভক্তিলোক। ব্রহ্মলোকটী সুষুপ্তি। প্রীতিলোকটী জগৎ, পরিণাম; প্রীতিরসের আবাস ভূমি ব্রজ গোলোক; এবং ভক্তিলোকটী স্বপ্ন, বিবর্ত্ত; ভক্তিরসের আবাসভূমি ব্রজোপকণ্ঠ মথুরা দ্বারকা বৈকুণ্ঠ হইতে আরম্ভ করিয়া এই জগৎ ও পাতালাদি সমস্ত দেশ। ব্রজেতর সমগ্র দেশের অন্যতম স্থলে থাকিয়া লৌকিক রসাবলম্বনে, লৌকিক রসে যাহা কিছু দোষ কশুর আছে তাহার সাধ্যমত অপবাদ করিয়া ব্রজের বিশুদ্ধ রস বুঝিতে হয়।

দোদুম্ব ইতিঃ—একটীর নাম কাম, স্বার্থ; অপরটীর নাম

অনিত্যত্ব, অস্থায়িত্ব। কামটী প্রমাতা গত; প্রমাতা জীব যখন বলে যে 'হে কুটুম্বগণ, প্রতিবেশীগণ, জগৎবাসীগণ, তোমরা সকলে আমাকে সুখী কর,' তখন জীব স্বার্থপর, কামুক। প্রমাতা জীব যখন বলে 'গোবিন্দ তুমি ভুবনমোহন; আমি তোমাকে সুতরাং অবশে ভালবাসি, তুমি আমাকে তোমার সেবা করিতে দাও এবং সমস্ত জগজ্জন তোমার প্রিয় পরিবার, তোমার ভালবাসার পাত্র, সুতরাং আমিও জগজ্জনকে ভাল বাসিয়া সেবা করিব; তুমি সেই শক্তি আমাকে দাও'—তখন জীব প্রেমিক। স্বার্থে সুখান্বেষণটী কাম এবং প্রিয়জনের সুখের জন্য যাবতীয় চেষ্টার প্রয়োগই প্রীতি।

অনিত্যত্ব দোষটী বিষয়গত। যে সকল বিষয়াবলম্বনে সুখ প্রাপ্তির আশা সেই বিষয় সকল অনিত্য; রূপান্তরিত হয় বলিয়াও অনিত্য এবং সংহার প্রাপ্ত হয় বলিয়াও অনিত্য। আমরা কিছুতেই বি'য় সকলকে নিত্যত্ব দান করিয়া সুখের ধারাটীকে অবিচ্ছিন্ন প্রবাহবৎ রাখিতে পারি না; অনিত্য ব্যবহার জগৎকে স্থায়ী করিয়া সুখের স্থায়িত্ব সম্পাদন করিতে পারি না; অধিকন্তু সুখের বিষয়গুলি সর্ব্বদা সুলভও নহে। আমার অনিচ্ছায় দেহে ব্যাধি হয়, আমার অনিচ্ছায় পুত্র বধুবশ বা নেশাবশ হইয়া বিদ্রোহী হয়; কখনও সুপুত্র মরিয়া যায়; কন্যা বিধবা হইয়া পীড়াকর হয়; তৃষ্ণার সময়ে জল পাওয়া যায় না; অসহায় শিশু পুত্রে যতটা স্নেহ থাকে তাহা, বালক বয়স্ক সমর্থ হইলে লঘু হইয়া, যেন একটা হতাশ বিষাদের হেতু হয়।

এই দুই দোষ পরিহার করিতে হইবে, দুষ্ট রসকেই শুদ্ধ করিতে হইবে। ডবল-ইউ অক্ষরকে উল্টাইয়া "এম" করিতে হইবে; বাসুদেবের দুইটা অতিরিক্ত হস্ত নিষেধ করিয়া দ্বিভুজ মুরলীধরকে পাইতে হইবে। লৌকিক ব্যাকরণ উল্টাইতে হইবে। পুংলিঙ্গ শব্দ ইন্দ্র ব্রাহ্মণাদি শব্দকে

প্রধান করিয়া তদধীন স্ত্রী প্রত্যয় সিদ্ধ ইন্দ্রানী ব্রাহ্মণী প্রভৃতি পদ পাইতে হইবে না ; সখীর মত রাধারাণীকে প্রাণেশ্বরী ধার্য্য করিয়া তাহার পুংলিঙ্গে, তদধীন, তাহার কান্তকে প্রাণেশ্বর সম্বোধন করিতে হইবে ; গোবিন্দ সখীজনের সাক্ষাৎ প্রাণেশ্বর নহে ; প্রাণেশ্বরীর বল্লভ বলিয়াই প্রাণেশ্বর।

বেদান্ত ও রসশাস্ত্র উক্ত দুই দোষ বর্জ্জনের জন্য পৃথক পৃথক উপায় নির্দ্দেশ করে। বেদান্তের উপদেশ এই যে,—বটে সুখ চাই, রস চাই ; কিন্তু বন্ধু স্ত্রী ভৃত্যবর্গাদি যে সকল সামগ্রী হইতে সুখের আশা, তাহারা প্রায়ই দুর্ল্লভ ; কদাচিৎ সুলভ হইলেও জরা মরণ বশে অনিত্য এবং বর্ত্তমানেই হয়ত বিদ্রোহী ; সুতরাং তাহারা সুখের না হইয়া বরং দুঃখেরই নিদান হয়। সমগ্র ব্যবহারজগৎ যখন আমাদের অনুকূল হইতে চাহেনা, তখন হতাশ বেদান্ত বলে যে, আইস আমরা বৈরাগী হই। একটা নির্ব্বিশেষ শান্তি নামক বস্তু আছে তাহার নাম ব্রহ্ম, সেইটাকে নিরূপণ করিয়া লও। যতোবা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে ইত্যাদি তৈত্তিরীয় শ্রুতি প্রতিপাদ্য সুষুপ্তি-বৎ সমাধি নামক বস্তু যাহাকে আশ্রয় করিয়া এই দৃশ্যমান জগৎ সৃষ্ট হইতে পারে, যাহাতে সৃষ্ট জগৎ স্থিতি লাভ করিতে ও লীন হইতে পারে, সেই বস্তুকে 'অহং ব্রহ্ম' মন্ত্র জপ করিয়া আয়ত্ত করিয়া লও। সেটা বড় অভয় ; সূর্য্য যথা জন্মেও অন্ধকারকে দেখে নাই, তদ্বৎ সেই সুষুপ্তিরূপ ব্রহ্ম, যত্র ভীতির বিষয় বা ভয় অত্যন্ত তিরোহিত, ভয় যে কি বস্তু কদাচ তাহা দেখে না। তাহাই আমাদের অভয়স্বরূপ ও আনন্দ।

ব্রজবাসী বেদান্তের কথায় হাসে ; কিছু কথা কহে না ; যাহারা সাক্ষাৎ ব্রজবাসী নহে কিন্তু ব্রজপক্ষপাতী তাহারা বলে যে, হে বেদান্ত, তুমি যে বল সকলেই আপন আপন সুখের জন্য ফিকির করে ; 'নবা অরে পত্যুঃ কামায় পতিঃ প্রিয়ো ভবতি আত্মনস্তু কামায় পতিঃ প্রিয়ো ভবতি' ইত্যাদি তাহা নহে। এমন লোকও, হউক সংখ্যায় অল্প, আছে যাহারা বুঝে যে

স্বার্থপরতায় সুখ নাই, সুতরাং তাহারা গোবিন্দকে ভালবাসে; রাধারাণীকে ভালবাসে; তাহারা বাসনাকে দগ্ধ করেনা, লোপ করেনা; পূর্ণমাত্রায় রক্ষা করে ও নানা শারীরিক মানসিক ক্লেশ স্বীকার করিয়া 'তুলবো ফুল গাঁথবো মালা দিব শ্যামের গলে' ভাবিয়া পুষ্প চয়ন, শ্যামের জন্য গোদোহন পূর্ব্বক সুগন্ধি ঘন ক্ষীর প্রস্তুত; শ্যাম দেখিয়া সুখী হইবে বলিয়া নিজ সুকুমার দেহের মার্জ্জন দ্বারা লাবণ্যের অধিক স্ফূর্ত্তি এবং বিম্বাধর তাম্বুল রাগ রঞ্জিত করিয়া সকল বাসনা কৃষ্ণের তৃপ্তির জন্য প্রয়োগ করে; তাহাদের শারীরিক ক্লেশ ত ক্লেশ নহে পরন্তু পরমানন্দ। শীতে গোপী নিজ ওড়না কৃষ্ণাঙ্গে দিয়া অথবা তাহাকে উষ্ণ আলিঙ্গনের ভিতরে রাখিয়া নিজে শারীরিক শীত ভোগরূপ ক্লেশ স্বীকার করিয়াই ত মানসিক সাক্ষাৎ সুখে সুখী হয়। নির্ব্বিশেষ সুষুপ্তির মত শান্ত ব্রহ্মানন্দটী শান্তি; সুখ ত নহে, দুঃখ পরিহার মাত্র। তাহা ত জীবের উদ্দেশ্য বা ইষ্ট নহে; উদ্দেশ্যটী সুখ। বেদান্ত ত রসশাস্ত্রের এক দেশ মাত্র, অল্প দেশ; রাধাকৃষ্ণের কুঞ্জ ভবনে সুষুপ্তি। অপর দেশই অধিক দেশ ও তাহা সুষুপ্তিমুক্ত রাধা শ্যাম, প্রিয়সখীজন, মাতা যশোমতী, কামধেনুবৃন্দ, কল্পতরুগণ, বৃন্দারণ্যের কোকিল ও পুষ্পবাটিকা, যমুনার স্নিগ্ধবারি শারদ চন্দ্রের মেলা ও নানা নর্ম্ম পরিহাস লীলা।

জাগতিক বিষয় অনিত্য হয় হউক, ব্রজের বিষয় নিত্যই; তত্র জরা মরণের প্রতাপ অধিকার নাই। তুমি পঞ্চম বর্ষীয় যশোদা-দুলালে বৎসল বা বৎসলা হও, পরে তোমার বয়ঃক্রম বিংশ বা সহস্র বৎসর অতিক্রম করিলেও গোপাল সেই পঞ্চমবর্ষীয় মনমোহনিয়া বালকই থাকিবে।

ষোড়শীপতি কিশোর গোবিন্দের প্রতি অনুরাগিনী হইতে যদি পার তবে ভালই—শতকোটী বৎসরেও কিশোরযুগলকে পাইবে; যুগলকিশোর নওলকিশোরই থাকিবে, বুড়া হইবে না এবং তুমিও হইবে না; তুমিও

ষোড়শী সখী হইয়া সদা বর্ত্তমান থাকিতে পাইবে। বটে জাগতিক সুখ গোয়াল্মার দুগ্ধের মত অল্প বিস্তর জল মিশ্রিত, স্বার্থ দোষ, কাম দোষ এবং অনিত্যত্ব দোষ দুষ্ট; কিন্তু ব্রজের সুখ খাঁটী দুগ্ধ; ব্রজবাসীর নিজ সুখে তাৎপর্য্য নাই—রাধাকৃষ্ণ সুখেই তাৎপর্য্য; ইহা স্বার্থশূন্য, কামদোষশূন্য শুদ্ধাপ্রীতি। ব্রজবাসীর সেবায় আদরে রাধাশ্যামের সুখ হইলেই ব্রজ-বাসিগণ অপরিহার্য্যরূপে সুখী হয়। এই অপরিহার্য্য সুখে 'জ্ঞাতসারে অভিসন্ধি' রাখিয়া ব্রজরমণীগণ রাধাকৃষ্ণের প্রণয় মিলনে আনুকূল্য করে না; প্রীতিবশতঃই সেবা করে এবং অপরিহার্য্যরূপেই সুখ পায়। জগৎটা, জগৎগত প্রশংসা কলঙ্কটা বিষহীন উরগের মত দণ্ডায়মান থাকে থাকুক, বা দূর হয় হউক;—ব্রজবাসে লুব্ধের, উৎকণ্ঠিতের পক্ষে তাহাতে কোনও ক্ষতি বৃদ্ধি হয় না।

প্রহ্লাদকে সঙ্গীগণ জিজ্ঞাসা করিয়াছিল যে কিসে সুখ হয় বলত ভাই। প্রহ্লাদ বলিয়াছিল, ভাই সকল, স্বার্থপর হইয়া নিজ সুখ অন্বেষণ করিলে কদাচ সুখী হইবে না। আত্মানামে এক প্রিয়জন আছেন, তিনি পূর্ণতৃপ্ত, হয়ত আমরা তাঁহাকে সেবাদ্বারা অধিক তৃপ্ত করিতে পারি না, কিন্তু তামাসা এই যে তাঁহাকে সুখী করিবার জন্য উদ্যম করিলেই আমাদের সুখ হয়; অন্য কোনও উপায়ে আমাদের সুখের ভরসা নাই। তিনি বিম্বস্থানীয়, আমরা প্রতিবিম্বস্থানীয়। আমরা স্বার্থবশতঃ প্রতিবিম্ব মুখে তিলকাদি শোভা সম্পাদন করিয়া প্রতিবিম্বকে সুখী করিবার জন্য যদি দর্পণের পশ্চাদ্ভাগে হস্তপ্রসারণপূর্ব্বক নানা চেষ্টা করি, তাহা নিশ্চয় নিষ্ফল হইবে; কিন্তু যদি বিম্বমুখে তিলকাদি রচনা দ্বারা মুখ শোভা সম্পাদন করিয়া বিম্বকে সুখী করিয়া বিম্বমুখে মধুর হাসাবিষ্কার করিতে পারি, তবে সহসা অপরিহার্য্যরূপে সেই হাস্যতরঙ্গচ্ছবি, সেই সুখ, প্রতি-বিম্বরূপ জীবে পূর্ণরূপে প্রতিফলিত হইয়া যাইবে। প্রহ্লাদ শিষ্যগণ

তদবধি নানা বিচিত্র বাসনা স্বীকার করিয়া আত্মা ভগবানের প্রীতির উদ্দেশে নানা বিশিষ্ট নৈবেদ্য সংগ্রহে ঘর্ম্মাক্ত কলেবরে অহর্নিশ সুখের পরিশ্রমে সুখী হইয়া সুখে জীবনাতিপাত করিতেছে। মূল শ্লোকটী ভাগবতের ৭।৯।১১ "নৈবাত্মনঃ প্রভুরয়ং নিজলাভ পূর্ণো মানং জনাদবিদুষঃ করুণো বৃণীতে; যদ্‌যজ্জনো ভগবতে বিদধীত মানং তচ্চাত্মনে প্রতিমুখস্য যথা মুখশ্রীঃ"। ইহা জীবগোস্বামী পঞ্চম (ভক্তি) সন্দর্ভের ১৬৭ সূত্র রূপে এবং মধুসূদন ইহা গীতার ৭।১৪ শ্লোকের ব্যাখ্যায় উদ্ধৃত করিয়াছেন।

লৌকিকরসের অনিত্যত্ব দোষের পরিহার প্রথা পূর্ব্বেই সঙ্কেত করিয়াছি; আবার বলি। লৌকিক শিশু বয়ঃপ্রাপ্ত, শ্মশ্রুশোভিত হইলে বাৎসল্যরসের 'সম্পূর্ণতা' রক্ষিত হয় না। উলঙ্গ অসহায় শিশুর সর্ব্বাঙ্গ চুম্বনে, শিশুকে স্তন্যদানে মাতা 'সম্পূর্ণ' বাৎসল্য রসানুভব করিত। বয়স্ক বস্ত্রাচ্ছাদিত সমর্থ বালকের উপর মাতার স্নেহ থাকিলেও নিজের অভিভাবকত্ব ও পালকত্বশূন্য সসঙ্কোচ অসম্পূর্ণ স্নেহ পূর্ব্বানুভূত সরল সম্পূর্ণ স্নেহের সহিত একদা স্মৃতিপথে আরূঢ় হইয়া দারুণ বিষাদের সঞ্চার করে। পরমসুন্দর লৌকিক যুবক নাগর নিষ্করুণ কালবশে জরাজীর্ণ, যষ্টিসহায়, অহিফেনসেবী, অসমর্থ হইয়া মধুররসের নিরতিশয় ব্যাঘাত ঘটায়। কিন্তু লৌকিক শিশু বা নাগরের অপেক্ষা না করিয়া গিরিরাজ-কুমারী উমাতে বা যশোমতীর বালক গোপালে বা রাসস্থলীর কিশোর গোবিন্দে স্নেহ সুসংস্থাপিত করিতে পারিলে আর ভয় নাই—স্নেহের উমা গোপাল বা রাধাগোবিন্দের সুকুমারত্ব কোটী বৎসরেও বৃদ্ধ শুষ্ক কুৎসিত বীভৎস হইবে না, সাধকের দেহ কালবশে জীর্ণ পতিত হইলেও সাধক নিজ ভাবানুযায়ী কোনও এক অলৌকিক স্থিরদেহ ধারণ করিয়া ইহপর-লোকে উমা গোপাল বা রাধাগোবিন্দের সেবাসুখে অসীম তৃপ্ত থাকিবে।

অধিকার—নানা বিচিত্র রস ও জীবের অধিকারও নানা বিচিত্র। জগতে বাৎসল্যাদিরসে রসাভাস নাই। লোকোত্তর বাৎসল্যাদি-রসেও নাই। একই বালকে নানা নারী বৎসলা হইতে পারে, যথা রামে কৌশল্যা কৈকেয়ী সুমিত্রাগণ, যথা গোপালে যশোদা রোহিণী, ও নানা প্রতিবেশিনীগণ। একই ব্যক্তিকে বহু লোকে সখা মনে করিতে পারে, যথা রামকে গুহক বিভীষণ সুগ্রীবাদি; কোনও কোনও দেশে একই পুরুষকে বহুনারী প্রত্যেকে স্বামী চিন্তা করিতে পারে; এদেশে এখনও কৌলীন্য প্রথা ও এক পুরুষের বহুবিবাহ লুপ্ত হয় নাই। কিন্তু স্বস্ব স্বামী ত্যাগ করিয়া কোনও নারী লৌকিক পরপুরুষে অনুরাগবতী হইলে রসাভাস হয়। জগতে পরকীয়া মধুর রস রস নহে; রসাভাস ঘৃণ্য বীভৎস। অসংযমী দুষ্মন্ত কন্যকাশ্রেণীর পরকীয়া শকুন্তলাতেই গর্ভাধান করিয়াছিলেন; কবি কোন গতিকে তাহার বিশুদ্ধতা রক্ষা করিতে চেষ্টা করিয়াছেন মাত্র; মৃচ্ছকটিকে বসন্তসেনার স্নেহও ঠিক পূর্ণরূপে সমাজানু-মোদিত নহে। ব্রজের পরকীয়া রস কিন্তু 'তত্ত্ব'ও নিরবদ্য পবিত্র এবং নির্দ্দোষ এবং অপরিহার্য্য; ইহাতে প্রায় সামাজিকগণের লোভ হয় না—ভয়ই হয়। যাহাদের লোভ হয় তাহারা নিরতিশয় ভাগ্যবান্। স্বামী সত্ত্বে বা স্বামীর অবর্ত্তমানে বহুনায়ক নিষ্ঠত্বই পুংশ্চলীত্ব! গোপী পুংশ্চলী ত নহেই—বরং স্বামীতেও এবং কৃষ্ণেতর ব্রজের এবং জগতেরও অন্য যাবতীয় পুরুষে অনুরাগলেশরহিত সুতরাং লৌকিক কাম বলিলে যাহা বুঝায় গোপী—তাহার অত্যন্ত পরিহার করিয়া সুতরাং অতি বিশুদ্ধা। কৃষ্ণপ্রেয়সীগণ নিজ নিজ স্বামী, অন্য যাবতীয় পুরুষ এবং তদুপলক্ষিত জাতিকুলমানাদি দুস্ত্যাজ্য সম্পত্তি অবহেলায় ত্যাগ করিয়া এক অদ্বিতীয় পুরুষ গোবিন্দে স্নেহাকৃষ্টা, গাঢ়ানুরাগিনী ও তৎসেবায় জীবন উৎসর্গ করিয়া পরমানন্দময়ী, নিরতিশয় একনিষ্ঠত্বপ্রযুক্ত

অবিসংবাদিত সহজ সতী। হে নরনারী, কে পার নিজ নিজ নারীত্ব উপলব্ধি করিয়া, সমুদয় সংসারবন্ধন উচ্ছেদ করিয়া ব্রজনারীর মত গোবিন্দ সম্বন্ধে পরকীয়া হও ত দেখি। যাহারা উপহাস বিদ্রূপের জন্য, যাত্রার সং দিবার জন্য রাধা কৃষ্ণের পবিত্র স্বকীয়রসের পরকীয়াভিনয় উল্লেখ করে, তাহারা করুণার পাত্র সন্দেহ নাই। জগতে অনেক পরকীয়া এতাবৎ নাগরের নিকট মহামূল্য উৎকণ্ঠা লইয়া উপহার দিয়াছেন, ভবিষ্যতে নাগরকে বিশ্বাসঘাতক দেখিয়া মর্ম্মাহত হইয়া অন্বেষণ করিয়াছেন যে, কেহ কি জগতে এমন পুরুষ নাই যে নারীর সর্ব্বস্বধন তীব্রোৎকণ্ঠা সমাদরে গ্রহণ করিতে পারে। গুরু বলিয়াছেন যে সত্য বটে এমন পুরুষ জগতে নাই; জগতের পুরুষগুলি পুরুষ নহে, পুরুষাকার দেহে বসবাস করে বটে কিন্তু আসলে জীবমাত্রেই, কি নারীদেহের দেহী, কি পুরুষ দেহের দেহী, সকলেই এক অদ্বিতীয় পুরুষ গোবিন্দের সেবক, তথা ভোগ্য হিসাবে নারী শক্তি, প্রকৃতি। চৈতন্যচরিতামৃতকার বলিয়াছেন "কৃষ্ণের অনন্তশক্তি তাতে তিনি প্রধান। চিচ্ছক্তি মায়াশক্তি জীবশক্তি নাম"। গীতাও সপ্তমে বলিয়াছেন যে

অপরেয় মিতস্ত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধিমেপরাং।
জীবভূতাং মহাবাহো! যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ॥"

অতএব হে জাগতিক পতিতা পরকীয়া, তোমার মহামূল্য সর্ব্বস্বধন উৎকণ্ঠা এক অদ্বিতীয় পুরুষ গোবিন্দের নিকট লইয়া যাও; তিনি পতিত উদ্ধারণ, তিনি তাহা সমাদরে গ্রহণ করিবেন; তিনি কোন্ বস্তুর কত মূল্য বুঝেন। গুরু উপদেশে কত শত জগতের পতিতা পরকীয়া কৃষ্ণানু-রাগিনী হইয়া ব্রজের উচ্চাসনে উদ্ধৃতা, অবস্থিতা, বিশুদ্ধা ও ব্রহ্মা বিষ্ণু শিবাদি ঈশ্বরগণেরও দুর্ল্লভাধিকার পাইয়া গোবিন্দ সম্বন্ধে স্বকীয়া হইয়া পরকীয়া ইব হইয়া বিরাজমানা। অত্র বলিয়া রাখি যে, বুঝি বা ললিতার

আসন রাধাকৃষ্ণের আসনেরও উচ্চে; রাধাকৃষ্ণও বুঝি ললিতার ভাগ্য সম্পদের বাঞ্ছা করেন। রাধা কৃষ্ণকে, কৃষ্ণ রাধাকে ভালবাসে, কিন্তু ললিতা স্বার্থশূন্য হইয়া মিলিত যুগলকে ভালবাসে, মিলিত যুগলের আনন্দে ঈর্ষা, ক্ষোভ, নিজ লোভ বর্জ্জিত অপার অসীম মহোৎসব মহোল্লাস অনুভব করে; অথচ রাধারাণী কৃষ্ণকে যতটা যে ভাবে ভালবাসে ললিতা ততোধিক না হউক ঠিক ততটাই সেইভাবে কৃষ্ণকে ভালবাসে। বৈষ্ণবেরা ললিতার সৌভাগ্য-পদবী ভাবিতে ভাবিতে বিভোর হইয়া যায়, অন্য কোনও রস তাহাদিগকে এত বিভোর করিতে পারে না। আর একটা কথা বলিবার অবসর হইয়াছে; বিশেষ মনোযোগের সহিত বুঝিয়া লও। আমাদের দেশে নারী প্রায়ই স্বামীকে বলে যে আমি পরলোকে শ্রীরামকে বা শ্রীকৃষ্ণকে স্বামী পাইবার কামনায় ব্রতানুষ্ঠান করিব, তুমি ব্রতের খরচপত্র সরবরাহ কর। এইত বাপু, পরকীয়া প্রসঙ্গ ঘরে ঘরে পাওয়া গেল। কৈ স্বামী ত ক্রুদ্ধ হয় না; স্বামী স্পষ্টই বুঝিল যে পত্নী পরজন্মে আমাকে পতিরূপে চাহে না, হয়ত বা ইহজন্মেই আমাতে বীত-শ্রদ্ধ ও রাম বা গোবিন্দের জাতানুরাগা পরকীয়া হইয়াছে, স্বামী ত সরল-ভাবে সুস্থচিত্তেই ব্রতের ব্যয় নির্ব্বাহ করিয়া পত্নীর পরকীয়াত্বে অনু-মোদনই করে। এই পরকীয়া লৌকিক ঘৃণ্য পুংশ্চলীত্ব নহে। ইহাই চরম পবিত্র, চরম রস; ইহাই এই প্রস্তাবের প্রতিপাদ্য। অবশ্য সকলেই এই আদি মধুর রসে শ্রদ্ধাবান্ বা অধিকারী নহে; অধিকার-দৌর্ব্বল্য-বশতঃ ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির বাৎসল্য সখ্যাদিরসেই রুচি হইবে এবং সাধক যে যাঁর অধিকারে আসন দৃঢ় করিয়া অন্যান্য রসের যথাসম্ভব, রসাভাস বাঁচাইয়া, অল্পবিস্তর আলোচনা করিবে। কিন্তু প্রকাশ থাকে যে বিলোম-ক্রমে এই প্রবন্ধ প্রতিপাদ্য ব্রজের পরকীয়ারসে অবশেষে কেহই বঞ্চিতা হইবে না, সকলকেই পহুঁছাইতেই হইবে; অপক্ষপাতী করুণাসাগর

রাধাকৃষ্ণ যুগলের ইহাই ব্যবস্থা ; ইহা অতিক্রম করা কাহারও সাধ্যায়ত্ত নহে।

যদি উক্ত রাম-ব্রতধারিণী বা গোবিন্দ-ব্রতধারিণী ভার্য্যা অনুরোধ করে যে স্বামিন্ আইস তুমিও নিজ নারীত্ব উপলব্ধি করিয়া লবকুশ বা কার্ত্তিকেয় জনক রামজী বা শিবজীকে অথবা নন্দনন্দনকে পতিত্বে ভাবনা কর অথবা সীতারাম বা হরগৌরীর প্রণয়মন্দিরে জয়া বিজয়া সখীর মত লীলাবিলাসে সহায়তা করিবার অধিকারচিন্তা কর, অথবা বিশুদ্ধ যেহেতু গর্ভধারণসম্বন্ধশূন্য এবং বাৎসল্যাদি রসে প্রায় অস্পৃষ্ট 'কেবল' প্রীতিঘন রাধাগোবিন্দের নর্ম্ম সখী ললিতার ললিতব্যবহার চর্চ্চা কর এবং স্বামী তুমি নিজে নারী হওয়ায় আমাতে বা অন্যা নারীতে অনঙ্গপীড়া শান্তির চেষ্টা কদাচ করিবে না ; যদ্যপি কর, পড়িয়া যাও, উঠিও, অনুতাপ করিও, বারান্তরের জন্য সাবধান হইও। আইস আমরা পরস্পর উত্তর-সাধক হইয়া, পরস্পর কামক্রিয়া নিষেধ করিয়া, পরম পুরুষ, পরপুরুষ, গোবিন্দের বা রাধাগোবিন্দের মানসিক সেবাতে প্রবৃত্ত হই। স্বামী উক্ত উপদেশের যোগ্য পাত্র হইলে উত্তরসাধিকা ভার্য্যাকে গুরুর মত মান্য করিলেও করিতে পারে ; পারিলেই ভাল। পাঠক, বুঝিলে কি, ব্রজের পরকীয়া রস কত পবিত্র, কত গভীর, কত পাপ শূন্য, যেহেতু স্বার্থও কামশূন্য। এখনও যদি না পার, তবে আশা রাখ, রাধা ঠাকুরাণীর কৃপা হইলে পরে বুঝিতে পারিবে।

রঙ্গমঞ্চে হঠাৎ নদেরচাঁদ ও হেমচাঁদকে দেখা গেল ; নদেরচাঁদ বলিল,—দেখাবি ? হেমচাঁদ বলিল, দেখাব। পাঠক বা দর্শক তখন কিছুই বুঝেন নাই যে, কিবা দেখাবার ও দেখিবার যোগ্যবস্তু ; পরে বুঝিয়া-ছিলেন। তদ্বৎ ধৈর্য্য ধর, ভবিষ্যতে ব্রজের পরকীয়া রসের রহস্য বুঝিতে পারিবে। কতকোটী বৎসর ধরিয়া এই রাধাকৃষ্ণ প্রণয়লীলা কত কোটী

নরনারীকে বিপুল আনন্দ দান করিয়াছে ও করিবে; ইহার রহস্য অন্য বা ভবিষ্যতে বুঝাই চাই; ইহা না বুঝিতে পারিলে নরোত্তমের মত হাহাকার করিয়া বলিতে হইবে যে, বিফলে জনম গোঁয়াইনু, রাধাকৃষ্ণ চরণারবিন্দ ভজিলাম না, কবহুঁ বুঝব হাম যুগল পীরিতি। উপস্থিত নিজ সরল বুদ্ধি ও গুরূপদেশ একত্র করিয়া নিজ নিজ মুখ্য অধিকার, হয় মধুরে না হয় বাসল্য সখ্য দাস্য রসে বা ভক্তিতে সাব্যস্ত করিয়া লও। অধিক অধিকারের বস্তু, একেবারে লোভবশতঃ, লইও না; বিপদ আছে; যে দুগ্ধ সুস্থের পক্ষে অমৃত সমান, তাহাই উদরাময় পীড়িত দুর্ব্বলের পক্ষে বিষবৎ। অপিচ উচ্চাধিকারে শ্রদ্ধা হওয়াও দুর্ঘট। দরিদ্র জামাতা ধনবান শ্বশুর-বাটীতে অদৃষ্টপূর্ব্ব পরমান্ন দেখিয়া দৃষ্টপূর্ব্ব ক্ষুদ-সিদ্ধ মনে করিয়া অবহেলা করিয়াছিল। দরিদ্রের পাত্রে পলান্ন পরিবেশিত হইলে সে অদৃষ্টের নিন্দা করিয়া বলে যে হায় হায় আমি দরিদ্র বলিয়াই আমাকে অপমান করিয়া গৃহস্থ আমায় নানা লোকের উচ্ছিষ্ট ঝোল মাখা অন্ন দিল। তথাপি ইহা একটি আশ্বাস বাণী যে, নিজ মুখ্য অধিকার নিম্ন হইলেও উচ্চাধিকারের আলোচনা কিয়ৎ পরিমাণে সম্ভব। দেখ, জননী নিজ বাৎসল্য বজায় রাখিয়াই, অবশ্য বহিরঙ্গভাবে, যথাসম্ভব কন্যা জামাতার মধুর রসে আনুকুল্য করে, কন্যাকে বেশ ভূষায় সজ্জিত করে; জামাতাকে নিজ বাটীতে আরও অধিক দিবস অবস্থান করিতে অনুরোধ করে। যাহারা শক্তি উপাসক, তাহাদের বলিয়া রাখি যে দেবী দুর্গার সাক্ষাৎ পাইলে গোবিন্দকে স্বামী পাইবার জন্য বা রাধাকৃষ্ণের প্রণয় মর্ম্ম বুঝিয়া ললিতার মত অধিকারী হইবার জন্য প্রার্থনা করিবে; ইহাতে দুর্গা মাতার অসম্মান হইবে না, মাতৃভক্তির লাঘব হইবে না; লৌকিক অনেক বালিকা মাতাকে বলে যে "মা, আমার যেন সুন্দর বরে বিবাহ হয়।" তাহাতে মাতার এমন অভিমান হয় না যে আমার বালিকা বরকে আমা

অপেক্ষা প্রিয় বুঝিল হই বড়ই পরিতাপ। ভারতচন্দ্র লিখিয়াছেন যে, এইরূপে কালীর প্রসাদে সুন্দর বিদ্যাকে ও বিদ্যা সুন্দরকে পাইয়াছিল।

ভক্ত ব্রজের রস ভূমিকার বহিরঙ্গ। তিনি শিব উমাকে পিতামাতা বুঝেন এবং পিতামাতার মধুর ব্যবহারে সাক্ষী হইতে লজ্জা বোধ করেন; তিনিও কিন্তু কালিদাসের কুমারসম্ভবে ছদ্মবেশী শিবের প্রীতিমূলক ছল-চাতুর্য্য এবং উমার শিবপ্রীতি ও উভয়ের গাঢ়ালিঙ্গন ও বৈবশ্য দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া কথাটা ভাল করিয়া বুঝিবার পূর্ব্বেই, লজ্জা আসিয়া রসানুভূতির ব্যাঘাত করিবার পূর্ব্বেই, পিতামাতাতে প্রকট রসের অনুভব; জয়া-বিজয়ার মত, করিয়া ফেলেন। তবেই বুঝা গেল যে মুখ্য মধুরে অধিকার না থাকিলেও অন্যাধিকারে থাকিয়াও মুখ্যরসের অল্প বিস্তর অনুভূতি সম্ভবপর। কখনও যদি রাধাশ্যামের কৃপা হয় তবে জন্মান্তরে বা এই জন্মেই মুখ্যরসেই সাক্ষাৎ অধিকার হইবে।

সচরাচর আচার্য্যগণ শিষ্যকে দুর্ব্বল সকাম জানিয়া রূপ যশঃ আয়ুঃ প্রভৃতির কামনীয় দেবতার বিধি অনুসারে আরাধনা করিতে বলেন; যোগ্য পাত্র হইলে তাহাকে বিধি নিষেধ অতিক্রম করিতেই বিধি দেন। বিধি নিষেধ অতিক্রম না করিলে ব্রজে বসতিলাভ হয় না! বিধিবশে একাদশীতে উপবাস করিতে হয়; ব্রজে একাদশীতে উপবাস নাই; ব্রজরমণী জানে উপবাসে ক্লেশক্লিষ্টা হইলে প্রেয়সীর ম্লান মুখ দেখিয়া কৃষ্ণ অসুখী হইবেন, মনে ব্যথা পাইবেন; কিন্তু কৃষ্ণকে কোনও রকমে অল্পমাত্র ব্যথা ব্রজনারী ত দিবে না সুতরাং উপবাস করিবে না। বিধির ভিতরে উচ্ছিষ্ট ফল দেবতাকে দেওয়া যায় না কিন্তু গোপবালকগণ ফল উচ্ছিষ্ট করিয়া মিষ্ট বুঝিলে তবে প্রিয়দেবতা কৃষ্ণকে খাইতে দিত, কটু ফলের বিস্বাদ প্রযুক্ত প্রাণ কৃষ্ণের অল্পমাত্র দুঃখ হইবার সম্ভাবনাই ঘটিতে দিত না। বিধির ভিতরে মিথ্যা কথার প্রশ্রয় নাই, কিন্তু ব্রজে 'চোরি

পীরিতির লাখগুণ রঙ্গ' আস্বাদনের জন্য দিনের মধ্যে রাধা কৃষ্ণ সখীগণ শতসহস্র মিথ্যা কথা বলেন। কৃষ্ণ ব্রজনারীর প্রণয় পরীক্ষার জন্য বেণু সংকেতাকৃষ্টা, রাসে আহূতা, গোপীগণকে ভৎর্সনা করিয়াছিলেন এবং লজ্জা দিয়া বলিয়াছিলেন যে তোমরা অতি কামুক; গৃহে স্বামী পুত্র ত্যাগ করিয়া পরপুরুষ পরশলোভে কামবশে অতি নিলর্জ্জ, অতি সাহসী হইয়া গভীর রাত্রে নিবিড় বনমধ্যে আসিয়া অত্যন্ত পাপাচরণ করিয়াছ। যাও গৃহে ফিরিয়া যাও; তত্র বিধি নিষেধের মধ্যে থাকিয়া পাতিব্রত্য, সন্তান পালন ও অতিথি সেবারূপ ধর্ম্মাচরণ করিতে থাকে। গোপীর প্রতিবচনে চতুর চূড়ামণিরও পরাজয় হইয়াছিল। প্রতিবচনটী এই যে, আমরা কুলটা নহি; আমরা এতাবৎ সুশীল সুন্দর বা দুঃশীল বৃদ্ধ হউক ধনী বা রোগী হউক স্ব স্ব পতিকে ত্যাগ করি নাই, তাহাদের সম্বন্ধে আমরা কেহই বিশ্বাসহন্তা নহি, তাহাদের সেবা পাতিব্রত্য বিধি-বশেই করিয়া আসিয়াছি; বিধিবশে যতটা সম্ভব ততটাই গার্হস্থ্য ধর্ম্মাচরণ করিয়াছি! এখন বিধির অনধীন যে তোমার প্রতি অবশে প্রীতি তাহা আমাদের মনে জাগিয়াছে, যে প্রীতির উদয় সুদুর্ল্লভ যেহেতু সহজ, স্বতন্ত্র, হয়ত হয়, না হয়ত কোনও অনুরোধে, কান্নাকাটীতে, অর্থ সেবাদির বিনি-ময়ে পাওয়া যায় না। এখন তোমার প্রতি প্রীতিটী পাইয়া পুনরায় আর কি অধিক পাইবার লোভে, বল, আমরা ঢেঁকী গেলার মত দারুণ কৃচ্ছ্রসাধ্য গার্হস্থ্য প্রতিপালনের জন্য ফিরিয়া যাইব; সোপান অবলম্বনে ছাদে উঠিয়া পুনরায় সোপান অবতরণ করিয়া পুনরায় উঠিলে সেই ছাদই ত পাওয়া যাইবে, অধিক কিছু নহে; সুতরাং আমরা আর সোপানা-বতরণ করিব না, গার্হস্থ্যে ফিরিব না। কি বল তুমি? যদি বল যে তোমরা উপস্থিত কুলটা, আমি গ্রহণ করিব না, তাহার প্রত্যুত্তর এই যে মতই অখিলের পতি সুতরাং আমাদেরও পতি, আমাদের গতি, আমরা

এখনই সতী হইলাম ; বরং ইতিপূর্ব্বে গার্হস্থ্যেই স্ব স্ব পতিসঙ্গ করিয়া আমরা না বুঝিয়া অসতী ছিলাম ; তাহারা ত আমাদের পতি নহে, তাহারাও নারী ; তুমি যে তাহাদেরও পতি তাহা হতভাগ্য তাহারা জানে না। আমরা তাহা জানিয়াছি। গার্হস্থ্যের নরনারীসঙ্গম গঙ্গা যমুনা সঙ্গমের মত অলীক ও ভুয়া ; গঙ্গা আপনাকে পুরুষ যমুনাকে নারী এবং যমুনা আপনাকে নারী গঙ্গাকে পুরুষ বুঝিলেও তাহা ভ্রম, মিথ্যা ; গঙ্গাও নারী, যমুনাও নারী। অন্য যে যেখানে নদ নদী আছে সকলেই নারী, এক অদ্বিতীয় সমুদ্রই তাহাদের সকলেরই পতি ; সমুদ্র-সঙ্গমই সতীত্ব। কৃষ্ণ, তুমি সেই রসসমুদ্র, আমরা নানা নদী তোমার সতী পত্নী ; তুমিই আমাদের একমাত্র গতি পতি ; আমরা তোমাতে সঙ্গতা হইবার যোগ্যা এবং হইবই। কৃষ্ণমহাশয় নিরুত্তর ; প্রণয়ানুরোধে দুস্ত্যজ্য কুলশীল ত্যাগ করিতে "সমর্থা" গোপীর পীরিতে কৃষ্ণ স্তম্ভিত ও কম্পিত-কলেবর। গোবিন্দ ব্রহ্মরূপে আপনাকে পূর্ণতৃপ্ত মনে করিত ; এখন তাহার সেই ভ্রম ঘুচিল ; গোপীর প্রেমালিঙ্গনে অজ্ঞাতপূর্ব্ব সমধিক সুখ পাইয়া আপনাকে ধন্য কৃতার্থ বুঝিয়াছিল।

এই কামলোকজগতে নরনারীগণ আপনাদিগকে নরনারী মনে করে ; কিন্তু আসলে সকলেই নারী। পুরুষ যখন সীতা দেসডিমোনা আয়েষা দেবযানীর দুঃখ মনে অনুভব করে, সেই দুঃখটীর বেদনা অর্থাৎ জ্ঞান হৃদয়ে দেখিতে পায়, তখন সেই 'হৃদয় বেদনা' প্রযুক্ত তৎকালে সেই পুরুষ নারী হয় ; পরে আবার ভুলিয়া যায় ; যদি না ভুলে, নিজের নারীত্ব স্থায়ীভাবে উপলব্ধি করিতে পারে তবে তাহার মহৎ লাভ হয় ; নিজে নারী সুতরাং কোনও নারীর সহ কামক্রীড়ার চিন্তাই তাহার মনোমধ্যে আর উদিত হইবে না। বড় জোর এক গোবিন্দ পুরুষ সহ সঙ্গতা হইবার লোভ হইবে ; গোবিন্দ ব্যতীত দ্বিতীয় পুরুষ কেহ না থাকায় অন্য কোন

পুরুষ সহ সঙ্গতা হইবার লোভ হইতেই পারে না বলিয়াই হইবে না; ভাগবতের রাসপঞ্চাধ্যায় কামমারী পঞ্চাধ্যায়; লৌকিক ভাষায় বটে গোপীগণ পরদার, কিন্তু তত্ত্বতঃ তাহারা স্বকীয়া এবং রাসে পরদার-বিনোদটী অতি পবিত্র স্বকীয়া মিলন। পুরুষ সংখ্যায় একমাত্র গোবিন্দ হওয়ায় কোন নারীই পরদার নহে যেহেতু গোবিন্দ ব্যতীত অন্য পর-পুরুষই কেহ নাই।

শ্রীধরস্বামী সেই জন্যই প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিয়াছেন যে, রাসপঞ্চাধ্যায় কন্দর্পদর্পহা, কামবিজয়খ্যাপন এবং বিশেষতঃ নিবৃত্তিপর। অলমতি বিস্তরণে—

ব্রজ-নির্ম্মাণ মহোৎসব

(১)

প্রেমনিবাস ব্রজটী নিত্যধাম, ক্ষয়োদয় রহিত। তত্র ব্রহ্মরূপে সুষুপ্ত এক অদ্বয় রাধাগোবিন্দ ;—

'নিকুঞ্জ মন্দির মাঝে, শুতল কুসুম শেজে
দুঁহু দোঁহা বান্ধি ভুজ পাশে"।
'চরণে চরণে একাকারে, কেবা তাহা ছাড়াবারে পারে
এক তনু ধরি যদি টানে, দুই তনু চলে তার সনে"।

এবং তত্রই রাধাগোবিন্দের বিচিত্র লীলাবিনোদ। নিত্য বস্তুর উৎপত্তি —কথাচ্ছলে' নিত্যবস্তুর তত্ত্বাবধারণ সুগম হয়। তাহাই ব্রজনির্ম্মাণের কথা তুলিয়াছি। দুর্গাসপ্তশতী ৺চণ্ডীতে মধুকৈটভ বধাধ্যায়ে মুনি জিজ্ঞাসুর বোধসৌকর্য্যার্থেই লিখিয়াছেন যে মহামায়া "নিত্যৈবা সা" জগন্মূর্ত্তি স্তয়া সর্ব্ব মিদং ততম্ ; তথাপি "তৎসমুৎপত্তি র্বহুধা শ্রূয়তাং মম"। শ্রীরাধা, মহামাহা, যোগমায়া যোগনিদ্রা, শ্রীললিতা, পৌর্ণমাসী, ভালবাসা যে নামেই লওয়া যাউক গোবিন্দের স্বরূপ শক্তি, প্রকৃতি, নারী ভালবাসা ঠাকুরাণী গোবিন্দের প্রীত্যর্থ, আপনাকে গোবিন্দের আলিঙ্গন মধ্যে রক্ষা করিয়া এবং গোবিন্দকে নিজ স্নেহালিঙ্গনের ভিতর রাখিয়া, উভয়ে সম্মিলিত হইয়া, উভয়ে আত্মহারা হইয়া, সুষুপ্ত সুখরূপ, ব্রহ্ম হইয়া থাকেন এবং পরস্পর অল্পবিস্তর বিরহিত হইয়া, সম্মুখে পৃথক দাঁড়াইয়া, পরস্পর স্পর্শনযোগ্য হইয়া বা গোষ্ঠাদি প্রদেশান্তরিত সুতরাং দর্শনের অগোচর হইয়া সমুৎকণ্ঠিত থাকেন। এবং নিজে সম্পূর্ণ অখণ্ডাকারে থাকিয়াও শ্রীরাধা ক্ষুদ্র খণ্ডাকারে চন্দ্রা, পদ্মা, যশোদা, নন্দগোপাদি পশু পক্ষী

যমুনাদি রূপে স্বয়ং বিন্যস্তা, পরিণতা হইয়া সুপ্তোত্থিত জাগ্রৎ ব্রজভূমি হয়েন। এবং গোবিন্দেরই সুখের জন্য মথুরা, দ্বারকা, বৈকুণ্ঠ, পৃথিবী, পাতালাদি দেশ ও দেশের জীব ও অন্যান্য সম্পত্তিরূপে স্বয়ং বিবর্ত্তিত হইয়া স্বপ্নবৎ ব্রজেতর লোক হয়েন। শ্রীমতীর তিন মূর্ত্তি; স্বরূপ রাধামূর্ত্তি, পরিণাম ব্রজভূমি ও বিবর্ত্ত ব্রজেতর লোকমূর্ত্তি; শ্রীমতীর 'বিকার' কিছু হইতে পারে না বলিয়াই চতুর্থ প্রকার বিকার মূর্ত্তি নাই এবং নিত্যবস্তু বলিয়া পঞ্চম প্রকার 'নাশ' মূর্ত্তি বা 'বাধ' মূর্ত্তি ও নাই।

সতত্ত্বতোহন্যথা প্রথা বিকার ইত্যুদীরিতঃ ;
অতত্ত্বতোহন্যথা প্রথা বিবর্ত্ত ইত্যুদাহৃতঃ।

এই শ্লোকের অর্থ নানা লোকে নানা প্রকারে করিয়া থাকেন, কিন্তু একটি অর্থই নির্ভুল অপরগুলি অসম্যক। কোনও কোনও বৈদান্তিক পরিণাম শব্দটিকে বিকার সহ কিন্তু সকল বৈষ্ণবই বিবর্ত্ত সহ একত্র পাঠ করেন। বিকারে বস্তুর হানি হয়, দুগ্ধ বিকার দধি; দুগ্ধ নহে দুগ্ধেতর কিঞ্চিৎ অভিনব বস্তু। পরিণামে বস্তুর হানি হয় না; বিবর্ত্তেও হয় না। জলের পরিণাম বর্ষোপল, মাটীর পরিণাম ঘটশরাব, সুবর্ণের পরিণাম কুণ্ডল বলয়াদি, সমুদ্রের পরিণাম তরঙ্গফেনাদি; বর্ষোপল জলই এবং ঘটশরাব এবং কুণ্ডলাদি স্বর্ণই, তরঙ্গাদি সমুদ্রই। কোনও কোন বৈদান্তিক সম্প্রদায় দধিকে দুগ্ধপরিণাম বলিতে চাহেন এবং ব্রহ্মের, দুগ্ধের হানিগ্রস্ত হইয়া দধি পরিণামবৎ, কোনও বিকার পরিণাম হয় না, ইহা বলিতে চাহেন। ইহার প্রতিবাদ কেহই করে না। ব্রহ্মের সত্য বিকার নাই ইহা সর্ব্ববাদিসম্মত। কিন্তু যখন দুগ্ধের বিকার দধিকে দুগ্ধ পরিণাম 'নাম' দিয়া সঙ্গে সঙ্গে মাটীর ঘটশরাবাদিবৎ পরিণাম ব্রহ্মের সম্বন্ধে নিষেধ করেন তখন প্রবল আপত্তি মস্তক উত্তোলন করে; বৈষ্ণব বলেন যে ব্রহ্মের বিকার নাই কিন্তু পরিণাম আছে তাহা অপরিহার্য্য; এবং বিবর্ত্ত

আছে তাহা পরিহার্য্য; বিকৃত দধি হইতে আর দুগ্ধ পাওয়া যায় না। কিন্তু বিবর্ত্তিত সর্প পরিহার করিয়া রজ্জু পাওয়া যায়। পরিণত ঘট ভাঙ্গিয়াও মাটীর পরিণাম পরিহার হয় না, মাটী অন্য একটা পিণ্ডাকার সংস্থানে সংস্থিত হয়, পরিণামে পরিণত হয় মাত্র। কিন্তু কি পরিণাম কি বিবর্ত্ত উভয় রূপেই ব্রহ্মের কোনও হানি হয় না।' মাটী যেমন ঠিক সামান্য ভাবে কদাপি নাই, কোনও না কোন উপাধিতে উপহিত, সংস্থানে সংস্থিত, পরিণামে পরিণত, গঠনে গঠিত থাকিবেই, হয় পিণ্ডাকার না হয় ঘটাকার অথবা শরাবাকার, তদ্বৎ সচ্চিদ্ব্রহ্ম কিছুতেই ঠিক সামান্যাকারে থাকিতে পারে না; ইহার উপাধি আছেই, তাহা ভালবাসা, রস, আনন্দ, কখনও পিণ্ডাকার-আনন্দ সুষুপ্তি কখনও বা বিশিষ্টাকার-আনন্দ নরনারী, পিতা পুত্র, ভাই ভাই ইত্যাদি। এই বিশিষ্ট আনন্দ, জাগ্রৎ রূপ, ব্রহ্মরূপ, ও স্বপ্নরূপ; বৈকুণ্ঠ পৃথিবী পাতালাদি রূপ ভেদে দুই প্রকার। জাগ্রৎরূপটি প্রধানতঃ পরিণাম, প্রীতি, মৃদ্ঘটবৎ; স্বপ্নরূপটি প্রধানতঃ বিবর্ত্ত, ভ্রান্তি, রজ্জু সর্পবৎ; উভয়থাই কোনও ক্ষতি নাই; ঘট মাটীই, ঘটে মাটীর হানি হয় না। সুস্থ সবল ব্যক্তি স্বপ্নে আপনাকে রোগী দুর্ব্বল মনে করিলেও সে সুস্থ সবলই। কিছু মাত্র তাহার ক্ষতি হয় না। রজ্জুসর্প রজ্জুর তত্ত্বতঃ কিছু ক্ষতি করে না; জবা স্পর্শে স্ফটিক সত্য লাল হয় না। ঘটের ও সঙ্গে সঙ্গেই মাটীর উপলব্ধি হয়, কেবল মাটীর, সামান্য মাটীর পৃথক উপলব্ধি হয়ই না। রাধিকার ব্রজরূপ পরিণতিতে অর্থাৎ গাছ পালা পশুপক্ষী ফল পুষ্প গোপ গোপীতে তত্তৎ এবং সঙ্গে সঙ্গে রাধিকারও উপলব্ধি হয়; কৃষ্ণ ব্রজের প্রতিবস্তুতে রাধা গন্ধ পান। লৌকিক মৃদ্ঘটের ও অলৌকিক ব্রজের পার্থক্য এই যে মাটী ঘটে শরাবে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত হইলে সমগ্র ক্ষুদ্রাংশ গুলি একত্র না লইলে সমগ্র মাটি পাওয়া যায় না; কিন্তু 'সমর্থা' রাধারাণী আপনি অখণ্ডাকারেও দণ্ডায়মান,

বটে অথচ খণ্ডাকার ব্রজ গোপ গোপী প্রভৃতি বস্তুতেও, ঘটে মাটীর মত, বর্ত্তমানা। রাধা মূলরূপে পৃথকও আছেন অথচ সমগ্র ব্রজ রাধারই কায়বূ্যহ।

বিবর্ত্ত হানিকর নহে বটে, কিন্তু ঘোর ও স্বল্পভেদে দুই প্রকার। রজ্জুসর্প দর্শন কালে রজ্জুদর্শন হয় না; স্বপ্নকালে আমি যে অলীক স্বপ্নমাত্র দেখিতেছি এমন জ্ঞান প্রায়শঃ থাকে না। রজ্জুসর্প স্বপ্নাদি ঘোর বিবর্ত্ত, তত্র মোহের পরিমাণ খুব বেশী। স্ফটীক লৌহিত্য, জলে অর্দ্ধ মগ্ন সরলদণ্ডে বক্রতা, অভিনয়, দ্বিচন্দ্র, দর্পণগত প্রতিবিম্ব, দিঙ্মোহাদি স্বল্প বিবর্ত্ত; দেখিতেছি ইহাদিগকে সাক্ষাৎ, অথচ বুঝিতেছি স্ফটিক শুভ্রই, চন্দ্র একটাই, প্রতিবিম্বটা ছায়ামাত্র, দিকটা উত্তর নহে, যেহেতু তত্র সূর্য্য উদয় হইতেছে। রাধা পরিণাম ব্রজেও রসোল্লাসের জন্য কিছু বিবর্ত্ত জটিলা কুটিলাতে আছে। সকল ব্রজবাসীতেই আছে; ব্রজেতর ভূমিতে যে সকল তটস্থ ভাগ্যবান ব্যক্তি রাধাকৃষ্ণলীলাকে নিজ নিজ পরমার্থ বলিয়া বুঝিয়াছে, তাহারা রাধাগোবিন্দকেই ঈশ্বর বলিয়া বুঝে এবং ইহাও বুঝে যে রাধাগোবিন্দ পরস্পর সমান ভাবে, ঈশ্বর ভাবে নহে, রসাস্বাদ করেন। কিন্তু আসল ব্রজবাসীগণ, পীরিতের নিরতিশয়তা বশতঃ, অবিদ্যা বশতঃ নহে, গোবিন্দকে সকলে স্বজাতীয় নিজ নিজ তুল্য মূল্য সখা বা ক্ষুদ্র পাল্য সন্তান বলিয়া বুঝে এবং মাতৃস্থানীয়াগণ একটা অতীন্দ্রিয় ঈশ্বর পৃথক আছেন স্বীকার করিয়া তাঁহার নিকট প্রাণকানাই এর সর্ব্বতোভাবে মঙ্গল কামনা করেন; যৌবনমদবিহ্বলা রমণীগণ ঈশ্বরের ধার ধারে না, গোবিন্দ নাগরের চিন্তামগ্না তাহারা; ঈশ্বর কেহ আছেন কি না, তাহাকে মানিতে হইবে কি না, এরূপ ভাবনা ভাবিবার সময় তাহাদের নাই। বড় চতুর তাহারা, ঈশ্বর-ভক্ত বৃদ্ধাগণকে বঞ্চনা করিয়া সূর্য্য চণ্ডী আদি ঈশ্বর পুজার জন্য পুষ্প চয়নে অনুমতি লইয়া বনে

সংগোপনে শ্যামসঙ্গতা হয় এবং ফুল তুলিয়া সুগন্ধি সুন্দর পুষ্পে কৃষ্ণ-প্রীতিকামে নিজ কবরীভূষণ করে ও শ্যাম নটবরের জন্য মালা গাঁথে এবং নির্গন্ধ কিংশুক জবাদিগুলি দেবতা পূজার জন্য বৃদ্ধাগণের পুষ্পপাত্রে রক্ষা করে। তবে কৃষ্ণের অদর্শনে বা বিপদ সম্ভাবনা হইলে তাহারাও হয়ত কখন কোনও একটা নির্দ্দয় বিধাতার উদ্দেশে সবিলাপ সক্রোধ অথচ সাবদার সানুনয় আবেদন করে যে শীঘ্র কৃষ্ণ মিলাও, নিষ্ঠুরতা ছাড়, অবলা বধিয়া তোমার কিছুমাত্র পৌরুষ নাই। আরও কিছু ব্রজে বিবর্ত্তের কথা অত্র বলিলে চলিতে পারে। দুইটী পারিভাষিক শব্দ আছে; 'বিষয়', 'আশ্রয়'। কৃষ্ণকে যাহারা ভালবাসে তাহারা ভাল-বাসার আশ্রয়, কৃষ্ণ নিজে ভালবাসার বিষয়। আশ্রয়গুলি নিয়ত কৃষ্ণের তৃপ্তির জন্য বহুবিধ চেষ্টা করে, নানা প্রকার সেবা করে। এই আশ্রয় গুলিকে, ভোগ্যাকে, সেবক গুলিকে, আমরা নারী বলিব। বিষয়কে, কৃষ্ণকে, ভোক্তাকে, সেব্যকে, পুরুষ বলিব। একটা কৈফিয়ৎ দিয়া রাখি। রাধাকৃষ্ণের প্রেম-কাহিনী প্রাচীন হইলেও অনেকের পক্ষে তাহা নূতন; তাহাদের জন্য কোন কোন কথার পুনরুক্তি এই প্রবন্ধে করা হইবে, তাহা সকলকে সহ্য করিতে হইবে। সকলের জানা আছে যে, ক্ষুদ্র একাক্ষরী মন্ত্রই তের লক্ষবার জপ না করিলে তাহার চৈতন্য হয় না, প্রতিপাদ্য দেবতার দরশন পাওয়া যায় না। পীরিতি উক্তরূপ বীজ-মন্ত্রের অপেক্ষা বড় বস্তু নিশ্চয়।

সকল ব্রজবাসীই, কি নন্দ সুবল কি যশোমতী কুন্দ চন্দ্রা পদ্মা ললিতা রাধা, যে যাহার নিজ নিজ ভাব অনুসারে কৃষ্ণকেই ভালবাসে সুতরাং তত্র গোবিন্দই এক অদ্বিতীয় পুরুষ হইতেছে; অপর সকলেই নারী। প্রণয়িনীগণ সকলেই সপত্নী, কিন্তু কেহই অসতী বা পুংশ্চলী নহে। স্বয়ং নন্দ যশোমতী এত বড় ব্রজলীলার মধ্যে পরস্পর চুম্বনাদি মধুর

ব্যবহার করে না—কৃষ্ণগত প্রাণ, কৃষ্ণের সেবাতে অষ্টপ্রহর অতিবাহিত করে'বলিয়া পরস্পর মধুর ব্যবহারে অবসর পায় না বলিয়াও করে না বটে, অধিকন্তু দুইজনেই নারী বলিয়া ও তাহা অসম্ভব বলিয়াই নর-নারীর প্রণয় মিলনে তাহাদের উৎসাহের অভাব। সেই জন্যই গোপালকে যশোদার অযোনিজ পুত্র বলা আছে। পুরুষবেশী নন্দ সুবল শ্রীদামাদি রাধা পরিণামের ও বিবর্ত্তেরও উদাহরণ; তাহারা ত পুরুষ নহে, তাহারা রাধা পরিণাম, রাধা ধাতুতে নির্ম্মিত খণ্ড নারীগণ। এই যে 'পুরুষ' বেশে নন্দাদি নারী ইহা ঘোর বিবর্ত্ত নহে, স্বল্প বিবর্ত্ত। ব্রজটী জাগ্রৎ, ইহা স্বপ্ন হইলে ঘোর বিবর্ত্ত হইত; স্বপ্নস্থের অভিমান জাগ্রতের সত্য অভিমানের মতই দৃঢ়। রজ্জুসর্প ঘোর বিবর্ত্ত; সর্প দর্শন কালে রজ্জু সংবাদ একেবারেই তিরোহিত। কিন্তু কতকগুলি স্ত্রীলোক যাত্রার দল করিয়া তন্মধ্যে কেহ কেহ পুরুষ সাজিয়া অভিনয় করিবার কালে তাহারা পুরুষবৎ ব্যবহার করে, পুরুষাভিনিবেশও যৎকিঞ্চিৎ থাকে, অথচ তাহারা যে নারী তাহার উপলব্ধি মোটের উপর থাকেই; তদ্বৎ নন্দাদি গোপ নিজ নারীত্বের ভান সহ কৃষ্ণ-প্রীতির জন্য পুরুষ সাজিয়া নানা অভিনয় করে; ইহা স্ফটিকলৌহিত্যের মত স্বল্প বিবর্ত্ত; লাল স্ফটিক দেখিবার কালেই তাহা যে লাল নহে, শুভ্রই, লৌহিত্যটা সত্যই মিথ্যা, এরূপ বিবেচনা আমাদের থাকেই। প্রকাশ থাকে ব্রজে পুরুষবেশীগণ পুরুষাভিমান-বিবর্ত্ত-বশবর্ত্তী কতকটা বটে, নারী হইয়াও পুরুষাভিনয় সময়ে খানিকটা পুরুষাভিনিবেশ না থাকিলে পিতৃবাৎসল্য ও সখ্য রসের ব্যাঘাত হইত; রসের ব্যাঘাত হওয়া ত ঠাকুরাণীর অভিমত নহে সুতরাং ব্যাঘাত হয়ও না; ইচ্ছাময়ীর যাহা ইচ্ছা তাহাই ত হইবে। কৃষ্ণের প্রতি স্নেহে নন্দ ও যশোমতি এত উন্মত্ত যে তাহারা পুরুষ কি নারী, বা অন্য কোনও চিন্তা তাহাদের হৃদয়ে স্থানই পায় না—নন্দ পিতার মত, যশোদা মাতার মত

নিয়ত ব্যবহার করিয়া যায় মাত্র। নিষ্ঠা স্নেহে; পিতৃত্ব' মাতৃত্ব স্নেহের প্রকারভেদ মাত্র; রকমভেদ মাত্র।

অত্র একটী গুরুতর প্রশ্ন উঠে। যদি ভালবাসিলেই নারী হওয়া হয়, তবে কৃষ্ণও ত আমাদের ঠাকুরাণীকে ভাল বাসেন বলিয়া নারী হইতে-ছেন ও ঠাকুরাণী ভালবাসার 'বিষয়' হইয়া পুরুষই হইতেছেন। স্পষ্ট কথা বলিতে কি, রাই কানুর মধ্যে যে কে পুরুষ কে নারী, তাহা বিবেচনা করিবার সামর্থ্য আমাদের নাই; হয়ত তাঁহারাই নিজে জানেন না। রাই ও তাঁহার পরিণাম সমগ্র ব্রজভূমি কৃষ্ণ-প্রীতির আশ্রয় বলিয়া নারী; এবং ব্রজকে ভাল বাসিয়া ব্রজ-প্রীতির আশ্রয় বলিয়া কৃষ্ণও নারী। তবেই বেদান্তবেদ্য চরম তত্ত্বটী, একান্ত এক অদ্বয় নারীতত্ত্বই হইল নাকি? শ্রীরাধাই কি মূলা আদ্যাপ্রকৃতি শক্তি?

আমরা সচ্চিৎ ব্রহ্মের যে রস বা আনন্দ উপাধি বা সংস্থান তাহার মধ্যে বিষয়াংশকে এক মাত্র পুরুষ গোবিন্দ লইলাম, আশ্রয়াংশকে শ্রীমতী রাধা ঠাকুরাণী বুঝিয়া শ্রীরাধার পরিণাম ও বিবর্ত্ত রূপ ব্রজ ও ব্রজেতর লোক সমূহকে নারী সমষ্টি লইলাম।

যেমন ব্রজটী প্রধানতঃ রাধা পরিণাম, মৃদ্ঘটবৎ অথচ তত্র স্বল্প-বিবর্ত্তও রসের অনুরোধ আছে; নন্দাদি গোপের আসলে নারীত্বই তত্ত্ব হইলেও পিতৃবাৎসল্যাদি রস-পুষ্টির জন্য পুরুষাভিমানও কথঞ্চিৎ আছে, তেমনই ব্রজেতর বৈকুণ্ঠ ভূর্লোকাদি প্রধানতঃ রাধা বিবর্ত্ত, ঘোর বিবর্ত্ত, স্বপ্নবৎ হইলেও তত্রও স্বল্প বিবর্ত্ত আছে। ঠাকুরাণীর কৃপানুগৃহীত রাগানুগ ভক্তগণের শীর্ষস্থানীয় জীবগণ ব্রজের অতি সন্নিহিত; তাঁহারা গুরুপদ-বীর ব্যক্তি, আমাদের এক শরণ্য; তাঁহারা স্বপ্ন মধ্যেই আমাদিগকে ব্রজলীলা স্মরণ করাইয়া দেন। রূপ, সনাতন, রঘুনাথ, গদাধর, মীরা, নরোত্তম, লোচন দাস, গোবিন্দ দাসাদি মহাজনগণ এই শ্রেণীর

মহাত্মা। দণ্ডায়মান জগৎরূপ ঘোর বিবর্ত্তটা তাহাদের সম্বন্ধে ঘোররূপ নহে;-তাঁহারা জাগতিক জীর্ণাজীর্ণ স্থূল পুরুষ বা নারী দেহের ভিতরেই স্থিরতম, জরা মরণের অতীত, শুদ্ধ সাত্ত্বিক, নিত্য কিশোর, পরম সুন্দর, কৃষ্ণাকর্ষক প্রেয়সীর বা আরও উত্তম সখীর দেহাবলম্বনে বর্ত্তমান ছিলেন ও আছেন। আন্তর স্থির-দেহে, প্রীতিভূমিকা ব্রজে একটী পদ এবং জাগতিক দেহে, ভক্তি ভূমিকা ভূতলে অপর পদ রক্ষা করিয়া ইহারা দণ্ডায়মান।

ঠিক ইহাদের নিম্নাধিকারে যাঁহারা, তাঁহাদের বাসভূমি বৈকুণ্ঠ ভূতলাদি হইলেও যেন তাঁহাদের মস্তক ব্রজবেদীতে প্রায় ঠেকিয়াছে। এমন ভাগ্যবান্ ব্যক্তিদিগের মধ্যে রুক্মিনী অর্জ্জুন নারদ উদ্ধবাদির গণনা হইতে পারে। ইহাদের গোবিন্দের প্রতি ঈশ্বর বুদ্ধি থাকায় গৌরব ও সঙ্কোচ বশতঃ ইহারা গোবিন্দের গদা চক্রাদিযুক্ত শাসনপটু চারিটী হস্ত দেখেন—সুন্দর বলয়াদি মণ্ডিত দুটী হাতে ধরা মুরলী শোভিত, শ্যামচাঁদ ও চাঁদবদনী রাধা ঠাকুরাণীরকে দেখিতে বলবতী ইচ্ছা সত্ত্বেও দেখিতে পান্ না! গীতার ১১।৪৬ শ্লোকে অর্জ্জুনের কৃষ্ণ যে চতুর্ভুজ তাহার সুস্পষ্ট উল্লেখ আছে। "তেনৈব রূপেণ চতুর্ভুজেন সহস্রবাহোভব বিশ্বমূর্ত্তে।" যখন অর্জ্জুনেরই এই দশা, তখন অপরের কথা কি?

মনু প্রভৃতি ধর্ম্মশাস্ত্রে সৃষ্টি রহস্য উদ্ঘাটনের চেষ্টা হইয়াছে। তত্র অকস্মাৎ কারণ-সলিলের ক্ষুদ্রাংশে, ক্ষুদ্র হিরণ্য অণ্ড দেখা যায়; সেই অণ্ড দ্বিধা খণ্ডিত হইলে ঊর্দ্ধার্দ্ধ আকাশ-কটাহ ও নিম্নার্দ্ধ পঞ্চভূত-গঠিত জগৎ পাওয়া যায়; এই আকাশ ও জগতের নানা বিভাগ কল্পিত হইয়া ভূর্ভুবঃ স্বর্লোক এবং মহঃ জন তপঃ ও সত্য লোক এবং তল বিতল রসাতলাদি পাওয়া যায়। কারণ-সলিলের বক্রী অংশ বহু বিস্তৃতই থাকিয়া যায়; তত্র কোন লোক নাই। অনন্ত বিশাল "কারণের" সীমা শাস্ত্রকারগণের মতে মনুষ্য-দৃষ্টির অগোচর।*

আমরা বলি যে, "কারণের" সুষুপ্তি-রূপতাই ব্রহ্ম নির্বিশেষ। জাগ্রৎ রূপটী ব্রজলোক এবং স্বপ্নলোকটী জগৎ লোক। জগৎটী ব্রজের বাহিরে 'কল্পিত' হয়; কিন্তু ব্রজের ত বহির্দ্দেশ নাই; যেহেতু ব্রজ অনন্ত, ব্যাপী, সমগ্র দেশটীই ব্রজ ও নিত্যলোক; তদতিরিক্ত স্থান কিছুই নাই। আমরা যথা গৃহের ভিতর শয়ান থাকিয়া গৃহাভ্যন্তরেই স্বপ্নে বড় বড় সহর প্রান্তর রচিত দেখি, তাহা যেন গৃহের বাহিরে অথচ গৃহের বাহিরে নহে, গৃহমধ্যেই, তদ্বৎ ব্রজে থাকিয়াই কুঞ্জমধ্যে নিদ্রিত যুগল যখন স্বপ্ন দেখেন তখন ব্রজ মধ্যেই ব্রজের বাহিরে ইব নানা লোক রচিত পাওয়া যায়। তত্রতত্র গোবিন্দ আপনাকে চতুর্ভুজ বাসুদেব, শ্মশানাধিপতি শিব, অযোধ্যার রাম, জাঙ্গল নরসিংহ, দ্বারকার রাজা, সমুদ্রতীরে মোহিনী, পাতালের কূর্ম্মাদি মনে করেন; শ্রীমতী ঠাকুরাণী আপনাকে লক্ষ্মী রুক্মিণী সত্যভামা সীতা দশভুজাদি মনে করেন। যশোমতী আপনাকে কৌশল্যা, মেনকা, দেবকী আদি মনে করেন; নন্দ মহাশয় আপনাকে হিমালয় বা কোন নারীই বা মনে করেন, কোন ব্রজসুন্দরী হয় ত আপনাকে কোনও জাগতিক পুরুষই বা মনে করেন। অথচ এই স্বপ্নবিবর্ত্তের আবর্ত্তের মধ্যে আসিয়া, নানা ভ্রমে ভ্রান্ত হইয়াও তাহাদের কোনও ক্ষতি হয় না; তাহারা যে ব্রজের লোক সেই ব্রজেই যথা সময়ে একই জন্মে বা বহুনাং জন্মনাম্ অন্তে, ব্রজেই উদ্বোধিত হইবেই ও হয়। আমরাই ত তাহারা। নারদ লক্ষ্মী প্রভৃতি এবং আমরা পাষণ্ড চোর সাধু নরনারী বালক বৃদ্ধ যোগী শৈব শাক্ত যাহাই হই, আমরাই ব্রজবাসী; ঘুম ভাঙ্গিলেই আমরা বুঝিতে পারিব; এখন আমরা বুঝিতে পারিতেছি না; আমাদের মধ্যে যাহাদের স্বপ্ন ভাঙ্গ ভাঙ্গ হইয়াছে তাহারা প্রায় বুঝিয়াছে ও আমাদিগকে আমাদের স্বরূপ বিষয়ে উপদেশ দিতেছে; স্বয়ং মহাপ্রভু জিজ্ঞাসু সনাতনকে উপদেশ দিবার কালে সর্ব্ব প্রথমেই

এই চরম কথার উল্লেখ করিয়াছেন যে "জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্য দাস"। স্বরূপের স্বরূপত্বই এই যে, স্বরূপ সম্বন্ধে লোকের ভ্রম হইতে পারে, কিন্তু স্বরূপের হানি হইতে পারে না। স্ফটিক লোহিত এরূপ ভ্রম হয় হউক; স্ফটিক কিন্তু স্বরূপচ্যুত হয় না, লোহিত হয় না, শুভ্রই থাকে। আমরাই যে ব্রজের নন্দ যশোমতী, শুক শারী, ভ্রমর ভ্রমরী, বৃক্ষলতা, শ্রীদাম সুবল, কৃষ্ণ প্রেয়সী বা সখীগণ অর্থাৎ কৃষ্ণের সেবক নারীগণ তাহা ভুলিয়াছি বটে, কিন্তু স্বরূপ ভুলিলে কি হয়, আমরা নারীই আছি। গীতোক্ত কর্ম্ম-মীমাংসার শোধন করিয়া লইয়া 'প্রীতিকে' নিষ্কাম কর্ম্মের প্রবর্ত্তক বুঝিয়া যে যার নিজ নিজ কর্ম্ম বিনা বিধি, বিনা শাসন, স্বাভাবিক সহজ ভাবে, করিতে থাকার কালেই, একদিন না একদিন ব্রজে প্রবোধ উদ্বোধন জাগরণ হবেই হবে। এই 'ভরসার' কথাটী রক্ষাকবচ করিয়া সতত ধারণ করিবে। Doomsday উপস্থিত হইলে আমরা কতক স্বর্গে, কতক নরকে যাইব না; সকলেই ব্রজে যাইব, রাধাকৃষ্ণ পরিবারভুক্ত হইব।

সাংখ্যমতে প্রকৃতি একা, জড়া, বহু বিস্তৃত। পুরুষ চেতন, সংখ্যায় বহু, প্রকৃতির সন্নিহিত। সন্নিধান সম্পর্কে প্রকৃতিরও পুরুষের বা উভয়ের চাঞ্চল্য হয়। এই চাঞ্চল্যই বন্ধন। যে সকল পুরুষ প্রকৃতির সন্নিহিত হইয়াও তাহার সম্পর্ক অস্বীকার করিয়া থাকিতে পারে, তাহারা বিবিক্ত, অসঙ্গ, মুক্ত। তাহারা দর্ব্বীর মত পাকরসে ডুবিয়া থাকিয়াও রসাস্বাদনে মুগ্ধ নহে; শৌণ্ডিকের মত মদিরাঘট পরিবৃত হইয়াও মাতাল নহে; প্রস্তর খণ্ডের মত নদীগর্ভে থাকিয়াও সিক্ত নহে। তাহারা উপদেশ দেন যে দুগ্ধগত ননী' মন্থনে পৃথক্কৃত একদার হইলে আর দুগ্ধের সহ মিশ্রিত হয় না, দুগ্ধের উপর অসঙ্গ হইয়া ভাসিতে থাকে; তদ্বৎ একবার প্রকৃতির সহ সঙ্গ ত্যাগ করিলে আর তাহার মোহে মুগ্ধ হইতে হয় না, তাহার

সঙ্গেই অসঙ্গ হইয়া বসবাস করা যায়। সচরাচর পুরুষগুলি অবিবেকী দুর্ব্বল বদ্ধ, প্রকৃতির ও পুরুষের ব্যাপার চুম্বক ও চঞ্চল লোহার মত, চন্দ্রোদয়ে সাগরোল্লাসবৎ, দীপশিখার রূপে হতভাগ্য পতঙ্গের আকর্ষণবৎ, কুসুমের মধুলোভে স্বাধীন ভ্রমরের পরাধীনতাবৎ। একা বহুরূপা প্রকৃতি নানা পুরুষকে তাহাদের বিচিত্র রুচি বুঝিয়া কাহাকেও অর্থ দিয়া কাহাকেও রূপে গন্ধে পরশে রসে বা সঙ্গীতে বিভোল করে। বলবান বিবেকী পুরুষ ও নারীগণ আপনাদিগকে শুভ্রস্ফটিক বুঝিয়া লয় এবং প্রকৃতি পরম সুন্দর নীললোহিত রূপে আলিঙ্গন করিলেও আপনাদিগকে নীল লাল বুঝে না। তাহারা জানে যে প্রকৃতি জড়া, অচেতন; তাহার ক্রিয়ার বুদ্ধিপূর্ব্বকত্ব নাই; চেতন আমরাই অবোধ, মাটীর পুতুল লইয়া খেলা করি ও সুখ পাই; পুতুল গুলিকে পুত্র কন্যা বলি; পুতুল ভাঙ্গিলে দুঃখ পাই ও ক্রন্দন করি। আমরাই যদি মাটীর পুতুল লইয়া আর খেলা না করি, তবে আর ভবিষ্যতে দুঃখ পাইতে হইবে না, অবশ্য খেলার সুখও পাইব না; সুখদুঃখরূপা প্রকৃতি বিষহীন উরগের মত দণ্ডায়মান থাকিবে অথচ আমরা সুখ দুঃখের অতীত হইব, অকামুক অপ্রেমিক উদাসীন অসঙ্গ বিবিক্ত মুক্ত হইব। প্রকৃতি ঔরস পুত্রের মত ভালবাসার জিনিষ বোধ হইত, এখন বুঝিব যে লোকটা পোষ্যপুত্রের মত; থাকিলেই বা কি, মরিলেই বা কি?

সাংখ্যকার দ্রষ্টা ঋষি বটে, কিন্তু মহর্ষি নহেন, অন্ধঋষিমাত্র। হস্তী দর্শনে যাইয়া ঋষি, স্পর্শেন্দ্রিয় মাত্র সহায় লইয়া, হস্তীর পদস্পর্শে হস্তীকে স্তম্ভের মত বুঝিয়াছে। দুঃখের অবসান সঙ্গে সুখেরও অবসানকে তত্ত্ব মান্য করিয়া অকামুক অপ্রেমিক উদাসীন হইতে চাহেন। এই জগতে যে রসের মাত্রা আছে, যাহা প্রায়শঃ কামুকত্বের সুখরূপে বিবর্ত্তিত হইয়া বর্ত্তমান সেই অম্ল রস, সেই কামুকত্ব হইতেই ত্যাগমূলক, স্বার্থশূন্য অনন্ত

রসের অসীম আনন্দের, ব্রজের প্রীতিস্বরূপমূর্ত্তি শ্রীরাধা এবং প্রীতিপরিণাম ললিতা নন্দ যশোদা সুবলাদির বহু বিচিত্র স্নেহের পরিচয় পাওয়া যায় ও পাইতে যে হইবে, সে বিষয়ে সাংখ্যকার ঋষিটী অন্ধ। এই প্রীতিসম্পৎ অন্ধঋষিকে দিতে গেলেও ঋষি লইতে পারেন না; দুইটী চক্ষু তাঁহার জ্যোতিঃহীন; তিনি প্রকৃতিকে 'অচেতন ও দ্বৈত' বুঝেন এবং 'ঔদাসীন্য'কে 'তত্ত্ব' বুঝিয়া দুঃখের সহ সুখেরও বিসর্জ্জন করিতে চাহেন।

এক দরিদ্র ব্রাহ্মণকে কিছু অর্থ দিবার জন্য পার্ব্বতী শিবজীকে অনুরোধ করেন। শিবজী বলেন যে, সে অন্ধ, তাহাকে অর্থ দিলেও লইতে পারিবে না। দেবী নারীস্বভাববশতঃ শিববাক্যে বিশ্বাস না করিয়া অধিক অনুরোধ করায় শিবজী পথিমধ্যে স্বুরণ রাশি রক্ষা করিলেন। দরিদ্র তত্র উপস্থিত হইয়া মনে করিল অন্ধেরা কিরূপে রাস্তা চলে দেখিতে হইবে এবং মুদ্রিত চক্ষু হইয়া পথ চলিয়া সুবর্ণ অতিক্রম করিয়া গেল; সুবর্ণ তাহার হস্তগত হইল না। তদ্বৎ রাধাশ্যামের পীরিতি হইতে যে আনন্দ, তদ্বিষয়ে সাংখ্য অন্ধ বলিতে হইবে।

বৈদান্তিক শ্বেতাশ্বতর ৪।১০ মন্ত্রে বলেন যে "মায়াংতু প্রকৃতিং বিদ্যাৎ মায়িনংতু মহেশ্বরম্"। এই মায়াটী, প্রকৃতিটী ব্রহ্মের শক্তি; যদ্দ্বারা শক্তি-মান হইয়া ব্রহ্ম সগুণ মহেশ্বর হইয়াছেন ও জগৎ সৃষ্টি স্থিতি-ভঙ্গ বিষয়ে সমর্থ হইয়াছেন। প্রকৃতিটী ঈশ্বরের নারী, ঈশ্বরের উপাধি।

কিন্তু বেদান্ত ইহাও বলেন যে, কোনও উপাধি, শক্তি, কারণতা ব্রহ্মে থাকিলেই ব্রহ্ম অদ্বয় না হইয়া সদ্বয় হন; আইস আমরা একান্ত অদ্বয়ে পক্ষপাতী হই এবং শক্তিটাকে অস্বীকার করি। কথাটা দাঁড়াইল এই যে, ব্রহ্মে শক্তি কিছু নাই, যদি থাকিত তবে ইদংরূপ ও অদঃরূপ জগৎ সৃষ্ট পালিত ও সংহৃত হইতে পারিত, উপাধি কিছু মাত্র নাই; শক্তি রূপ উপাধির আরোপ করিয়া উপাধি লক্ষণ নিরতিশয়-কেবল, দুর্ল্লক্ষ্য

অদ্বয়াত্মাকে, উপাধির অপবাদ পূর্ব্বক কথঞ্চিৎ লক্ষ্য করা যায় মাত্র। সুতরাং যে প্রকৃতি কদাপিই নাই, তাহার আবার লিঙ্গ কি ? সে পুরুষও নহে, নারীও নহে, বালক বালিকার মত ক্লীবও নহে।

ভক্ত বলেন যে সাংখ্যের মত বেদান্তও একদেশদর্শী। প্রকৃতি বা শক্তি অদ্বয় ব্রহ্মের স্বরূপ, তাহা ব্রহ্মের অদ্বয়তার কোনও হানি করে না। শক্তি ও শক্তিমান্ ঈশ্বর অভেদে একই। সাংখ্য ও বেদান্ত যাহাই বলুক, প্রকৃতি জড় নহে, চেতন ; এবং অভাবরূপও নহে, ভাবরূপ। সচ্চিৎ ব্রহ্ম যে আছেন, সেই থাকার শক্তিটাই আনন্দ, রস ; তাহাই ত ব্রহ্ম সচ্চিদানন্দ ; রসো বৈ সঃ, রস না থাকিলে কোহ্যেবাণ্যাৎ কঃ প্রাণ্যাৎ ; রস আছে বলিয়াই চিৎ ব্রহ্মটা সৎ অর্থাৎ আছেন, নতুবা থাকিতেন না। সচ্চিদের এই যে উপাধি আনন্দ, এই আনন্দের নানা ব্যবস্থা। সচ্চিৎ বস্তু সেই উপাধির নানা প্রকারের মধ্যে কোনও না কোন অন্যতম প্রকারভেদ সহ বর্ত্তমান। সামান্য বস্তু কদাপি একাকী পৃথক ভাবে থাকিতে পারে না, একটা না একটা রকম উপাধি অবলম্বনে থাকিতে বাধ্য। মৃৎ সামান্যের 'কেবলত্ব' ঘটে না ; হয় পিণ্ডাকার না হয় ঘটাকার বা শরাবাকার হইয়াই মাটী বর্ত্তমান হয়। তদ্বৎ সচ্চিৎ কখনই কেবল বা তুরীয় হয় না ; আনন্দের নানারূপের মধ্যে একাকার অন্ধকার সুষুপ্তি বা একাকার আলোক সমাধি অবলম্বনে অথবা জাগ্রৎ বহু আকার, পিতা মাতা পুত্র, পশু পক্ষী পুষ্পধেনু বা তদ্বৎ স্বপ্নের বহু আকার অবলম্বনে বর্ত্তমান হয়। আনন্দের দুইটী প্রধান অংশ ; একটী বিষয়, অপরটী আশ্রয়। যাহাকে ভালবাসা যায় সেইটী "বিষয়" গোবিন্দ একপুরুষ ; এবং যে ভালবাসে সেইটী "আশ্রয়" রাধাঠাকুরাণী। গোবিন্দকে ভাল-বাসিবার জন্য ঠাকুরাণী নানা পরিণাম বিবর্ত্ত স্বীকার করিয়া নানা রূপে গোবিন্দকে ভালবাসা দিয়া আনন্দিত করিতেছেন, গোবিন্দ আনন্দিত

হইতেছেন এবং গোবিন্দ আনন্দিত হইলে ঠাকুরাণী নিজে অনিবার্য্যরূপে আনন্দিত হইতেছেন। বিষয়কে পুরুষ ও আশ্রয়কে নারী ধার্য্য করা গেল। গোবিন্দ ও রাধাকে ভালবাসেন, সে হিসাবে গোবিন্দ নারী, এবং ঠাকুরাণী পুরুষ ; ইহাই শক্তি শক্তিমানের অভেদ, পরম তত্ত্বের অদ্বয়ত্ব। বেদান্ত বলেন যে সুষুপ্ত ব্রহ্মটী, সামান্য বস্তু ও পূর্ণানন্দ ; কোনও অধিক আনন্দ পাইবার জন্য তাঁহার ব্রজলীলা করিবার প্রয়োজন নাই। ভক্ত বলেন বেদান্তের বুঝিতে ভুল হইয়াছে। সুষুপ্ত ব্রহ্ম পূর্ণানন্দ নহে ; বটে জাগ্রতের বহুবিধ সুখভোগান্তে মানুষ বলে যে বাশ্, আর না, চল এখন শয়ন করা যাউক ; তবেই বটে সুষুপ্তিতে কিছু একটা সুখ আছে, তাহা না হইলে কেহই জগতের সাক্ষাৎ সুখ ত্যাগ করিয়া নিদ্রাকে আদর পূর্ব্বক স্বীকার করিত না। কিন্তু সেই সুখ সুখের একদেশ, সুখের একটা প্রকার ভেদমাত্র। তথাপি মানুষ ভবিষ্যতের জন্য এরূপ বন্দোবস্ত করে যে আগামী কল্য খিচুড়ি খাইতে হইবে ; এবং তজ্জন্য নিদ্রা যাইবার পূর্ব্বেই কিঞ্চিৎ ঘৃত মুদ্‌গ যোগাড় করিয়া রাখে। খিচুড়ি খাইবার বিশিষ্ঠ সুখ একবার সুষুপ্তি হইতে বিলক্ষণ, কিন্তু সুখ ত বটেই ; ইহাও অস্বীকার করিবার উপায় নাই। পিণ্ডাকার মাটীও মাটী ; ঘটাকার মাটীও মাটী ; সুষুপ্তি রূপ একাকার আনন্দও আনন্দ ; প্রেয়সীচুম্বনে, যশোদার স্তন্যপানে, বাঁশরি বাজাইয়াও বিশিষ্ট আনন্দ আনন্দ। আনন্দটী পাইতে গেলেই সামান্যভাবে পাইবার উপায় নাই, একটা বিশেষরূপের ভিতর দিয়াই পাইতে হয়, হয় একাকার বিশেষরূপ না হয় বিশিষ্টাকার বিশেষ-রূপ। সামান্য মাটী পাইতে গেলেই পিণ্ডাকার একাকারসহ বা ঘটাকার সহ মাটীকে বুঝিতে হয়! সামান্যে বিশেষ নাই ; বিশেষে সামান্যও দৃষ্ট হয়, বিশেষও দৃষ্ট হয় ; মাটীর হস্তীতে বিশিষ্ট হস্তীর ভান হয় এবং সামান্য মাটীরও ভান হয়। তবেই সামান্য অপেক্ষা বিশেষের অধিক

মর্য্যাদা, যেহেতু সামান্যে সামান্যই আছে, বিশেষ নাই; কিন্তু বিশেষে বিশেষ ও সামান্য দুইই আছে। অর্থাৎ সুষুপ্ত ব্রহ্ম, বেদান্তমতে পূর্ণতৃপ্ত পূর্ণানন্দী স্বীকৃত হইলেও বৈষ্ণব মতে উক্ত সুষুপ্ত রূপটী, সামান্য রূপটী তত্ত্বের ক্ষুদ্রৈকদেশ মাত্র—ব্রজ-লীলাই শিষ্টদেশ, অধিকদেশ, বিশিষ্টদেশ; দুই মিলিয়া তবে পূর্ণতত্ত্ব পূর্ণানন্দ; আনন্দের পূর্ণতার অনুরোধেই বলিতে হয় যে, কেবল সামান্যরূপ লইলে চলিবে না, লীলা রূপটী লইতেই হইবে। সামান্য সুষুপ্ত ব্রহ্মটী যে অপূর্ণ, এবং রাধাগোবিন্দের লীলাবিগ্রহ সহ লীলাভূমি ব্রজই যে সম্পূর্ণতত্ত্ব তাহা শ্রীজীব গোস্বামী তাঁহার দ্বিতীয় সন্দর্ভে "ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে (ভাগবৎ ১।২।১১) শ্লোক বিচারে দক্ষতার ও বিক্রমের সহিত সুপ্রতিপাদিত করিয়াছেন। বলিয়াছেন যে, সামান্য ব্রহ্মে, সুষুপ্তিতে, আনন্দের অসম্যগাবির্ভাব, অল্পাবির্ভাব; বিশিষ্ট ব্রজলীলাতেই আনন্দের সম্যগাবির্ভাব, পূর্ণাবিষ্কার। অধিকন্তু "সামান্য" একা দাঁড়াইতেই পারে না; একটা কোনও উপাধির সহ জড়িত, অবিনাভাব অর্থাৎ নিত্য-সাহিত্য সম্বন্ধে বদ্ধ, সংশ্লিষ্ট, আলিঙ্গনে আলিঙ্গিত হইয়া তবে আত্ম-প্রকট করিতে পারে। সুতরাং ব্রহ্মের উপাধি যে আনন্দ, ব্রহ্ম সেই উপাধি একাকার সুষুপ্তি বা বহু প্রচুরাকার বিস্তৃতাকার ব্রজলীলাকে অবলম্বন করিয়াই প্রকটিত আছেন।

লীলার জন্য শক্তিমান্ গোবিন্দ হইতে শক্তি শ্রীমতী ভালবাসা ঠাকুরাণীর পৃথক্ নির্দ্দেশ হইল, কিন্তু তাহাতে বস্তু দ্বয় হইল না। শক্তি ও শক্তিমানের অভেদই নিশ্চিত বস্তু। বিবক্ষা বশতঃ দুইটীর উল্লেখ হইল মাত্র। অবিনাভাব সম্বন্ধটী একত্বসম্পাদক ও অপরিহার্য্য। ঘট লইলে, ঘটত্ব ও মাটীত্ব দুইটী দ্রব্য অবিনাভাবেই বুঝা যায়—পৃথক্ করিয়া বুঝা যায় না; এক অদ্বয় ঘট লইয়াই বিবক্ষা বশতঃ আমরা বলি যে, দেখ এই বস্তু এক হইয়াও দুই, ঘটত্ব এবং মাটীত্ব। অগ্নির দাহিকা

শক্তি বলিলে দাহিকাশক্তি এবং শক্তিমান্ অগ্নি এক হইয়াও দুইটী বস্তু পরস্পর নিত্য-সহচর নিত্যসহিত রূপে কল্পিত হইয়া প্রতীয়মান হয়। শব্দের জ্ঞাপকত্বই আছে, কারকত্ব নাই। যাহা আছে, শব্দ তাহারই জ্ঞাপক, তাহাকে আমাদের জ্ঞান গোচর করিয়া দেয়; যাহা নাই এমন বস্তু শব্দদ্বারা উচ্চারিত হইলেও শব্দ কোন অসৎ বস্তুকে সত্তাদান করিতে পারে না—শব্দের বন্ধ্যাপুত্র বা Square circle সম্বন্ধে কারকত্ব নাই। "নিরুপাধি" শব্দ থাকিলেও নিরুপাধি বস্তু নাই; যে বস্তুই আছে তাহা কোনও একটা উপাধি সহ অবিনাভাব সম্বন্ধযুক্ত হইয়াই আছে। 'শক্তি ও শক্তিমান্ বস্তু' এরূপ বাক্য-প্রয়োগ হইলেও, বস্তু 'দুইটী' হইবে না; উক্তরূপ বাক্য-প্রয়োগ বন্ধ্যাপুত্রশব্দবৎ ব্যর্থ হইবে। 'স্ব ও স্বরূপ' অথবা 'স্ব এবং স্বভাব' বলিলে একই বস্তুর পুনরুল্লেখ হয় মাত্র—অথচ যেন দুটী বস্তুর কথা হইয়া গেল এবং লীলার বিস্তারের পথ সুগম হইয়া গেল। গোবিন্দের স্বরূপ রাধা; রাধার স্বরূপ গোবিন্দ; রাধা উপাধি, গোবিন্দ উপহিত, এবং গোবিন্দ উপাধি, রাধা উপহিত। গোবিন্দ আনন্দ, রাধাও আনন্দ; একটীকে ভালবাসার বিষয়, ভোক্তা সেব্য পুরুষ লও, অপরটীকে ভালবাসার আশ্রয়, ভোগ্য সেবক নারী লও। গোবিন্দ পুরুষ রাধা নারী লও অথবা গোবিন্দ নারী রাধাই পুরুষ লও। একই কথা, যেহেতু এক অপরের স্বরূপ—"উভয়" শব্দ প্রযুক্ত হইয়াও এক অদ্বয়তত্ত্বের অদ্বয়তার হানি করিতে পারে না। এক উপহিত অপর উপাধি, সম্বন্ধ অবিনাভাব। আমরা গোবিন্দকেই পুরুষ ও শ্রীমতী ভালবাসাঠাকুরাণী রাধাকে নারী লইলাম। ব্রজে আনন্দ "পরিণাম" পাওয়া যায়, তত্রস্থগণ কেহই স্বার্থপর নহে; তাহাদের সকলের সকল চেষ্টাই কৃষ্ণসুখতাৎপর্য্যে পর্য্যবসিত; কৃষ্ণকে সুখী করিতে পারিলে তাহারা অপরিহার্য্য সুখানুভব করে; কিন্তু এই সুখানুভবের প্রত্যাশা

জ্ঞাতসারে রাখিয়া তাহারা কৃষ্ণকে সুখী করিবার উদ্যম করে না; তাহারা ভালবাসে যেহেতু কৃষ্ণ ভুবনমোহন, তাহাই কৃষ্ণকে "অবশে ভালবাসিয়া, 'অবশে' সুখ পায়। তাহারা ভালবাসা পাইয়া সুখী হইবার অভিসন্ধি রাখে না। ইহার নাম পীরিতি। জগতে আনন্দ পরিণাম নাই এমন নহে, আছে; মাত্রারূপে আছে, জরা মরণ প্রভৃতি তাহার ব্যাঘাত, তথাপি সেই মাত্রা আসল বস্তুর পরিচায়ক, indicator, হিসাবে অমূল্য উপজীব্য। কিন্তু প্রধানতঃ জগতের আনন্দের বিবর্ত্তই পাওয়া যায়; তত্রস্থগণ সেবা করিয়া, ভালবাসিয়া, ত্যাগস্বীকার পথে সুখী হইতে চাহে না—তাহারা প্রেমিক নহে; তাহারা ভালবাসা পাইয়া, সেবা পাইয়া, সুখী হইতে চাহে। তাহারা কামুক।

সচ্চিদ্ ও আনন্দ, নর ও নারী, গাঢ়ালিঙ্গনে কুঞ্জভবনে সুষুপ্ত অথবা সংপরিষ্বক্ত; উভয়েই "আত্মহারা" তখন সুতরাং এক তত্ত্ব অদ্বয় ব্রহ্ম। আনন্দটা উপাধি; চিৎবস্তু সৎ হইবার জন্য একটা রকমে "থাকিতে" বাধ্য হয়। রকমটা আনন্দ। চিৎ আনন্দে থাকেন; কখনও অব্যক্ত সুষুপ্তির আনন্দে, কখনও বা ব্যক্ত জাগ্রৎ স্বপ্নের আনন্দে। ব্রহ্ম সুষুপ্তিতে "একাকার" আনন্দসংস্থানে সংস্থিত, উপাধিতে উপহিত। পরে পাওয়া যায় সচ্চিদানন্দ-বিষয় এবং সচ্চিদানন্দ-আশ্রয়। ভালবাসার বিষয়টী গোবিন্দ, স্বয়ং ভালবাসাঠাকুরাণী রাধিকা। অত্র আনন্দ উপাধি সুষুপ্ত হইতে আপনাকে অধিক ব্যক্ত, প্রকট, প্রচার করিয়া তুলিয়াছে, একাকার বর্জ্জন করিয়াছে। আমাদের রাই শক্তি-মান্ গোবিন্দের স্বরূপ শক্তি রসশক্তি আহ্লাদিনী শক্তি; স্বরূপ শব্দেই প্রতীত হউক যে, স্ব ও স্বরূপ একই বস্তু; যে রাধা সেই গোবিন্দ; যে গোবিন্দ সেই রাধা। গোবিন্দ রাধাকে ভালবাসে; রাধাও গোবিন্দকে ভালবাসে; ভালবাসাই রস; রাধাও রস, গোবিন্দও রস! রাধার প্রীতির জন্য গোবিন্দ উদ্যোগ

করিয়া সুখের ব্রজধাম নির্ম্মাণ করিয়াছেন বলা চলে; তাহা হইলে রাধা পুরুষ হয়েন এবং গোবিন্দ নারী। আমরা কিন্তু গোবিন্দকে পুরুষ ধরিয়া এবং শ্রীমতীকে নারী ধরিয়া শ্রীমতীর দ্বারাই গোবিন্দের প্রীতির উদ্দেশে. সুখের ব্রজধাম নির্ম্মাণ কথা লিখিব। রাধিকা সহ গোবিন্দের অবিনাভাব, নিত্য-সাহিত্য; নির্ব্বিকার গোবিন্দকে সুখী করিতে রাধা ব্যতীত কেহই 'সমর্থা' নহে; যত প্রকারের সুখ হইতে পারে সকল প্রকার সুখই ঠাকুরাণী কৃষ্ণকে ভোগ করান। কৃষ্ণের 'রাই বিনু গতি নাই আর'। সুষুপ্তির একটা একাকার সুখ আছে; ঠাকুরাণী সেই সুখ গোবিন্দকে নিভৃতে সংপরিম্বক্ত হইয়া দেন। পরে ঠাকুরাণী নিজ যোগনিদ্রারূপটী গোবিন্দ হইতে উঠাইয়া লইয়া, গোবিন্দের সন্নিকটে, 'মদন-মোহন-মোহিনী' রূপ ধরিয়া দাঁড়াইয়া প্রণয়গর্ভ তরল শুভদৃষ্টি সেচনে গোবিন্দকে অভিষিক্ত পুষ্ট ধন্য কৃতার্থ করেন। যোগনিদ্রা শব্দটী ৺চণ্ডীর মধুকৈটভ বধাধ্যায় হইতে লইলাম; মদনমোহন মোহিনী শব্দের অর্থটী পারিভাষিক; ইহার ব্যাখ্যা করিব। "স্মরণং কীর্ত্তনং কেলিং প্রেক্ষণং গুহ্য ভাষণম্; সংকল্পোঽধ্য বসায়শ্চ ক্রিয়ানিষ্পত্তি রেবচ।" এই আটটী আদি রসের লক্ষণ মাত্র; ইহারা রস নহে; ইহাদিগকে আশ্রয় করিয়া রস আপনাকে ব্যক্ত করে মাত্র। যথা রক্তের উত্তাপ ও দ্রুতগতি জ্বর নহে; জ্বরের লক্ষণ মাত্র। সাধু উদ্যমে অতিরিক্ত পরিশ্রম করিলেও রক্ত উত্তপ্ত হয়। তথা উক্ত অষ্টাঙ্গও নিজে বীভৎস বা প্রশংসনীয় নহে —'অভিপ্রায়' ভেদেই বীভৎস বা প্রশংসনীয় হয়, যথা রক্তের উত্তাপ নিন্দ্য জ্বর বা স্তুতি যোগ্য পরিশ্রম ও বুঝাইতে পারে। যদি কোনও নারী গোবিন্দের রূপে মুগ্ধ হইয়া নিজ সুখের জন্য তাহার আলিঙ্গন কামনা করে, তবে তাহা ঘৃণ্য কাম, "মদন" হইবে। যদি কোনও নারী গোবিন্দের রূপে মুগ্ধ হইয়া তাহাকে এতটা ভাল বাসিতে পারে যে, সে

গোবিন্দের জন্য সকল সেবা করিতে প্রস্তুত, এমন কি যদি নিজ দেহ প্রাণ কুল শীল গোবিন্দের জন্য দিলেও গোবিন্দ সুখী হয়েন, তবে তাহাও অকাতরে দিতে প্রস্তুত, তবে সেই উক্ত অষ্টাঙ্গই প্রেম বুঝাইবে। অষ্টাঙ্গের বা তাহাদের মধ্যে কতকগুলির অনুষ্ঠান নিজেন্দ্রিয় তৃপ্তি বা অভিপ্রায় ভেদে নিন্দ্য রসাভাস অথবা অনবদ্য রস হয়। রূপ গোস্বামী উজ্জ্বলনীলমণির শেষ পাঁচটী শ্লোকে প্রেমে পূর্ণাহুতির নিষেধ করেন নাই, কিন্তু তাহাকে উত্তম বলিয়া 'অধ্যবসায়কে' উত্তমতর এবং সন্নিকটে আসনও নর্ম্ম পরিহাসালাপকেই, জয়দেব সম্মত এবং উত্তমতম বলিয়াছেন। মনে রাখিবেন রূপ গোস্বামী ঋষি।

কৃষ্ণ মদনমোহন। কোনও নারী কামুক হইয়া কৃষ্ণকে প্রার্থনা করিয়া কৃষ্ণ নিকটে যাইবা মাত্র তাহার ভুবনমোহন রূপে নারীর মতি-গতি ফিরিয়া যায়, "মদন" তাহার হৃদয় হইতে দূরীভূত হয়; তখন নিজেন্দ্রিয়-তৃপ্তি-কামনা আর থাকে না—পীরিতি জাগিয়া, কৃষ্ণের যে কোন সেবা করিতে পাইলেই চরিতার্থ হইব মনে হয়; কৃষ্ণ-সেবার জন্য যদি আলিঙ্গন দিবার আবশ্যক হয়, তবে তাহাও সহজেই দ্বিধাশূন্য চিত্তে দেয়া যায়। তবে কৃষ্ণ মদনমোহন; বৈষ্ণবদাস তাহাই বলিয়াছেন যে কৃষ্ণের 'সেরূপ হেরিলে কাম হয় প্রেমময়'। কিন্তু কৃষ্ণেরও বড় আমাদের রাই; তিনি মদনমোহন মোহিনী। নির্বিকার সংযমী কৃষ্ণও রাই দরশনে বিবশ হতভম্ব হইয়া যান। কৃষ্ণের মাধুরী খুব সুন্দর বটে কিন্তু রাধার লাবণ্যের তুলনায় তাহা কালো। রাই আমাদের মদন-মোহন-মোহিনী। রাই আমাদের তরুণী করুণাময়ী এবং লাবণ্যময়ী; তাঁহার প্রধান মাধুরী এই যে তাঁহার কৃষ্ণের প্রতি ভালবাসা অসীম, যে ভালবাসাতে স্বয়ং কৃষ্ণ অবশে আকৃষ্ট হয়েন, যে ভালবাসার পদতলে পড়িয়া থাকিবার জন্য কৃষ্ণ লালায়িত "সখীগণ করহৈতে, চামর লইয়া হাতে,

(কৃষ্ণ রাইকে) "আপনে করয়ে মৃদু বায়," অভিসারিকা নিকুঞ্জে আসিয়া মিলিলে গোবিন্দ "নিজ করকমলে চরণযুগল মোছই, হেরই চিরথির আঁখি।"

রাই যোগনিদ্রা বা যোগমায়া বা মহামায়া; রাই সুষুপ্ত গোবিন্দকে আলিঙ্গন মুক্ত করিলেই নিত্যধাম ব্রজের সমুৎপত্তি যেন আরম্ভ হইল; এবং নানাবিধ কেলিবিলাস, ছোটবড় বিরহ ও উজ্জ্বল-সমরান্তে পুনরায় দুই জনে সুষুপ্ত এবং পুনরায় জাগরণ ও ব্রজের সমুৎপত্তি। এই পারম্পর্য্যই পূর্ণ তত্ত্ব: বিরহ এবং মিলন, পুনরায় বিরহ এবং পুনরায় মিলনই রস। চিরমিলনে বিরহিণীর চক্ষুর জল ঘুচিয়া গেলে নিরুৎসাহ রসের রসত্বের অভাব হইত। তাহাই রাধাগোবিন্দ পরামর্শ করিয়া ব্রজে একেবারে চক্ষুর জল ঘুচান না; ক্ষুদ্র দীর্ঘ বিরহে প্রেয়সীর চক্ষুর জল প্রবাহিত করিয়া পরে পুনর্মিলন সংঘটনা দ্বারা নিজ পদ্মহস্তে বা চুম্বন করিয়া গোবিন্দ, প্রেয়সীর কাঁদা চাঁদবদনে অশ্রু মুছান, মিলনের অশ্রু যতই উছলিয়া উঠে, গোবিন্দ ততই সযতনে সমাদরে অশ্রু মুছান। মিলন পুরাতন হইতে পায় না; বিরহ তাহাকে নিত্য নূতন করিয়া রাখে; মিলন পুরাতন হইতে না পারায় একটা "চির অতৃপ্তির" ভিতর দিয়া চরম রসের অলৌকিক নিতুই নূতন আস্বাদন হয়, প্রতি মিলনই প্রথম মিলনের মত চমৎকার এবং বিরহের জ্বালা বরাবর সমান তীব্র; al' other pleasures are not worth its pain। জগতে এরূপ হয় না; বহু ভোগের পর ভোগ ও ভোগের বস্তুতে অনাদর আসিয়াই পড়ে; এবং ভোগের বস্তুতে কালক্রমে "যৌবনের" অভাব হইয়া, বস্তুর নাশ মরণ ঘটিয়া রসাস্বাদের ব্যাঘাত জন্মাইয়া দেয়। এবং আপনাদিগকে বহু পুরুষ বহু নারী মনে করিয়া একত্রে বসবাস করায় ভালবাসার নিষ্ঠা হয় না; স্বভাবতঃ polyandrous and polygamous নারী পুরুষের ব্যভিচার দোষ প্রায়ই, অন্ততঃ মনে মনেও, ঘটিয়া যায়। ব্রজে ব্রজবাসীর কাল বশে

কাহারই দেহের ক্ষয় বৃদ্ধি হয় না, রাধা ধাতুতে প্রস্তুত নরদেহী বা নারী-দেহী সকলেই নারী ও রাধাধাতু ভালবাসা উপাদানে উঠিত। সকলেই "এক" পুরুষ কৃষ্ণকে যে যাহার ভাব অনুসারে ভালবাসে, ব্যভিচার সম্ভাবনা মাত্র তত্র নাই।

কৃষ্ণ জাগিয়া উঠিয়া পার্শ্বে দেখিলেন পীতবসন; সোণার বরণ পীতবসন অঙ্গে জড়াইতে গিয়া দেখেন তাহা বসন নহে, তাহা শ্রীরাধা হ্লাদিনী ভালবাসাঠাকুরাণী। ঠাকুরাণী বলেন যে পরাণ বঁধুয়া তুমি, তোমাকে আমি ভালবাসি; আমার ষোলকলার এক এক কলা হইতে তোমাকে সহস্র, মোটের উপর ষোল হাজার প্রণয়িনী দিব। (ইহা স্কান্দ প্রভাস খণ্ডে শিবগৌরী সম্বাদে দ্রষ্টব্য)। তাহারা তোমাকে নানারূপ, তরতমভাবে, ভালবাসিবে। কেহ মৃদুস্বভাবা কেহ কিছু প্রগল্ভা; কেহ চতুরা কেহ সরলা; কেহ হালকা, অল্পে তুষ্টা, কেহ গম্ভীরা, হৃদয়ে অশেষ প্রেমধারণ করিয়াও মুখে প্রকাশ করে না, যেন কৃষ্ণে উদাসীন; কেহ সখী পরিবৃতা যূথেশ্বরী, কেহ বা সখীশূন্যা স্বয়ং প্রধানা; কেহ অক্ষমা-শীলা; কেহ বা তোমাকে অনুগ্রহ করিবে না, স্পর্শ করিবে না অথচ তোমার প্রেয়সীদিগের বিশ্বাসী দূতী হইবে। তাহারা পরস্পর ঈর্ষ্যান্বিতা হইবে না; তোমার সুখের চেষ্টাতেই সকলের তাৎপর্য্য থাকিবে, আমার অংশ আমার পরিণাম তাহারা, আমার ধাতু আমার স্বভাবই পাইবে; তুমি যাহারই সহিত সঙ্গত হইয়া সুখ পাও তাহারা তাহাতেই অনুকূল হইবে, অনুমোদন করিবে, সেই ব্রজনারীকে সকলে মিলিয়া সুসজ্জিত করিয়া তোমার ভোগের উপযুক্ত নৈবেদ্য করিয়া তোমার নিকট অভিসার করাইবে। যদি কখন ঈর্ষ্যাভাব, বাম্য, দেখ তখন বুঝিয়া লইও যে, তোমাকে সুখ দিবার জন্যই তাহারা ঈর্ষ্যান্বিতা না হইয়াও ঈর্ষ্যার অভিনয় করিতেছে। [লৌকিক সাপত্ন্যে ঈর্ষ্যা থাকে থাকুক লোকোত্তর ব্রজে

ঈর্ষ্যা নাই। লোক একটু উচ্চ হইলেই, ব্রজে পঁহুছিবার পূর্ব্বেই, তত্র সাপত্ন্য হইতে ঈর্ষ্যা তিরোহিত হয়। একদা মেনকা উমাকে বলিয়াছিলেন যে মা, তোমাকে ভিখারী বরে সমর্পণ করিয়াছি এবং আরও গুরুতর দোষ করিয়াছি, গঙ্গা সতীনের উপর দিয়াছি। দেবী, যিনি শিবনিন্দা শুনিয়া প্রাণত্যাগ করিতে পারেন, গর্জ্জন করিয়া বলিয়াছিলেন যে জননী! শিব ভিখারী নহে, কুবের তাহার ভাণ্ডারী এবং গঙ্গা সতীন হইলে কি হয়, সে আমাকে তোমার অপেক্ষা অধিক ভালবাসে; "হর মোরে হৃদে রাখে, সে জটায় লুকায়ে দেখে; সে আমার প্রিয়সখী সুখের সতিনী, তোমার অধিক ভালবাসে সুরধুনি।] দেখ কৃষ্ণ, তুমি যদি প্রেয়সীর নিকট প্রহার পাইয়া আনন্দ পাইতে চাও, তবে শ্যামার নিকট যাইও, সে তোমার অল্পমাত্র কশুর পাইলেই অভিমানে উচ্চ ক্রন্দন করিবে ও সঙ্গে সঙ্গে তোমাকে মারিবে, অন্যা কেহ পারিবে না, অবশ্য ফুল ছুঁড়িয়া মারিবে। (অধীর প্রগল্‌ভা শ্যামার উদাহরণ উজ্জ্বলনীলমণিধৃত নায়িকাভেদাধ্যায়ে দেখিতে পাইবে)। তোমাকে পায়ে ধরাইবে এমন নায়িকাও দিব।

স্বকীয়ার প্রণয় সুলভ বলিয়া তোমার তত সুখদ হইবে না; আমিই অভিমন্যু (আয়ান) হইয়া তাহাকে বিবাহ করিব; আমিই জটিলা কুটিলা হইয়া রাধিকাকে তোমার দুর্ল্লভ করিব এবং তাহাদিগকে প্রিয় সখী ললিতার সহায়তায় বঞ্চনা করিয়া আমার মণিমন্দিরে গোপনে তোমাকে আনিব, অথবা সঙ্কেত কুঞ্জে নিজেই অভিসার করিব।

সখাসঙ্গ তুমি বড় ভালবাস বলিয়াই ত আমাকে সুবল মধু-মঙ্গল শ্রীদামাদি হইতে হইয়াছে; ইহারা আমারই প্রতিনিধি হইয়া তোমার সুখোপকরণ। আমি ও ইহারা তোমাকে এত ভালবাসি, ভালবাসে, যে কদাচ তোমার সঙ্গ ছাড়ি না, ছাড়ে না; তুমি স্বপ্নে গেলেও সঙ্গে যাই,

যায়। [কৃষ্ণ যখন স্বপ্নরাজ্যে বিচরণ করেন তখন কৃষ্ণের সহ যাহাদের অবিনাভাব, নিত্যসাহিত্য, প্রগাঢ় প্রীতি বশতঃ যাহারা কৃষ্ণকে ছাঁড়িয়া থাকিতে পারে না, তাহারা সেই স্বপ্নরাজ্যে যাইয়া কৃষ্ণসমীপে থাকে ; ইহা অলৌকিক হইলেও সত্য। শ্রীমন্মহাপ্রভুও যাঁহাকে গুরুমান্য করিয়াছেন সেই মহাজন রামানন্দ রায়, জগন্নাথ বল্লভ নাটকে স্বয়ং লিখিয়াছেন যে একদা শ্রীমতীর অন্তরঙ্গদূতী কৃষ্ণের নিকট অনঙ্গ লিপি আনয়ন করিলে কৃষ্ণ কপটতা করিয়া দূতীকে প্রত্যাখ্যান করেন। নর্ম্মসখা মধুমঙ্গল তাহাতে ব্যথিত হইয়া কৃষ্ণকে ভৎ‍র্সনা করে।

শুন বর নাগর কান
তুহু চরিত হাম কিছুই না জান।
শয়নে স্বপনে তুহু হেরিরূপ তার,
রাধে রাধে বোলসি লাখ লাখ বার।
হৃদয়ক মাঝ ভাবসি তাক নাম,
কাঁহে কপট অব কর গুণধাম।
অব সো অনুরাগিণী ভেজল দূতী
তুহু কাহে উপেখল তাকর পাঁতি [পত্রিকা]
যাচত লছমী চরণে কর দূর
শেষে দুখ পাওবি মূরখ চতুর।
সুজনক না হোই এত অবিচার
লোচন দাস কহত রসসার।

কৃষ্ণ অবাক্ হইয়া ভাবিল যে ধূর্ত্ত বটু আমার গূঢ় রস ও স্বপ্নবৃত্তান্ত কিরূপে অবগত হইল। বটু বুঝিল, বলিল, সখা হে, আমি তোমার সঙ্গ ছাড়িয়া থাকিতে পারিনা—তুমি স্বপ্নে যাইলে আমিও যাই ; তোমার কোন কথাই আমার নিকট গোপন রাখিতে পারিবে না।]

তুমি যদি পিতা হইয়া সন্তানকে আদর করিয়া আমোদ চাও, আমি ব্রজে সে সুখ তোমাকে দিব না, দিলে ব্রজের অপমান করা হইবে। অযোধ্যায় লব কুশ পাইবে, দ্বারকায় প্রদ্যুম্ন পাইবে, কৈলাসে কার্ত্তিক দিব। ব্রজের রস আপনাপনি এত ভরপূর সম্পূর্ণ যে রাধাকৃষ্ণের মধুর শুদ্ধা প্রীতিকে, সন্তান মধ্যস্থ হইয়া বিন্দুমাত্র অতিশয়িত করিতে পারে না। ইহার পূর্ণতার জন্য মধুর আলিঙ্গনই চরম; সন্তানের অপেক্ষা নাই।

তুমি নাকি বাবার আদর ভালবাস, মার স্নেহের জন্য লালায়িত; ভাবনা কি আছে? আমি নন্দ মহারাজ হইয়া তোমার জন্য হাটবাজার করিব এবং যশোদারাণী হইয়া তোমার লালন পালন ও শাসন করিব। তোমার সখা সখাগণকে আহ্বান করিয়া প্রত্যহ নানাবিধ অন্নব্যঞ্জন মিষ্টান্নাদি পাক করিয়া তোমার সঙ্গে একত্র বসাইয়া খাওয়াইব। ধেনু হইয়া তোমার সাথে ফিরিব, বনে ঘন দুগ্ধ তোমাকে পান করাইব, বংশী হইয়া তোমার সাধের রাধানাম গাহিব; তোমাকে আমার নয়নতারা করিয়া রাখিব, আমি তোমার কণ্ঠলগ্না হইয়া তোমার ধনমালা হইব; কদম্ব তরু হইয়া গ্রীষ্মে সুশীতল ছায়ার মধ্যে তোমাকে রাখিব, মলয় পবন হইয়া, যমুনার জল হইয়া, তোমাকে আলিঙ্গন করিব; অঙ্গ পরিমলে তোমাকে উন্মত্ত করিবার জন্য নাভিতে কস্তুরী ধারণ করিব, কনক লতা হইয়া শ্যাম তমালকে জড়াইয়া ধরিব, শুকশারী ও গুঞ্জৎ ভ্রমরী হইয়া নিভৃত কুঞ্জ বিলাসের সাক্ষী হইব এবং সেই ভ্রমরা ভ্রমরীই জগতে, বিদ্যাপতি চণ্ডীদাসাদি মহাজন হইয়া স্বচক্ষে দেখা উজ্জ্বল কেলির সুসমাচার প্রচার করিব। নানা ঋতুর বৈচিত্র্য স্বীকার করিব; লতায় পুষ্প, পুষ্পে মধু, মধুলুব্ধ অলি, লতাবিতান লতাবিতানে আমাদের সুখশয্যা, শারদচন্দ্র, রাসস্থলী, মরালের নৃত্য কোকিলের সঙ্গীতাদি কলাবিদ্যা সবই হইবে; তুমি সকল রকমের রসের মধ্যে কোনটাতেই বঞ্চিত হইবে না। যদি বল

নারী হইয়া পুরুষকে ভালবাসিয়া কিরূপ রসাস্বাদ হয় তাহা জানা যাইবে কিসে? আইস আমি মৃগমদ মাখিয়া কৃষ্ণ হই, তুমি কুঙ্কুমপঙ্কে অঙ্গ ঢাকিয়া রাই হও; আমি বিপরীত কাণ্ড করিয়া তোমাকে আশ্রয় জাতীয় রসাস্বাদন করাইব এবং ভবিষ্যতে তোমাকে নদীয়ার গোরাচাদ করিব, তখন তুমি 'কাঁহা যাঁউ কাঁহা কৃষ্ণ পাঁউ' বলিয়া বিরহে আশা মিটাইয়া আর্ত্তনাদ করিও।...এইরূপে কৃষ্ণের সকল রকম সুখের উপকরণ সমষ্টি ব্রজ নির্ম্মাণ শেষ হইল। ঠাকুরাণী ব্রজনির্ম্মাণ করিলেন, সমগ্র ব্রজটা ভালবাসা ঠাকুরাণীর কায়ব্যূহ; তত্র মধুর সখ্য বাৎসল্য দাস্য সকল রসই কৃষ্ণের প্রমোদের জন্য সংগৃহীত ও যথাযোগ্যস্থলে ধৃত সন্নিবিষ্ট রহিয়াছে। লক্ষ্য করিতে হইবে যে ঠাকুরাণী ব্রজ সৃষ্টির পরে, বর্ত্তমানে নিজ সৃষ্টি সামর্থ্য বিষয়ে Self conscious নহেন; এই self consciousnessএর অভাব, ভ্রমবশতঃ নহে, নিরতিশয় প্রেমবশতঃ; নিরতিশয়তাটা এই যে স্নানাহার জাগ্রৎ স্বপ্নাদি যাবতীয় ব্যবহার সময়ে রাধার কেবলমাত্র কৃষ্ণধ্যান থাকে, নষ্টা স্ত্রীর উপপতি ধ্যানবৎ। তিনি আপনাকে বড় বলিয়া, ঈশ্বরী বলিয়া জানেন না এবং গোবিন্দকেও ঈশ্বর বলিয়া জানেন না; নাগর বলিয়াই, প্রিয় বলিয়াই জানেন এবং দেবতা বলিয়া জানিলে যতটা না ভয়ে ভয়ে আদর করিতে পারিতেন, ত্রাসরহিতভাবে, প্রিয় সখা বুঝিয়া, প্রিয় দেবতা বুঝিয়া ততোধিক লজ্জামাখা আদর সোহাগ করেন। এবং লজ্জা বাঁচাইবার জন্য নিজে প্রগল্‌ভতা ত্যাগ করিয়া, ললিতাদি চতুর প্রগল্‌ভা প্রিয় সখীর পরামর্শ মত যখন যেমন তখন তেমন নির্দ্দিষ্ট প্রথায় সখীবশ হইয়াই যেন শ্যামসঙ্গমিতা হয়েন। ললিতার বয়স রাধার বয়স হইতে এক বা অর্দ্ধ বৎসর অধিক। কখনও বা সহচরী মঞ্জরীগণসহ কিঞ্চিৎ প্রগল্‌ভা হইয়াই শ্যাম চাঁদ চাঁদ চাঁদের বামে চাঁদবদনী মিলিতা হয়েন। মঞ্জরীগণ বয়সে রাধারাণীর কিঞ্চিৎ ছোট। উভয়থাই কৃষ্ণপ্রীতিতেই রাধার তাৎপর্য্য;

ললিতাসহ লজ্জাশীলা রাইকে পাইয়া এবং মঞ্জরীগণ সহ স্বাধীনভর্ত্তৃকা রাইকে পাইয়া কৃষ্ণ দুই প্রকার, মধুর হইতে সুমধুর, রসাস্বাদ 'তৃপ্ত' হয়েন। অথচ চির অতৃপ্তির সহিত পুনঃ পুনঃ সেই নিত্য নূতন রসাস্বাদ লুব্ধ হইয়া উৎকণ্ঠিত আছেন। লাখলাখ যুগ ঠাকুরাণীকে হিয়াপর রাখিয়াও কৃষ্ণের হৃদয় জুড়ায় নাই, লাখ লাখ যুগ রাধা মাধুরী দেখিয়াও কৃষ্ণের নয়ন তিরপিত হয় নাই; অদ্যাবধি কৃষ্ণ রাধার দুর্ল্লভ দরশনের লোভে ভানুর বাটীর নিকট বেদিয়া, নাপিতানী, সাপুড়ে, বৈদ্য, সন্নাসিনী হইয়া বেড়াইতেছেন; রাধামন্ত্র হরিনামের মত সতত বাঁশরীতে জপিতে-ছেন এবং ললিতাদি সখীকে গুরু স্বীকার করিয়া সদাসর্ব্বদা ইষ্টদেবী রাধা-মিলনের জন্য খোষামোদ করিতেছেন। ঠাকুরাণীরও অবস্থা তদ্বৎ, পাগলিনীর অবস্থা; ঠাকুরাণী কুন্দলতাকে বলিয়াছিলেন

শুন সখী কুন্দলতা আমার বচন
কোথা বিহরয়ে সেই দুর্ল্লভ দর্শন ॥

প্রত্যুত্তরে কুন্দলতা বলে, "রাধে কি লোভ তোমার, রাত্রিদিবা কৃষ্ণসঙ্গে করহ বিহার। তথাপি উৎকণ্ঠা তার দর্শন কারণে; তোমার 'দুর্ল্লভ' হরি হইল কেমনে।" অকৃত্রিম, গাঢ়, কামগন্ধশূন্য, লোকোত্তর ব্রজ-প্রেমের নিদর্শন এই যে সর্ব্বদা উপভোগেও প্রেমের 'বিষয়' অভুক্ত-পূর্ব্বের ন্যায়ই প্রতীয়মান হয়।

আর একটী ছোট কায়ব্যূহ কেবল মধুররসঘন গোপনে প্রস্তুত আছে; রাধা এবং তাঁহার অষ্ট নর্ম্মসখী, নবনারী, একত্রীভূত হইয়া একটী কৃষ্ণ-বশীকার অপূর্ব্ব প্রতিমা সাজাইয়া রাখিয়াছেন। অষ্টসখী প্রত্যেকে পৃথক্ দেহের দেহী হইলেও ভিতরে একযোগ আছে; কৃষ্ণ ললিতাকে চুম্বন করিলে ললিতার দেহ তথা রাধার দেহ, তথা বিশাখা চম্পকলতা চিত্রা তুঙ্গবিদ্যা ইন্দুলেখা রঙ্গদেবীর, সকলের দেহই পুলকান্বিত হয়; শিহরিয়া

উঠে ; কৃষ্ণ রাধার স্তনতটে স্পর্শ করিলে সকল সখীরই মহোৎসব হয়। আরও ক্ষুদ্রতর একটী কায়ব্যূহ আছে, সেটীর গুহ্যতম মূলটী রাধা ; সেই মূলে রসসেক করিলে সমগ্র দেহ লতিকার পল্লব পত্র পুষ্পের পুষ্টি লাবণ্য সম্পাদিত হয়। নিগূঢ় নির্জ্জন মিলনে কৃষ্ণ সেই কায়ব্যূহটীকে লাভ করেন। সেটী একা, সখীবিরহিতা, সঞ্চারিণী কনকলতা রাধা। রাধার যে অঙ্গেরই কেন পরিতোষ কৃষ্ণ পরশে হউক, কৃষ্ণ গণ্ডস্থল চুম্বন করুন বা অধর সুধা পান করুন বা শস্ত যুগলের পূজা করুন বা রাধা পদ সম্বাহন করুন, রাধার সার্ব্বাঙ্গীন পুলক হয় ও সেই পুলক দর্শনে গোবিন্দ অধীর অবশ ও অতুলানন্দে আনন্দিত হয়েন। নিভৃত লীলা সময়ে রাধার ভিন্ন ভিন্ন অঙ্গগুলিই, বদন স্তন করকিসলয় রম্ভোরু পদকমলাদিই ললিতাদি সখীজন ; কৃষ্ণ যে কোন অঙ্গ পূজা করিলেই, যে কোন সখীকে আদর করিলেই সর্ব্বাঙ্গ, সকল সখী প্রমোদিত চরিতার্থ হয়। রাধাই পূর্ণানন্দ, বৃহৎ আনন্দ ; বৃহৎটীকে বুঝিবার জন্য ক্ষুদ্রের পরিচয় আবশ্যক ; তাহাই রাধা চন্দ্রা পদ্মা কুন্দ নন্দ যশোমতী সুবল ধেনু, কোকিল, মাধবী, যমুনাদি ন্যূনরূপে আপনাকে বিন্যস্তা করিয়া কৃষ্ণকে ন্যূন আনন্দ দিয়া আপনার মাহাত্ম্য সপ্রমাণ করিয়া রাখিয়াছেন। সমগ্র ব্রজের সুখ, সুখ বটে কিন্তু অল্প, তাহা কৃষ্ণ বুঝেন ; কৃষ্ণ ব্রজের কাহারও বশ নহেন কেবল রাধা-বশ ; রাধার ভালবাসাই ভূমা। কেবল কৃষ্ণ কেন সকলেই রাধার প্রাধান্য স্বীকার করে। যেহেতু রাধাই যে গোবিন্দ ; সেই গোবিন্দকে তাহারা যতটা ভালবাসে, সেই রাধাকে ততটাই এবং সহজেই আপনাপনি ভালবাসে ; যেহেতু রাধাই গোবিন্দ। বুঝিয়া দেখ নন্দ নন্দনটী কে ? নন্দটী আনন্দ-স্বরূপ রসো বৈ সঃ, আনন্দ, ব্রহ্ম, গোবিন্দ ; নন্দনটী সেই নন্দেরও আনন্দদায়ক, সেই গোবিন্দকেও সুখী করিতে সমর্থা অর্থাৎ নন্দনন্দনটী রাধারাণীই, ভালবাসা ঠাকুরাণীই ; তবেই প্রসিদ্ধ নন্দনন্দন কৃষ্ণই স্বয়ং

রাধা এবং সুতরাং গোবিন্দ রাধাকে প্রধান স্বীকার করিতে বাধ্য এবং করেন; অবশেই তিনি রাধাবশ হইয়া আছেন। তত্ত্বের অর্দ্ধাংশ রাধা ও তত্ত্বের বক্রী অর্দ্ধাংশ গোবিন্দ এরূপ নহে; প্রত্যেকেই পূর্ণ ষোল আনা, অগ্নি শক্তিমান ও পূর্ণ, দাহিকা শক্তি ও পূর্ণ; পরস্পর পরস্পরের স্বরূপ, অভেদে স্বরূপ; অথচ প্রত্যেকে অপরের ভালবাসার বিষয়ও বটে আশ্রয়ও বটে। গ্রন্থ পরিসমাপ্তির পূর্ব্বে ঠাকুরাণীর জয় দিতে হইবে; ঠাকুরাণীর প্রাধান্যের পরিচায়ক দুই একটা দৃষ্টান্ত দিলেই তাঁহার জয় গান করা হইবে।

ব্রজে প্রণয়িনীগণের মধ্যে তিনজন বড়; রাধা ললিতা এবং চন্দ্রাবলী; রাধা যূথেশ্বরী; চন্দ্রাও যূথেশ্বরী; কোনও যূথেশ্বরী অপরার কুঞ্জে অপরার সহ গোবিন্দ মিলনে সাক্ষী হইতে পারে না—তাহাতে মর্য্যাদার হানি আছে, তাহাই এক যূথেশ্বরী অন্য যূথেশ্বরীর মন্দিরে যায় না। ললিতার কৃষ্ণে পীরিতি রাধার পীরিতির সহ অত্যন্ত সমান এবং ললিতা নিজে যূথেশ্বরী হইলেই পারিত; কিন্তু যূথেশ্বরী হইলে রাইকানু যুগল দেখা ত ঘটিবে না; তাহা না দেখিতে পাইলে জীবন ত সফল হইবে না বুঝিয়া চন্দ্রাপেক্ষা চতুরা ললিতা যূথেশ্বরীত্ব স্বীকার করে নাই; রাইকে ছোট বহিনের মত ভাল বাসিয়া রাধার অন্তরঙ্গ সখীত্ব স্বীকার করিয়া, কৃষ্ণ বিনা রাই সুখী নহে ও রাইবিনা কৃষ্ণ সুখী নহে বলিয়া নানা কৌশলে যুগল মিলন ঘটান। রাধার দ্বিতীয়া মূর্ত্তি ললিতা; ন্যূন মূর্ত্তি নহে; ললিতা নিজ নিভৃত হৃদয়ে কৃষ্ণের প্রতি রাধার তুল্য প্রেমকে—অগ্নিকে শমীলতার মত ধারণ করিয়া—নিজ স্বার্থ ত্যাগ করিয়া স্নেহ পালিতা রাধারাণীর সহ প্রিয়-দেবতা কৃষ্ণের প্রীতি বিলাস সংঘটন করে এবং তাহাদের সুখে নিজে পরম সুখী হয়। ইহা রাইও জানে, কৃষ্ণও জানে; এবং রাইও ঈর্ষ্যা রহিত হইয়া ললিতা-কৃষ্ণ যুগল লীলা নানা ছলে কখন কখন সম্পাদন করিয়া

ললিতার সখীত্ব স্বীকার করিয়াই কত না জানি আনন্দানুভব করেন; কৃষ্ণ ও রাধা ললিতার পরস্পর প্রীতি দেখিয়া চমৎকৃত হয়। ইহাও রসের একটা উত্তম প্রকার-ভেদ; কৃষ্ণকে সুখী করিবার জন্যই, কৃষ্ণসুখ তাৎপর্য্যেই রাধা জ্ঞাতসারে এ রসের অবতারণা করে। রাধা প্রাধান্য আলোচনার সময় সুতরাং রাধার দ্বিতীয়া মূর্ত্তি, রাধার সমান ললিতার সহ রাধার ছোট বড় হিসাবে তুলনা করা হইবে না। চন্দ্রাবলী ব্যতীত অন্য যূথেশ্বরীও আছে কিন্তু তাহারা চন্দ্রা হইতে কনিষ্ঠ, ন্যূন; সুতরাং চন্দ্রা হইতে রাধার উৎকর্ষ দেখাইলেই প্রেয়সী গণের মধ্যে রাধার অবিসংবাদিত শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদিত হইবে; বাৎসল্য সখ্যাদি রস মধুর রসের অনেক নিম্নে; প্রেয়সীবর্গের শ্রেষ্ঠত্বই চরম এবং প্রেয়সীগণের মধ্যে রাধারাণীর শ্রেষ্ঠত্ব চরমতম।

দৃষ্টান্ত:—(১) কৃষ্ণ মথুরায় যাইলে সকল গোপীগণই মর্ম্মপীড়িতা ও শীর্ণা হইয়া পড়ে। চন্দ্রাবলী যূথেশ্বরী হইয়াও নিজ মর্য্যাদা ত্যাগ করিয়া রাধার কুঞ্জে আসিয়া বলে যে, সকল গোপী মিলিয়া রাধার সেবা করিয়া রাধাকে বাঁচাইতে হইবে; এক মাত্র রাধাই কৃষ্ণকে আকর্ষণ করিতে পারে; রাই মরিলে কৃষ্ণ আর কিসের জন্য গোকুলে ফিরিবে বল? রাই বাঁচিলে তবে কৃষ্ণ গোকুলে ফিরিবে। এই দেখ চন্দ্রা নিজেই রাধার প্রাধান্য স্বীকার করিল। চন্দ্রা যে জানে; চন্দ্রার সহ নির্জ্জন অবস্থান সময়েও কৃষ্ণের গোত্রস্খলন হয়; কৃষ্ণ এত রাধা-গত-প্রাণ যে, সে সময়েও চন্দ্রাকে রাধা সম্বোধন করিয়া ফেলে;—করিয়া বটে লজ্জিত হয়, কিন্তু চন্দ্রা ত নিজ ন্যূনতা বুঝিতে পারে।

(২) চন্দ্রার কুঞ্জ হইতে খণ্ডিতা রাধার নিকটে কৃষ্ণ ভোরে উপস্থিত। রাধাকে ও ললিতাদিকে লজ্জা দিবার জন্য চন্দ্রাসখী পদ্মা আসিয়া বলে, কৃষ্ণ তুমি চন্দ্রার পদে প্রাতে আলতা পরাইয়া চন্দ্রার সোনার নূপুর কোথা

রাখিয়াছ বল, আমরা খুঁজিয়া পাইতেছি না। ললিতা বলে যে কি পরিতাপ! কৃষ্ণটা বোকা রাখালই বটে; ইহাকে কুঞ্জ হইতে তাড়াইয়া দেওয়া হউক, যেহেতু কৃষ্ণ হারাইয়া যাহারা মূর্চ্ছিত না হইয়া সোণার গহনার খোঁজ করে তাহাদের বন্ধু ছোট লোক, আমাদের সভায় সে বসিবার যোগ্য নহে। অত্র ললিতা রাধার প্রাধান্য স্থাপন করিলে পদ্মা লজ্জায় আধাবদন হইয়া দ্রুত পলায়ন করিয়াছিল।

(৩) রাসে নৃত্য করিবার সময় চন্দ্রাবলী সাবধান হইয়া পদক্ষেপ করিতে ছিল পাছে নিজ পদে কৃষ্ণপদ স্পর্শ হয়; কৃষ্ণে সেই গৌরব বুদ্ধি মধুর প্রীতির আশ্রয় চন্দ্রাতে শোভা পায় নাই; ইহা কেলি বিলাসে পূর্ণ আত্মীয়তার অভাব বুঝাইয়াছিল, তাই রাধাসখীগণ গা টেপাটেপী করিয়া হাস্য করিয়াছিল।

(৪) কৃষ্ণ নিজেই রাধাকে বলিয়াছেন যে "তুমিই আমার মূলমন্ত্র তুমিই হরিনাম।"

(৫) কৃষ্ণ রাধাপদ প্রসাধন করিয়া অলক্তরাগে রাধাপদে নিজ সহস্র নাম লিখিতেন; অপর কোন প্রেয়সী-পদে লেখেন নাই। রাধা চলিয়া গেলে পথিমধ্যে রাধাপদ চিহ্নে কৃষ্ণ চুম্বন করেন, এত পীরিত। রাই বলেন যে—

পদচিহ্ন মোর দেখিয়া বাটে, প্রতি পদচিহ্ন চুম্বয়ে কান,
তা দেখি আকুল বিকল প্রাণ।
সিনান দোপর সময়ে জানি, তপত পথে ঢালয়ে পানি।
আমার অঙ্গের বাতাস যে দিকে, সে মুখে সে দিনে থাকে।

(৬) কৃষ্ণকে রাধা ভালবাসেন একনিষ্ঠ হইয়া; কৃষ্ণ বহু প্রেয়সীর অনুরোধে রাধাকে ততটা ভালবাসিতে পারেন নাই বলিয়া রাধারই সেই ঋণ পরিশোধ করিবার জন্য জন্মগ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন; হইয়া নদীয়ায় গৌর সুন্দর হয়েন।

(৭) প্রধানা 'সমর্থা' বলিয়া রাই কৃষ্ণকে যে রমণীতে লোভী বুঝেন কৃষ্ণকে সুখী করিবার জন্য সেই রমণীকে কৃষ্ণের ক্রোড়ে বসাইয়া বলিতে পারেন যে—

"তভু তিঁহ মোর প্রাণনাথ"; ইহা চূড়ান্ত স্বার্থত্যাগ, নিরতিশয় প্রীতি।

(৮) একদিন গোপীগণ কৃষ্ণান্বেষণ সময়ে বনে বরদাতা বাসুদেবকে দেখিয়া প্রণাম পূর্ব্বক জানিতে চাহিয়াছিল যে কোন পন্থায় যাইলে কৃষ্ণ মিলিবে; বাসুদেবও গুরুর মত অঙ্গুলি হেলাইয়া পথ দেখাইয়াছিলেন। ক্রমে রাই আসিয়া বাসুদেব দেখিয়া বলেন 'আহা মরি কৃষ্ণ, এ আবার কি সাজ সেজেছো'; বাসুদেব ঠাকুর বিশেষ চেষ্টা করিয়াও দুখানা অতিরিক্ত হস্ত রাখিতে পারে নাই, রাধার পীরিতে দুখানা হস্ত শঙ্খ চক্র গদাপদ্ম খসিয়া পড়ে ও তাহাকে বংশী ধরিয়া রাধা-বিনোদ রূপে দাড়াইতে হয়।

(৯) কৃষ্ণ কোলে রাধা কাঁদে বিচ্ছেদ ভাবিয়া, এত অনুরাগ এত পীরিত আর কোথাও নাই।

(১০) সংকেত বংশী বাজিলেই বনে যাইতে হইবে; অতএব রাধা সমক্ষে দর্পণ রাখিয়া ইতোমধ্যে বেশভূষা তিলকাদি রচনা করিতেছিল। যেহেতু কৃষ্ণকে সুখী করিতে হইলে বদন যত সুশোভন প্রিয়দর্শন করিতে পারা যায় তাহা ত করিতে হইবে। কিন্তু ধ্যান আছে কৃষ্ণে। দর্পণে নিজ মুখ দেখিতে দেখিতে বাঁশী শুনা গেল। সচকিত রাধা সহসা দর্পণে কৃষ্ণ-মুখ দেখিল, নিজ মুখপ্রতিবিম্ব না দেখিয়া কৃষ্ণ-মুখ দেখিল; এত দৃঢ় কৃষ্ণে ধ্যান, এত ভালবাসা রাধা ব্যতীত আর কাহারও নাই। আর কেহই দর্পণে এরূপ অলৌকিক দর্শণ করে না, করে নাই, করিবে না।

(১১) যশোদা প্রণাম লইবার জন্য, চন্দ্রা প্রসাধনের জন্য, হয়ত কৃষ্ণের নিকট পা বাড়াইয়া দিতে পারে কিন্তু রাসে রাধাই কৃষ্ণের স্কন্ধে চড়িতে পারিয়াছিল, আর কেহ পারে নাই, পারে না।

(১২) একদিন নিভৃত নিকেতনে বসিয়া আলাপ করিতে করিতে অকস্মাৎ কৃষ্ণের বিনানুরোধে "নাগরী চুম্বই নাথ বয়ান, সোম্মুখ সাগরে ভাসল কান; ধনী মন মনমথে উনমত ভেলা, নাগর কর পরে পয়োধর দেলা।" রাধার সবিক্রম পুরুষাচারে রসের সার যে চমৎকার, কৃষ্ণকে সেই অজ্ঞাত অননুভূত অপূর্ব্ব চমৎকার রসের আস্বাদ রাই পোড়ারমুখীই করাইয়াছিল, ইহা অপর কাহারও সাধ্যায়ত্ত নহে। হে নর নারী, সকলেই নারী আমরা; গোবিন্দ সুন্দরই, এক অদ্বিতীয় পুরুষ। আইস সকলে আমাদের রাণী আমাদের করুণাময়ী নন্দ্রাবদনী ভালবাসা ঠাকুরাণীর জয় দিই।

সম্পূর্ণ।

শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এম্, এ প্রণীত।

১। জিজ্ঞাসা—দ্বিতীয় সংস্করণ সূচি—সুখ না দুঃখ, সত্য, জগতের অস্তিত্ব, সৌন্দর্য্যতত্ত্ব, সৃষ্টি, অতি প্রাকৃত, আত্মার অবিনাশিতা, কে বড়, মাধ্যাকর্ষণ, এক না দুই, অমঙ্গলের উৎপত্তি, বর্ণতত্ত্ব, প্রতীত্য সমুৎপাদ, পঞ্চভূত, উত্তাপের অপচয়, ফলিত জ্যোতিষ, নিয়মের রাজত্ব সৌন্দর্য্য বুদ্ধি, মুক্তি, মায়াপুরী, বিজ্ঞানে পুতুলপূজা। ২৲

২। কর্ম্মকথা—সূচী—মুক্তির পথ, বৈরাগ্য জীবন ও ধর্ম্ম, স্বার্থ, পরার্থ, ধর্ম্মপ্রবৃত্তি, আমার ধর্ম্মের প্রমাণ, ধর্ম্মের অনুষ্ঠান, প্রকৃতিপূজা, ধর্ম্মের জয়; যজ্ঞ। ১।০

৩। চরিত কথা—সূচী—বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ, আচার্য্য মক্ষমুলর, হেল্ম্ হোল্জ, উমেশ-চন্দ্র বটব্যাল রজনীকান্ত গুপ্ত। মূল্য দশ আনা মাত্র।

৪। প্রকৃতি—সৌরজগতের উৎপত্তি, আকাশতরঙ্গ, পৃথিবীর বয়স, জ্ঞানের সীমানা, ক্লিফোর্ডের কীট, প্রাচীন জ্যোতিষ, মৃত্যু, আর্য্যজাতি আলোক তত্ত্ব, পরমাণু প্রণয়।

মূল্য এক টাকা।

৫। মায়াপুরী—বৈজ্ঞানিক সন্দর্ভ মূল্য ।০ আনা।

৬। ঐতরেয় ব্রাহ্মণ—ঋগ্বেদানুযায়ী বৃহৎ শাস্ত্র গ্রন্থের টীকা ও পরিশিষ্ট সমেৎ বঙ্গানুবাদ। মূল্য ।০

শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায় ২০১ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট; কলিকাতা

অধ্যাপক বিপিনবিহারী গুপ্ত, এম-এ প্রণীত

সচিত্র

পুরাতন প্রসঙ্গ।

পুরাতন প্রসঙ্গ কি ?

যে যুগ অতীত হইয়া গিয়াছে, যে যুগে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর সাহিত্য ও সমাজ-সেবায় জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন, আর তারানাথ তর্ক-বাচস্পতি স্বীয় অগাধ পাণ্ডিত্য লইয়া তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, যে যুগে গুপ্তকবি ও দাশরথি রায়ের প্রভাবাবসানের সঙ্গে সঙ্গে বঙ্কিম-প্রমুখ সাহিত্যরথিগণ বাঙ্গালা ভাষাকে অপূর্ব্ব শ্রীবৃদ্ধিশালিনী করিয়া তুলেন, যে যুগে বাঙ্গালা রঙ্গমঞ্চের সূচনা ও প্রতিষ্ঠা হয়, যে যুগ দ্বারকানাথ মিত্র-প্রমুখ মনীষিগণের জ্ঞানগরিমায় উজ্জ্বল, যে যুগে রাম-গোপাল ঘোষ ও কেশবচন্দ্র সেন বক্তৃতার মন্দাকিনীতে স্বদেশ ও ধর্ম্মের তরণী ভাসাইয়া ছিলেন, যে যুগ ভাবের ও ধর্ম্মের, জ্ঞানের ও চিন্তার আকস্মিক বন্যায় প্লাবিত হইয়াছিল, যে যুগের ইতিহাস এখনও লিখিত হয় নাই, 'পুরাতন প্রসঙ্গ' সেই স্মরণীয় যুগের প্রসঙ্গ ; এবং তাহা সেই যুগের একজন মনীষী কর্ত্তৃক কথিত হইয়াছে। এই সকল প্রসঙ্গের বক্তা আচার্য্য কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য মহাশয় ইংরাজী ১৮৪৭ খ্রীষ্টাব্দ হইতে বিদ্যা-সাগরের সহিত পরিচিত, ১৮৫৮ খ্রীঃ অব্দে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম প্রবেশিকা পরীক্ষা উত্তীর্ণ হইয়া পরে বি, এ পাস করিয়া ১৮৬২

হইতে ১৮৭২ সাল পর্য্যন্ত প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যাপকতা করেন. ‘বঙ্গদর্শনের’ বহুপূর্ব্বে বাঙ্গালা মাসিক পত্রে লিখিতেন, বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসের পূর্ব্বে ইনিই “দুরাকাঙ্ক্ষের বৃথা ভ্রমণ” নামক গ্রন্থে সেই ধরণের লেখার প্রবর্ত্তয়িতা, শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র সরকার এইরূপ বলেন। স্যর গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, ডাঃ রাসবিহারী ঘোষ, শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র, ৺রমেশচন্দ্র দত্ত, ৺কবি নবীনচন্দ্র সেন প্রভৃতি অনেক বিখ্যাত বাঙ্গালী এক সময়ে ইঁহার ছাত্র ছিলেন। পরে ইনি হাইকোর্টে ওকালতি করেন; Tagore Law Lecturer হয়েন, “হিতবাদী” পত্রের প্রথম সম্পাদক ছিলেন; শেষে রিপণ কলেজের প্রিন্সিপ্যাল হইয়া অনেক বৎসর পরে অবসর গ্রহণ করেন।

সেই অতীত যুগের একটা সুস্পষ্ট চিত্র ত ইহাতে পাইবেনই, তদ্ব্যতীত বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র, মাইকেল, হেমচন্দ্র, বিহারীলাল চক্রবর্ত্তী, দ্বারকানাথ মিত্র, দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ, কালীপ্রসন্ন সিংহ, তারানাথ তর্কবাচস্পতি, মদনমোহন তর্কালঙ্কার, অক্ষয়কুমার দত্ত, কেশবচন্দ্র সেন প্রভৃতি মহাত্মাগণের, সম্বন্ধে এমন অনেক কথা ইহাতে আছে যাহা তাঁহাদের কোন জীবনচরিতে এ পর্য্যন্ত বাহির হয় নাই। ইহাতে আরও আছে—অগাস্ত কোঁৎ, জন ষ্টুয়ার্ট মিল প্রভৃতি পাশ্চাত্য মনীষিগণের এবং তাঁহাদের প্রচারিত ধর্ম্ম ও দর্শণের মনোমদ আলোচনা। এরূপ পুস্তক বাঙ্গালা ভাষায় আর নাই।